মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন

প্রবীর ঘোষ

মনের
নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

MONER NIYANTRAN-YOGA-MEDITATION
(Control of Mind, Yoga & Meditation)
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 100.00

ISBN-81-295-0582-7

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২

দাম : ১০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

যুক্তিবাদী আন্দোলনের মস্তিষ্ক
সুমিত্রা পদ্মনাভন
ও
রাণা হাজরাকে

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (১ম, ২য়)
আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা
পিংকি ও অলৌকিকবাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্ব ক্যুইজ
The Mystery of Mother Teresa and Sainthood.

প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম

© PRABIR GHOSH 72/8 DEBINIBAS ROAD, KOLKATA700 074, INDIA.
All rights reserved throught the World Reproduction in any manner
in whole or part, in Bengali or other languages, probihibited.

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব : মনের নিয়ন্ত্রণ

প্রথম পর্ব

মনের নিয়ন্ত্রণ

কিছু কথা

তোতা কাহিনী

বিজ্ঞান চেতনা উন্নয়নে ব্রতী একটি সংস্থার আমন্ত্রণপত্র পেলাম। সময়টা ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫ সাল। সংস্থাটি দীর্ঘ ষোল বছর ধরে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছে উত্তর কলকাতায়। সংস্থার কাজ-কর্মে শ্রদ্ধা রেখে-ই বলছি, আমন্ত্রণপত্রটির শেষ অংশে চোখ এবং মন দিলে বোধহয় কিছু ভ্রান্তি পাবেন। মগজধোলাই-এর শিকার হয়ে পড়েননি তো? আর তাইতেই কি লিখেছেন—

"ক্ষুদিরাম, কানাইলাল থেকে বিনয়-বাদল-দীনেশ-র মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছে সেই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। বিদেশী প্রভুদের হাতে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার না দিলে পরিণাম : ইরাক। তাই বিজ্ঞানকর্মীদের চাই আর্কিমিডিসের মতন সঙ্কল্প। চাই নতুন শপথ : 'বিজ্ঞান চাই, সঙ্গে যে চাই দেশকে ভালোবাসা'।"

এই আমন্ত্রণ পত্রের কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে মুক্তমনে আলোচনার অবকাশ আছে। (এক) "স্বাধীনতা আজ বিপন্ন"। অর্থাৎ স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, ভারত এখনও স্বাধীন। তবে, স্বাধীনতা বিপন্ন। যে ভারতের অর্থনীতি থেকে বিদেশনীতি, কৃষিনীতি থেকে বাণিজ্যনীতি ঠিক করে দেয় আমেরিকার মতো দাদা দেশ, সে দেশকে কতটা স্বাধীন বলবো? পোয়াটাক্? নাকি সিকিটাক্? (দুই) "বিদেশী প্রভুদের হাতে সম্পদ লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার না দিলে পরিণাম : ইরাক।" এইখানে স্বীকার করা হলো ভারতের বিদেশী প্রভু আছে। অর্থাৎ, ভারত পুরোপুরি স্বাধীন নয়। পাশাপাশি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর ইরাকে থাবা বসানোর প্রতি শ্লেষ ও উষ্মা ঢাকা থাকেনি। কিন্তু ঢাকা তুলে দেখান হয়নি ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র। ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর দাদাগিরি করে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে ভারত কথায় কথায় দাদাগিরি করেছে। পূর্বপাকিস্তানে নাক গলিয়ে বাংলাদেশ তৈরি করেছে। শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগারদের অর্থ-অস্ত্র-প্রশিক্ষণ দিয়েছে। স্বাধীন সিকিমকে অঙ্গরাজ্য বানিয়ে ছেড়েছে। ভারত যখন ব্রিটিশদের অধীন, তখন করের বিনিময়ে স্বাধীনতা ভোগ করতো নাগাল্যান্ড মণিপুর, কাশ্মীর। ছলে-বলে-কৌশলে এইসব স্বাধীন দেশকে ভারত দখল করেছে। এরপর কী করে বলি, ভারত অ-সাম্রাজ্যবাদী দেশ? স্বাধীন দেশ নেপাল চিনের কাছ থেকে বন্দুক কিনেছে, শুধুমাত্র এই অপরাধে ১৯৮৮ সালে নেপাল অবরোধ করে ভারত। ১৮ মাস চলে অবরোধ। নেপাল ভয়ংকর রকমের আর্থিক সংকটে

পড়ে। তখন নেপালের অবস্থা ছিল হুবহু অবরুদ্ধ বার্লিনের মতো।

যে কারণে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে ধিক্কার জানাই, সেই একই কারণে বা অপরাধের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে কেন ধিক্কার জানাবো না? একই কারণের জন্যে দু'রকম ব্যবহার করলে তা হবে আমাদেরই দ্বিচারিতা, ভণ্ডামী এবং বোধবুদ্ধির অভাবের পরিচয়।

(তিন) "বিজ্ঞান চাই, সঙ্গে চাই দেশকে ভালোবাসা।" 'দেশ' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? দেশের ভৌগোলিক অঞ্চলকে ভালোবাসা? দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করা? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছিলেন,—

"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবে দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটান ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দেশ তো উপাদান মাত্র, তা দিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে উঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। ***দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।"***

রবীন্দ্রনাথের একথা আমরা ভুলে থাকি। ভুলিয়ে রাখে রাষ্ট্রের মগজধোলাইয়ের রাজনীতি।

রাষ্ট্র, সরকার ও সরকারের তাঁবেদার বুদ্ধিজীবীরা দেশের জনগণ থেকে সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্মী সকলেরই মগজধোলাই করে ঢুকিয়ে দিয়েছে—ভারত একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। মগজ-কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করে আরও ঢোকান হয়েছে—ভারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক মহান দেশ।

আমরা কি তোতাপাখির মতো শেখান বুলি কপচে যাবো?

মগজ-কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিং

মগজ বা মস্তিষ্ক এক অনন্য কম্পিউটার। ছোটবেলা থেকেই আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কুসংস্কার-সুসংস্কার, প্রশ্নহীন মন-মুক্ত মন সবই প্রোগ্রামিং করে ঢোকান হতে থাকে। এই প্রোগ্রামিং-এর ওপর নির্ভর করেই মানুষের ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব, ভাবনাচিন্তা, জ্ঞান, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, সাহস-ভয় ইত্যাদি 'ফাংশন' করতে থাকে। যতই বয়স বাড়ে ততই নতুন-নতুন বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-অধ্যাপক

ইত্যাদিরও প্রভাব মস্তিষ্কে পড়তে থাকে। আগের অনেক প্রোগ্রামিং মুছে যেতে থাকে নতুন প্রোগ্রামিং মানুষের ভাবনাচিন্তাকে চালিত করতে থাকে। যত বেশি করে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি আত্মস্থ হতে থাকবে, ততই মস্তিষ্কচর্চা বৃদ্ধি পাবে। পুরোন, মান্ধাতার আমলের মূল্যবোধ মগজ থেকে বিদায় নেবে। ঢুকবে উন্নত চিন্তাধারা। একে নতুন প্রোগ্রামিং বলতে পারেন, বলতে পারেন মগজ ধোলাই।

রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে, গদিতে টিকে থাকতে, ব্যবসা-বাণিজ্যকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের মধ্যে একটা গাঁটছড়া দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে। আইন মেনেই যাতে টাকার পাহাড় গড়তে পারে শিল্পপতি বণিকরা, তার ব্যবস্থা করে দিতে হয় রাজনীতিকদের। কারণ ওদের টাকাতেই গদিতে বসা।

আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা দেশে যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ গরীব, সেখানে বিভিন্ন সহায়ক শক্তিদের দিয়ে গরীবদের মগজধোলাইয়ের কাজ আসছে। হাজার হাজার বছর ধরে শোষিত মানুষদের বুঝিয়ে আসা হচ্ছে—দারিদ্র তাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, জন্মকালীন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ফল ইত্যাদি।

কিন্তু এখানেই তো অবস্থাটা থেমে নেই। পাল্টা মগজধোলাই করে কিছু যুক্তিবাদী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী শোষিতদের বোঝাচ্ছে—'পূর্বজন্ম', 'ভাগ্য' সব মিথ্যে। এসব হিজিবিজি ব্যাপার-স্যাপার তোমাদের মাথায় ঢুকিয়েছে ধান্দাবাজ বেওসায়ী-রাজনীতিক ও তাদের চামচারা।

পাল্টা চাল হিসেবে এই বেয়াড়া মানুষদের ধরে ধরে জেলে পুরতে, হত্যা করতে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দেগে দিচ্ছে সরকার ও তার হাতের মুঠোর মিডিয়ারা।

সাম্যকামীরা কৌশল পাল্টেছেন। ফলে বহু জায়গায় সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে অহিংসভাবে স্বয়ম্ভর গ্রাম, সমবায় গ্রাম তৈরি করা শুরু হয়েছে গত কয়েক বছর হলো। হতদরিদ্র মানুষগুলো সমবায় গড়ে চাষ করে ভাত-কাপড়-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা নিজেরাই করছে। প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ছাড়া কেউ-ই অস্ত্র ব্যবহার করছে না।

যত বেশি বেশি করে এমন স্বয়ম্ভর গ্রাম হবে, ততই বেশি বেশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুস্থভাবে কায়েম হবে। ততই দুর্নীতিগ্রস্তরা ছিন্নমূল হবে। এও মগজধোলাই রাজনীতির বিরুদ্ধে পাল্টা মগজধোলাইয়ের রাজনীতি। এখানে সাম্য আসবে শান্তি ও গণতন্ত্রের হাত ধরে। অসাম্যের সমাজ কাঠামো ভাঙবেই।

মগজধোলাইয়ের রাজনীতির বিরুদ্ধে পাল্টা মগজধোলাইয়ের রাজনীতির একটা উদাহরণ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে চাপানউতোর। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী-ই ভারত নামের দেশটাকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' করেছিলেন। তিনি-ই আবার

ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাই পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাল্টা মগজধোলাই তাঁর অপচেষ্টাকেও পাল্টে দিয়েছিল। আসুন ফিরে দেখি ঘটনাটা

মগজধোলাইয়ের চাপানউতোর

আমরা জানি, ভারত একটা 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি আমাদের সংবিধানের সংশোধনী বিলে ঢুকে পড়লো কোনও সংজ্ঞা ছাড়াই। সালটা ১৯৭৫। দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে হেরে গেলেন। ফলে পদত্যাগ করতে-ই হয়। প্রধানমন্ত্রী পদ ছাড়বো? ই...ল্লি........ আরকী? গণতান্ত্রিক ভারতের ডিক্টেটর প্রধানমন্ত্রী দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি করলেন। বিরোধী দল থেকে নিজের দলের বেচাল নেতাদের জেলে পুরে দিলেন। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে টি টি পড়ে গেল। শ্রীমতী গান্ধীর পাশে শুধু সোভিয়েত-জোট এই 'সমাজতান্ত্রিক' 'ধর্মনিরপেক্ষ' জোটকে সন্তুষ্ট করতেই ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী বিলে 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি ঢুকিয়ে দিলেন শ্রীমতী গান্ধী। কিন্তু শব্দ দুটির কী সংজ্ঞা—সংবিধানে তার উল্লেখ রাখলেন না। যুক্তি দেখালেন, 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রগুলোতে শব্দ দুটির সংজ্ঞা এতই স্পষ্ট যে আবার করে সংজ্ঞা উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই।

তারপরেই শ্রীমতী গান্ধী সব ধর্মস্থানগুলোতে মাথা ঠেকিয়ে ধর্মের রাজনীতিতে নামলেন। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বার এবং বিভিন্ন ধর্মমতের বিখ্যাত ধর্মগুরুদের আশ্রমে শ্রদ্ধা চড়িয়ে সেই ধর্মমতের লোকদের ভোট টানার চেষ্টায় মাতলেন। পাশাপাশি আইনবিদ, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, নীতিবেত্তা প্রভৃতিদের ময়দানে নামালেন। তাঁরা মানুষের মধ্যে একটা কথা নানাভাবে ঢুকিয়ে দিলেন যে—'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র মানে, রাষ্ট্র সব ধর্মকেই সমানভাবে দেখবে, সমানভাবে পের্টোনাইজ করবে। ধর্মস্থানে দান করলে আয় করদাতা বাড়তি সুবিধে পাবে। মুসলিম ধর্মের মানুষ হজে যাবে সরকারি খরচে। ধর্মীয় ট্রাস্টগুলো যত বড় ধনীই হোক, করের আওতায় আসবে না। এমনি গাদাগুচ্ছের সুযোগ-সুবিধে করে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার এক নতুন সংজ্ঞা মানুষের মনে গেঁথে দিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular)
শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। তাতে স্পষ্ট বলা আছে
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও
শিক্ষানীতি হবে সম্পূর্ণ ধর্মবর্জিত।
রাষ্ট্রনায়কগণ কোনও ভাবে-ই
প্রকাশ্যে ধর্ম-আচরণ
করতে পারবেন না।

যখন ব্যাপক মগজধোলাইয়ের কল্যাণে ভারতীয়রা ধর্মনিরপেক্ষতার অপ-সংজ্ঞাকেই সংজ্ঞা বলে ধরে বসে আছেন, তখন যুক্তিবাদী সমিতি পাল্টা প্রচারে নামে। আমাদের প্রচারে সামিল করতে পেরেছিলাম আইনি বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, নীতিবেত্তা, সাহিত্যিক, অভিনেতা, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষদের। অসামান্য সাফল্য পেয়েছি। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের সঠিক সংজ্ঞা আজ বিজেপি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল-ই গ্রহণ করেছে।

বিষয়টাকে এভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—শ্রীমতি গান্ধী বিভিন্ন পেশার মানুষদের সাহায্যে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে ছিলেন। দেশবাসীর মগজধোলাই করে 'ব্রেন' নামক প্রাকৃতিক কম্পিউটারে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কিছু 'প্রোগ্রামিং' করে দিয়েছিলেন। যুক্তিবাদী সমিতি বহু মেধার সাহায্য নিয়ে সেই 'প্রোগ্রামিং' মুছে নতুন প্রোগ্রামিং ঢুকিয়ে দেয়।

শ্রীমতি গান্ধী মগজধোলাই করেছিলেন। আমরাও পাল্টা মগজধোলাই করেছি। দুটোই শেষপর্যন্ত মগজ ধোলাই।

আদিম সামজ থেকেই দেহমিলন ছিল একটা জৈবিক প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবৃত্তির যান্ত্রিক প্রয়োগ মাত্র। এক'শ - দেড়'শ বছর আগেও এমন চিন্তাভাবনার দ্বারাই বেশিরভাগ মানুষ চালিত হতো। 'পতি দেবতা'। যখন ইচ্ছে হবে, যেমনভাবে খুশি পতি দেবতা পত্নীকে ভোগ করতো। বা বলতে পারি ধর্ষণ করতো। ব্যাপারটা পত্নীর কেমন লাগছে—এটা নিয়ে সমাজ মাথা ঘামাতো না। পত্নীর সহজাত যৌনপ্রবৃত্তিকে অবদতিমত রাখাই ছিল অভ্যাস।

যান্ত্রিক শারীরিক মিলন সুখকর ও প্রেমময় হয়েছে মস্তিষ্কে একটু একটু করে প্রেম-বোধ তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে। পুরুষদের মস্তিষ্কের পুরুষতান্ত্রিক প্রোগ্রামিং দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে মুছে সাফ হয়েছে। প্রেমের, মূল্যবোধের বা ধারণার নতুন প্রোগ্রাম গ্রহণ করছে বেশ কিছু মস্তিষ্ক। এইসব মস্তিষ্কের কাছে 'প্রেম'-ই ঈশ্বর, আদর্শ, একগামী এবং এতেই প্রেমের সার্থকতা। উত্তেজক প্রেমও রইলো; তবে যান্ত্রিকতার বদলে শারীরিক মিলনে যুক্ত হলো বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, আনন্দ ও সক্রিয় সহযোগিতা। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমহীন ধর্ষকাম দেহমিলন 'নৈতিক' এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক না থাকলে তাদের সুস্থ মিলন ও 'অনৈতিক' — এমন একটা চিন্তা বহুজন মেনে নিয়েছে। কিন্তু সকলে নয়। তাদের কাছে দেহমিলনের পূর্বশর্ত 'প্রেম'। প্রাচীন মূল্যবোধ ভাঙছে।

এসবই তো এক প্রোগ্রামিং হটিয়ে আর এক প্রোগ্রামিং-এর কার্যকর হওয়ার ইতিহাস।

মা-বাবাকে ঈশ্বরের চেয়েও বড় আসনে বসাবার সামাজিক বোধ তৈরি করেছে শত শত বছরের চলে আসা মূল্যবোধ। ভাই-বোন-এর জন্য আত্মীয় গোষ্ঠীর জন্য

জীবন লড়িয়ে দেওয়ার মূল্যবোধ আমাদের মস্তিষ্কে শিশুকাল থেকে প্রোগ্রামিং করা আছে। এ-সবই করেছেন সমাজপতীরা, বুদ্ধিজীবীরা এবং মা-বাবা-আত্মীয়-পরিজন। ধর্মগুরুরা, ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের উপদেশাবলীতে বলেছে—ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলে রক্ষা করেন গুরু। কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হলে রক্ষা করার সাধ্য ঈশ্বরেরও নেই। গুরুরা পূজ্য হয়েছেন।

এইসব সামাজিক বোধ শত শত বছর ধরে চলতে চলতে বর্তমানে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে আপাত্যস্নেহ, মা-বাবার প্রতি প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা, ভাইবোনের প্রতি প্রশ্নাতীত ভালোবাসা, গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা—এসবই আমাদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা ভাবতে শুরু করেছি, যে এইসব-ই নাড়ির বন্ধন, সহজাত প্রবৃত্তি।

আবার একদল যখন বোঝাতে শুরু করলো—খারাপ, নোংরা অপরাধী মানুষরাও কারও না কারও মা-বাবা। 'মা-বাবা' বলেই প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা জানানো অনৈতিক। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা জানাবে, অশ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধা। আরও বোঝালো—সাম্যের সমাজ গড়তে আন্তরিক হতে গেলে জন্ম-সম্পর্কে ভাই-বোন-আত্মীয়দের প্রতি স্নেহ-প্রেম-আবেগে লাগাম পড়াতে-ই হবে। নতুবা স্বজনপোষণের দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসবে। মনে রাখতে হবে—এক দুর্নীতি-ই বহু দুর্নীতিতে ঢুকতে উৎসাহিত করে। গত শতকে কিছু দেশ সাম্যের সমাজ গড়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। সে সব দেশের সমস্ত নাগরিকদের জীবিকা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ইত্যাদির পূর্ণ দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। গোটা দেশের নাগরিকদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল ভ্রাতৃত্ববোধ। সমাজতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠার আগেই সেসব দেশের সমাজ কাঠামো ভেঙে পড়লো। এই পতনের অন্যতম কারণ ছিল স্বজনপোষণ।

আত্মীয়-প্রেম বা গোষ্ঠী-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ন্যায়-অন্যায় বোধকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতাকে মগজ থেকে বিদায় করতে হবে। তারপর নতুন জাতীয়তাবোধকে ব্রেন-কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করে দিতে হবে।

আমেরিকার তৈরি 'মস্তিষ্ক-যুদ্ধ' (brain-war) পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হলো : (১) যারা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। (২) মনে রাখতে হবে, উন্নতিশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে যেখানে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ গরীব, সেখানে সবাইকে ভালোমতো বাঁচতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এইসব গরীব মানুষগুলো যাতে নিজেদের নানা দাবিদাওয়ার কথা তুলতে না পারে, সেটা দেখা খুবই জরুরি। নতুবা দেশ শাসন করা কোনও শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেই অসম্ভব। (৩) উচ্চবিত্ত মানুষদের 'ক্যারিয়ারিস্ট' করার আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে রাষ্ট্রকে। শতকরা ১০ ভাগ এগিয়ে থাকা মেধার (উচ্চমেধা বলছি না) মানুষদের জন সমস্ত

সুখ-সুবিধা দাও। সাজান ফ্ল্যাট-গাড়ি-বিদেশী মদে ডুবিয়ে রাখা। ক্যারিয়ারিস্ট শেষ পর্যন্ত শুধু নিজের কথা-ই ভাবে। প্রথমের দিকে তার চিন্তা থেকে সমাজ বাদ যায়। থাকে শুধু মা-বাবা ভাই-বোন। তারপর শুধুই 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'। রাষ্ট্র এদের বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। ওরা সরকারের সব সময়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তরুণ মধ্যবিত্তদের ডুবিয়ে রাখতে হবে নিরন্তন উত্তেজনার মধ্যে। নেশা, নাচ-গান-যৌনতা ইত্যাদি বিষয়ে উত্তেজিত রাখ। এই মধ্যবিত্তদের জন্যেই খবরের কাগজ থেকে টি ভি চ্যানেলে গঠনমূলক খবরের চেয়ে নেতিবাচক খবরে জোর দিতে হবে। যুদ্ধ, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি উত্তেজক খবরে মাতিয়ে রাখো। আর এক শ্রেণীর অতি-নিরীহ মধ্যবিত্তদের মজিয়ে রাখতে প্রচার মাধ্যমগুলিতে নিয়ে এসো ভাগ্য ও ধর্মের বাণী, প্রবচণ ও যোগ। একটা কথা ভুললে চলবে না, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই কিছু বিবেক উঠে আসে, যারা বঞ্চিত মানুষদের মগজধোলাই করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে।

মনে রাখতে হবে নেতৃত্ব ছাড়া কখনই আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয় না। আর সংগঠকদের কাজ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মধ্যবিত্তরা-ই পালন করে আসছে।

(৪) যারা শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের ঘুম ভাঙাচ্ছে, তাদেরকে 'দেশদ্রোহী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'উগ্রপন্থী' ইত্যাদি বলে দেগে দিতে হবে। (৫) প্রচার করতে হবে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা প্রেমীরাই দেশপ্রেমী। (৬) দেশের শোষিত বঞ্চিত মানুষদের জন্য যারা প্রেম দেখায়, তাদের এনকাউন্টারে শেষ করে দিয়ে প্রচার করতে হবে তারা কী ভয়ঙ্কর রকমের উগ্রপন্থী। (৭) এজন্যে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত রকমভাবে বাকি দেশবাসীদের মগজধোলাইয়ের জন্য সম্ভাব্য সব পথ-ই গ্রহণ করতে হবে।

গত ষাট বছরে ভারতের রাজনীতিতে চোরচোট্টা-গুণ্ডা-বদমাইসরাই রাজ করছে—স্বীকার করতেই হবে। ভারতে দুর্নীতি আজ সর্বব্যাপী—স্বীকার করছি। এ অবস্থা ভাল হওয়া অসম্ভব— স্বীকার করলাম না।

ভারতের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে—মানে-ই এক সময় এর থেকে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। খারাপ হয়েছে একটু একটু করে। তবে আবার একটু একটু করে ভালো কেন করা যাবে না? নিশ্চয়-ই করা যাবে। শুধু সঠিক পরিকল্পনাই পারে অবস্থাকে পাল্টাতে পারে।

তাত্ত্বিক-ভাবে আপাতত এইটুকু পর্যন্ত আমরা এক মত হলাম তো? নিশ্চয়ই হলাম। পরের কথায় পরে।

মগজধোলাইয়ের রাজনীতি বোঝার আগে মগজ বা মস্তিষ্ককে জানাটা জরুরি। কারণ,

মস্তিষ্ক আমাদের প্রতিটি আচরণ, মূল্যবোধ, সূক্ষ্মাতিসূ মগজধোলাইয়ের পদ্ধতি চিনে নেওয়া পাল্টা মগজধোলাই করে উচ্চ আদর্শকে ঢুকিয়ে দেওয়া, মগজকে জীবিতকাল পর্যন্ত সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম নিতে সঠিক মেডিটেশন পদ্ধতিকে কাজে লাগানো—এসব নিয়েই এই গ্রন্থটি লেখা।

মস্তিষ্ক নিয়ে আমাদের টুকরো টুকরো জ্ঞান আসলে সত্য জানার চেয়ে বিভ্রান্তি-ই বেশি আনে। একটা প্রচার বর্তমানে চলছে, পৃথিবীর যে কোনও অসুখ যোগে সেরে যায়। নখে নখ ঘষলে চুল গজায়। পায়ের বুড়ো আঙুল টিপলে হার্টের অসুখ সেরে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মিথ্যে প্রচার অবশ্যই প্রাণঘাতী প্রচার। যোগ ব্যায়াম করলে অবশ্যই সুস্থ থাকা যায়। কিন্তু একটা অ্যাকসিডেন্ট হলে, স্ট্রোক হলে আপনি যদি আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য না নিয়ে যোগীর সাহায্য নেন, তা হবে চরম বোকামো। এই সত্যকে জানতে আমরা কতটুকু চেষ্টা করেছি? আসলে কোনও চেষ্টা না করে প্রচার-মাধ্যমগুলোর প্রচারকেই গিলে খেয়েছি এবং যোগের সব রোগ সারাবার ক্ষমতার পক্ষে জয়গানে মাতোয়ারা হয়েছি। এটাও যে রাষ্ট্রের মগজধোলাইয়ের রাজনীতির-ই অংশ, তা বুঝিনি। দুঃখ হয়, যখন দেখি তথাকথিত মগজবানরা যোগ নিয়ে হাস্যকর বিবৃতি দিচ্ছেন। শুধু দুঃখ নয়, ভয়ও হয়।

রাষ্ট্র নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ভোগবাদ ও ভাববাদে মাতিয়ে রাখতে অতি যত্নবান। একই সঙ্গে মগজধোলাইয়ের কাজে মগজওয়ালাদের কাজে লাগাতে উচিত মূল্য ধরে দিতে একটুও কার্পণ্য করছে না। রাষ্ট্র মনে করে, প্রত্যেকের সততার-ই একটা মূল্য আছে। কারও মূল্য দশ লাখ, কারও বা দশ কোটি। কারণ মগজওয়ালাকেও মগজ বেচেই সম্পদ-সম্মান ইত্যাদি কিনতে হবে।

তারপরও কোটিতে গুটিক মানুষ আছেন যাঁরা এখনও মগজ বেচেননি। তাঁরাই রাষ্ট্রের মগজ ধোলাই পদ্ধতির বিরুদ্ধে পাল্টা মগজধোলাইয়ে নিত্য-নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন, এই প্রত্যয় রাখি।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৪

১ জানুয়ারি, '০৬

অধ্যায় : এক

বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা নিয়ে বিভ্রান্তি বেচে খাচ্ছে অনেকে

আজকাল টিভি বিজ্ঞাপনের দৌলতে একটা বাচ্চা শিশুও জেনে ফেলেছে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা বাড়াবার উপায়। 'সোনা-চাঁদি চ্যবনপ্রাস' বা 'ব্রাহ্মী শাকের রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া' খাও আর বুদ্ধিমান হয়ে যাও।

বিজ্ঞাপনের গরু গাছে ওঠে — এটা তো আপনাদের জানা। এটাও জানা যে, বিজ্ঞাপন মানুষকে গরু বানাতে চায়। সোনা-চাঁদি চ্যবনপ্রাস ও ব্রাহ্মী শাকের রসের মেধা-বুদ্ধি বাড়াবার বিজ্ঞাপন এমনই মানুষকে গরু বানাবার বিজ্ঞাপন।

বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা ইত্যাদি মস্তিষ্কের কাজ-কর্ম নিয়ে মানুষের নানা ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে, যার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন, (১) মাথা বড় মানেই বুদ্ধিমান। (২) পুরুষের তুলনায় মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন কম। অতএব, পুরুষরা বেশি বুদ্ধিমান। (৩) মেডিটেশন বা যোগ ব্যায়ামে বুদ্ধি বাড়ে। (৪) অপরাধীর সন্তান অপরাধী হবে। (৫) একটা লোক ভালো হবে কি খারাপ, একগামী কি লম্পট আগে থেকেই জিন বা বংশগতি তা প্রোগ্রামিং বা নির্ধারিত করে রাখে........ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞান আজ যতটা এগিয়েছে, তারই সাহায্য নিয়ে বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধাকে অবশ্যই বাড়ান যায়। আমরা এখন এই বিষয়ে আবিষ্কৃত তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনায় যাব।

মগজের কাজ

এই যে আমরা হাঁটছি, চলছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাচ্ছি, চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠছি, খেলছি, নাটক করছি, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখছি, পরিকল্পনা করছি, আবিষ্কার করছি—এই সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছে মগজ বা মস্তিষ্ক।

এই মগজে আছে ১০ লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ। হ্যাঁ,আমরা বলছি মানুষের মগজের কথা। মস্তিষ্ক-ই হল মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মস্তিষ্ককে বলতে পারি, প্রকৃতির তৈরি বিশাল এক কম্পিউটার। ছোটবেলা থেকেই ব্রেন কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং হতে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামিং পাল্টাতে থাকে। মস্তিষ্ক সেই প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করতে থাকে।

মস্তিষ্ক কোষগুলোর সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে মাথার খুলি। খুলি কতকগুলো চ্যাপ্টা ও ছোট আকারের হাড়ের টুকরোয় তৈরি। হাড়ের টুকরোগুলো খাপে খাপে আটকে আছে। দেখলে মনে হবে সুতো দিয়ে সেলাই করা হয়েছে।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণভাবে ১৩৫০ গ্রাম থেকে ১৪৫০ গ্রাম। এই মস্তিষ্কের পরেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুদণ্ড। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড এই দু'য়ে মিলে গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।

স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয়েছে স্নায়ুকোষ নিউরোন দিয়ে। জন্মের সময় মস্তিষ্কে যে পরিমাণ স্নায়ুকোষ থাকে তা প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকে। অর্থাৎ স্নায়ুকোষ আর বাড়ে না। বরং ২০ বছর বয়সের পর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার করে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু হতে থাকে।

স্নায়ুকোষগুলো বা মস্তিষ্ক মাথার খুলির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের থলথলে তরলে ভেসে থাকে। এই তরলকে বলে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সংক্ষেপে সি. এস. এফ।

একটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন হল স্নায়ুতন্ত্রের একক। এমনই
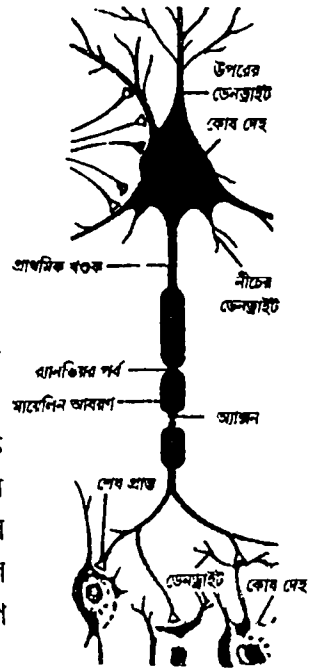
স্নায়ুকোষের ছবি

১০ লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন নিয়ে মানুষ জন্মায়। নিউরোন থেকে ডালপালার মত ছড়িয়ে থাকে 'ডেনড্রাইট'। গ্রিক ভাষায় 'ডেনড্রাইট' শব্দের অর্থ
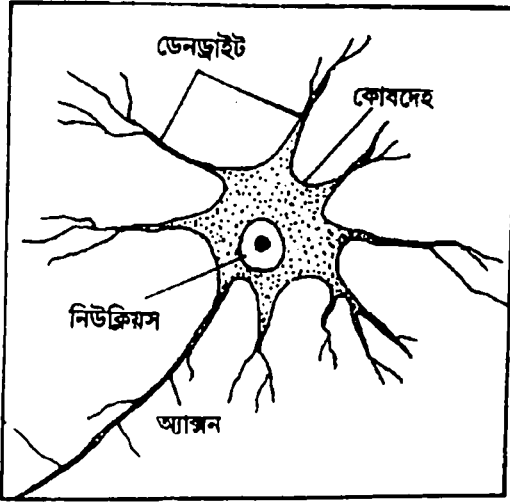
চেস্টীয় স্নায়ুকোষ
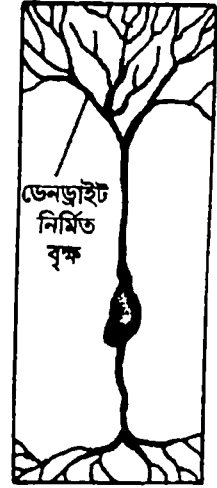
রেটিনার স্নায়ুকোষ
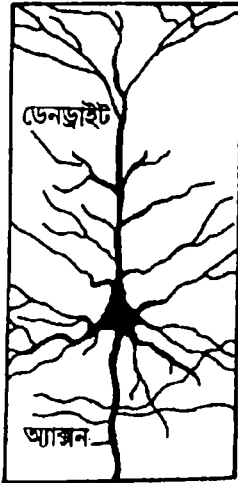
গুরু-মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে পিরামিডাকৃতি স্নায়ুকোষ
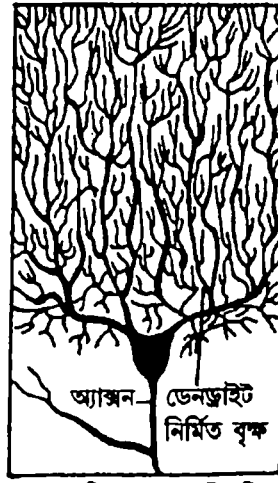
লঘুমস্তিষ্কের পারকিন্‌জি স্নায়ুকোষ

গাছ। ড্রেনড্রাইটে দেখতে শাখা-প্রশাখা যুক্ত গাছের মতো। এই ডেনড্রাইট অন্য নিউরোন থেকে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া করে। স্নায়ুকোষ বা নিউরোন

আকৃতিতে অনেকটা গোলাকার। এই নিউরোন থেকে লম্বা লেজের মতো একটা অংশ বার হয়। এক্সন। এক্সনের কাজ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের অংশে খবর আদান-প্রদান। বিভিন্ন স্নায়ুকোষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ডেনড্রাইট।
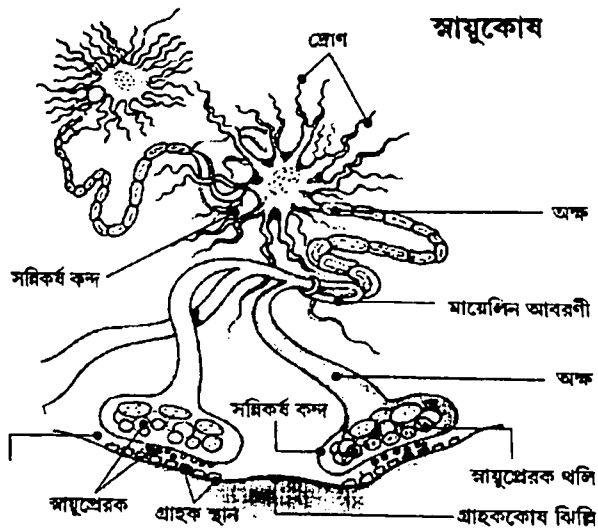
ডেনড্রাইটের সঙ্গে ডেনড্রাইটের এই যুক্ত হওয়ার অংশকে বলে স্নায়ু-সন্ধি বা সাইনাপস, যার মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে।
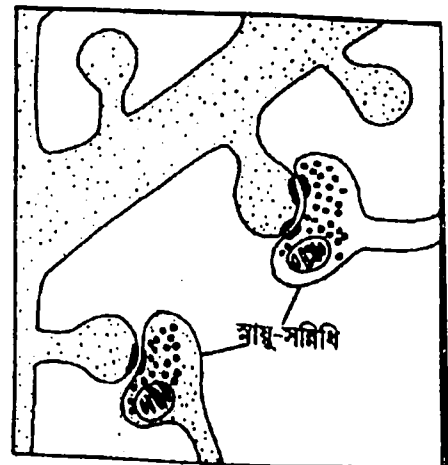
নিউরোন কোনওভাবে নষ্ট হয়ে গেলে নিউরোনের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ডেনড্রাইট বা এক্সন নষ্ট হলে অনেক সময় স্নায়ুকোষের সঙ্গে লেগে থাকা অংশ থেকে নতুনভাবে অংশগুলো তৈরি হতে পারে। তবে নতুন নতুন স্নায়ু-সন্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রতিভা বিকাশ, সৃষ্টিধর্মীচিন্তা ইত্যাদি বিকশিত হয়।

কীভাবে এই স্নায়ু-সন্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের চিন্তাশীলতা বিকাশ করতে পারি—সে নিয়ে নিশ্চয়ই পরে আলোচনায় যাব।

মাথার খুলির ভিতর যে মস্তিষ্ক রয়েছে, তার কিছুটা অংশ ধূসর বা গ্রে রঙের। কিছুটা অংশের রঙ সাদা। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা নিউরোন যখন ঘনবদ্ধভাবে একসঙ্গে মিলে থাকে, তখন দেখায় ধূসর। একেই বলে 'গ্রে-ম্যাটার'। প্রচলিত ধারণা—যার গ্রে-ম্যাটার যত বেশি, তার বুদ্ধি-মেধা তত বেশি।

এই ধারণার সত্যি-মিথ্যে নিয়ে পরে আলোচনায় যাব। মস্কিষ্কে রয়েছে ১২ জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভ। এই স্নায়ু বা নার্ভের কাজ হল মাথা ও ঘাড়ের নানা অংশের কাজকর্ম পরিচালনা করা।

এই স্নায়ুগুলোর সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু মিলে-মিশে অস্থি-পেশীগুলোর কাজকর্ম পরিচালনা করে এবং খবর আদান-প্রদান করে।

শরীরের কিছু অংশ যথা হৃদপেশী, পিওথলি, মূত্রথলি ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক : সিমপ্যাথেটিক। শরীরের জমানো শক্তিকে ব্যবহার করে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র কাজ করে। যেমন, হৃদস্পন্দনের হার বাড়িয়ে দেওয়া, অস্থিপেশীতে রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। দুই : প্যারাসিমপ্যাথেটিক। এই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ শরীরে খাদ্যরসের ক্ষরণ, লালাক্ষরণ ইত্যাদি।

হৃদপিণ্ড যত রক্ত পাম্প করে তার শতকরা কুড়ি ভাগই আসে মস্তিষ্কে।

মগজের তিন প্রধান অংশ :

মগজের তিনটি প্রধান অংশ হল (১) অগ্র মস্তিষ্ক বা গুরু মস্তিষ্ক। (২) মধ্য মস্তিষ্ক। (৩) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা লঘু মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কের তিনটি অংশের মধ্যে অগ্র বা গুরু মস্তিষ্কই প্রধান। গুরু মস্তিষ্কই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি, আবেগ, প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখ-আনন্দ কল্পনা প্রবণতা, দিক্‌নির্ণয় ক্ষমতা, সংগীতে-শিল্পে-সাহিত্যে অনুরাগ, শোনা ও পড়া ইত্যাদির আধার।

মধ্যমস্তিষ্ক সূক্ষ্ম চালচলন, আচরণ, দেহভঙ্গী ইত্যাদি পরিচালনা করে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, আচরণ, চালচলন ইত্যাদি যে পাল্টায় তার বড় দৃষ্টান্ত উৎপল দত্ত ও শম্ভু মিত্রের কাছে পাট নেওয়া অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ক্রিকেটর ইরফান
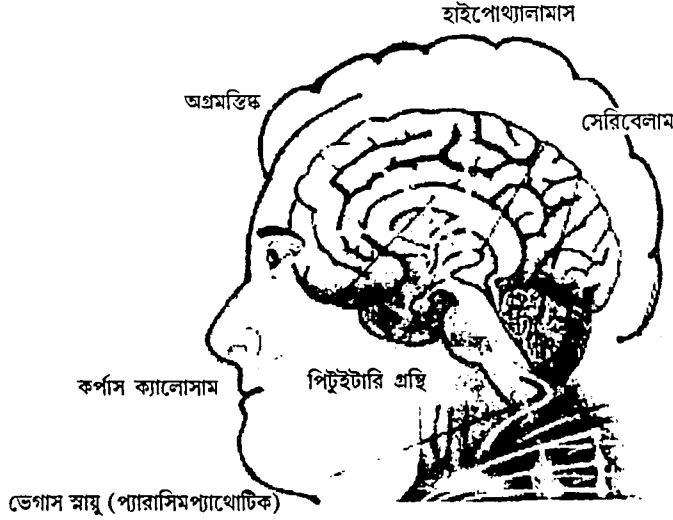
পাঠান থেকে ফুটবলার পেলে গরীব থেকে উঠে এলেও বিখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহখেলোয়াড়দের প্রভাবে চাল-চলন পাল্টে যায়। এই পাল্টে যাওয়ার ব্যাপারটা, অর্থাৎ একমুখী করে তোলার ব্যাপারটা ঘটায় মধ্যমস্তিষ্ক।

পশ্চাৎমস্তিষ্ক অক্ষিগোলক সঞ্চয়ন, শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালন, চর্বণ, মুখের অভিব্যক্তি, হৃদস্পন্দন, পাচনযন্ত্র ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। দেহের অত্যন্ত জরুরি কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।
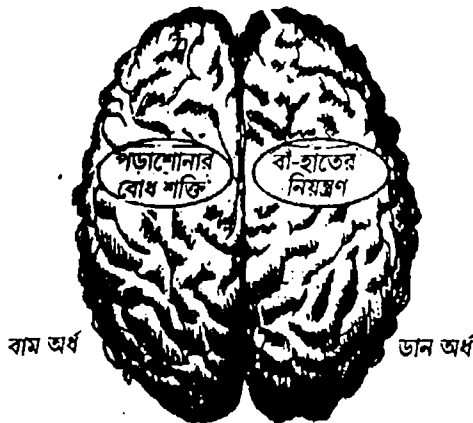
মগজের দু'টি ভাগ, দুটি মন

গুরু-মস্তিষ্কের মধ্য ভাগ থেকে বাম ও দক্ষিণে দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছে একটা গভীর খাঁজ। দেখতে অনেকটা এরকম—

মগজের দুটি অর্ধই আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ করে। মগজের দুটি অংশের কাজে সমতা রক্ষা করে অজস্র স্নায়ুপথ, যারা বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

দুই অংশের যোগাযোগ কোনওভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষের আচার-আচরণে সামান্য পরিবর্তন ঘটে দুই অংশের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের বাঁ দিকের অংশ আচার-আচরণ, বোধবুদ্ধি ইত্যাদিকে বেশি রকম প্রভাবিত করে।

মস্তিষ্কের বাঁ দিক-ই সাধারণভাবে বাক্‌শক্তি, পড়াশুনায় আগ্রহ, যুক্তিতর্কের ক্ষমতা, বিশ্লেষণীশক্তি, গণন ক্ষমতা ও ডান দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

মস্তিষ্কের ডান দিক কল্পনাপ্রবণতা, দিক্‌নির্ণয় ক্ষমতা, সংগীত-চিত্রকলা ইত্যাদির প্রতি আবেগ, অনেক দিন আগে দেখা মানুষকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া বাঁ দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

বড় মাথা বেশি বুদ্ধির লক্ষণ নয় :

একটি চলতি ধারণা—বড় মাথা মানেই বেশি বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা আদৌ সত্যি নয়। বরং বলতে পারি, এমন ধারণা বিজ্ঞান-বিরোধী।

হাতের সামনেই হাজারো উদাহরণ রয়েছে। জাপানের গড়পড়তা মানুষদের তুলনায় আফ্রিকার হতদরিদ্র মানুষগুলোর মাথা অনেক বড়। কিন্তু তারপরও জাপানিরা মেধায় অন্যতম সেরা জাতি।

মাথা বড় হলেই যে মস্তিষ্কের পরিমাণ বেড়ে যাবে—এমন ভাবনার গোড়ায় ভুল রয়েছে। মস্তিষ্কের ওজন সাধারণভাবে ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ গ্রাম হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের কোঁচকানো অংশ বেশি হলে মেধা-বুদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই কোঁচকানো যত কমতে থাকে ততই বুদ্ধিসুদ্দি লোপ পেতে পারে। বহু কারণেই গ্রে ম্যাটারের এই কোঁচকানো খাঁজগুলো ফ্ল্যাট হতে পারে বা খাঁজের গভীরতা হারাতে পরে। বড় মাথাতে খাঁজ বেশি থাকে—এমন ভাববার কোনও কারণ নেই।

পৃথিবী বিখ্যাত লেখক আনাতোলে ফ্রাঁসের মস্তিষ্কের ওজন ছিল মাত্র ১০২০ গ্রাম। এই তথ্য দ্বারা বলতে চাইছি যে মস্তিষ্কের ওজন কখনও মেধা-বুদ্ধির পরিমাপক নয়।

রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন তাঁদের ১০ লক্ষ কোটি মস্তিক কোষের খুব বেশি হলেও শতকরা এক ভাগের কম কোষকে কাজে লাগিয়েই রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয়েছিলেন। এক একটি মস্তিষ্ক কোষের রয়েছে শেখার অসীম ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে যতই কাজে লাগান যাবে, ততই বিকাশ ঘটবে বুদ্ধি-মেধার।

বুদ্ধি-মেধা বাড়াবার উপায়

মেধা-বুদ্ধি বাড়াবার প্রধান উপায় হল—মস্তিষ্ককোষগুলোকে প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানো। মস্তিষ্ককোষকে কে কতটা কাজে লাগাচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে বুদ্ধি-মেধার উন্নতি। মগজকে যত বেশি কাজে লাগাবেন, খেলাবেন তত বেশি মেধা বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। স্নায়ুকোষের শেখার ক্ষমতা এতই বেশি যে, আন্তরিকতার সঙ্গে, ভালোবেসে যা শিখতে চাইবেন, তাই শিখে নেবে স্নায়ুকোষ। ভালো-খারাপ, অপরাধ-বিজ্ঞান থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য থেকে সমাজনীতি যা-ই পড়বেন, দেখবেন, জানবেন, তা-ই জমা হবে স্নায়ুকোষে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিৎ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু প্রতিভাই বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাঁদের মস্তিষ্ককোষকে কাজে লাগাতেন। এতে তাঁরা সবচেয়ে বেশি করে মস্তিষ্ককোষগুলোকে কর্মক্ষম রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মস্তিষ্ক হল—কাজ করলে কাজী, অলস হলেই পাজী। চিত্রা বসু ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে এম. এস. সি। বিয়ে হল কলকাতার ধনী বনেদী বাড়িতে। বছর দশেক পরে বইমেলায় ওকে দেখলাম। সপ্রতিভ, জিজ্ঞাসু, ঝকঝকে, কথার সেই মানুষটাকে খুঁজেই পেলাম না। জানাল ওর রোজনামচা। মেয়েকে তৈরি করে দিয়ে সকালে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। স্কুল থেকে আনা। দুপুরে কিছুটা ঘুম। সন্ধ্যায় মেয়েকে পড়ানো। গাড়ি আছে। স্কুলে যাওয়া আসার কষ্ট নেই। মেয়ের বইগুলো পড়ার বাইরে অন্য কোনও বই পড়ার তেমন সুযোগ হয় না। মেয়ের জন্য কয়েকটা কেনার মতো বইয়ের খোঁজে মেলায় আসা, বর, মেয়ে ও তাদের পরিচর্যা ও দিবানিদ্রার মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। চর্চার অভাবে চিত্রার মেধা-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে।

আইনস্টাইন একবার রসিকতার সুরে বলেছিলেন, 'কিছু লোকের মস্তিষ্ক আছে, কিন্তু কোনও কাজেই লাগে না। ওরা যা কাজ করে তারজন্য শুধু শিরদাঁড়াই যথেষ্ট ছিল।'

আমাদের গলার ওপর একটা মাথা চাপান আছে। সেটা কি শুধুই বয়ে বেড়াবার জন্যে? নাকি শ্যাম্পু, ময়শ্চারাইজার, সাবানের বিজ্ঞাপনে দেখাবার জন্যে?

আমাদের মনে রাখতে-ই হবে মগজকে যথেষ্ট পরিমাণে কাজে না লাগালে অলস মস্তিষ্ককোষগুলোর মৃত্যু ঘটতে থাকবে।

শারীরিকভাবে স্থায়ী অসুস্থতা অনেক সময় একজনকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে পারে। ফলে চিন্তায় শ্লথতা আসে, পরিকল্পনা মাফিক কাজে উৎসাহ হারায়। ফলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর দ্রুত মৃত্যু ঘটতে থাকে। চিন্তা, বুদ্ধি, মেধা, বিশ্লেষণক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার পরও কেউ যদি তাঁর মগজ নানা কাজে খেলাতে থাকেন, তবে নতুন নতুন সৃষ্টির বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভব। স্টিফেন হকিং-এর মতো পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী তার-ই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। অচল দেহ। কিন্তু সচল মস্তিষ্ক তাঁকে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী করেছে।

'পারকিন্‌সন্স' রোগী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ড. বিপ্লব দাশগুপ্ত দু'জনের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারতেন না, কথা বলতেন এতই জড়িয়ে যে তাঁর কাছের মানুষরাও কথার অর্থ বুঝতে পারতেন না। মুখ দিয়ে লালা পড়তো। প্রবীণ মানুষটি এইসব শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও এখনও কম্পিউটারে বসে লিখে গেছেন অনবদ্য সব অভিজ্ঞতা, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অসাধারণ বিশ্লেষণ-ধর্মী নানা গ্রন্থ। তিনি জানতেন মস্তিষ্কচর্চাই তাঁকে অলজাইমার রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচাবে। এটাও জানতেন, পারকিন্‌সন্স্ রোগীদের অলজাইমার রোগের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। অলজাইমার রোগী, চিন্তাশক্তি, বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। আর অলজাইমার রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় ব্যাপক মস্তিষ্কচর্চা।

ব্যাপক মস্তিষ্কচর্চা অব্যাহত রাখতে পারলে যুক্তিবোধ নব্বইতেও অতি তীক্ষ্ণ থাকে। হাতের সামনে উদাহরণ জর্জ বারনার্ড শ', নীরদ সি. চৌধুরী, খুশবন্ত সিং অন্নদাশঙ্কর রায়।

মস্তিষ্কের পুষ্টি

মস্তিষ্কচর্চার জন্য মস্তিষ্ককে কার্যক্ষম রাখাটা জরুরি। আর কার্যক্ষম রাখতে জরুরি মস্তিষ্কে পুষ্টির সরবরাহ অব্যাহত রাখা। মস্তিষ্কের পুষ্টি যোগায় রক্ত। চারটি মহাধমনী শুদ্ধ রক্ত 'হার্ট' থেকে বহন করে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়।

মস্তিষ্কের ওজন সাধারণভাবে দেহের ওজনের শতকরা ২ ভাগের মতো। কিন্তু সারা দেহে অনবরত যে রক্ত হার্ট থেকে প্রবাহিত হয়, তার শতকরা ১৫ ভাগই যায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের কাজের জন্য যে শক্তির দরকার, তা সরবরাহ করে 'গ্লুকোজ'। গোটা শরীরে যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, তার শতকরা ২০ ভাগ-ই খরচ হয় মস্তিষ্কে। এই গ্লুকোজ ও অক্সিজেন রক্তের সঙ্গেই মস্তিষ্কে যায়। অর্থাৎ রক্তই গ্লুকোজ ও অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়।

মস্তিষ্কে পুষ্টি সরবরাহ বন্ধ হলে স্ট্রোক, পক্ষাঘাত হতে পারে। রক্তের যোগান না পাওয়া বা কম পাওয়ার জন্য স্নায়ুকোষের মৃত্যু-ও হয়। দেহের কোন্ অংশে পুষ্টির যোগানে ঘাটতি হচ্ছে বা বন্ধ হচ্ছে, তার উপর শরীরে কী ধরনের অসুখ হবে, সেটাও নির্ভর করে।

অধ্যায় : দুই

প্রচুর পড়েন মানে-ই মস্তিষ্কচর্চা করেন?

আমার বউ সীমা প্রতিদিনই প্রচুর পড়েন। বাংলা ম্যাগাজিন দেশ, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, আনন্দমেলা থেকে পরিচয়, কৃত্তিবাস, লোক-সংস্কৃতি গবেষণা ইত্যাদি বাড়িতে যা আসে সবই পড়েন। দিনে দুপুর বেলায় পড়েন, রাতে বই না পড়লে ঘুম আসে না। তাই পড়েন, দু'টো আড়াইটে পর্যন্ত।

পড়ে যান, কিন্তু কোনও লেখা নিয়েই নিজে গভীর বিশ্লেষণে যান না। পড়ে ফেলা লেখা নিয়ে আবার ভাবতে বসেন না। প্রবন্ধে কোনও তত্ত্বগত ভুল, স্ববিরোধিতা, যুক্তির শ্লথতা বা অতি-সরলতা রয়েছে কিনা—সেসব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণে যান না। গল্প-উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কোনও ভুল বা গোঁজামিল আছে কিনা—এই নিয়ে ভাবতে বসেন না। এমন প্রচুর পড়িয়ে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাই গড়ে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ—অন্তত ভারতে।

এরা পড়ুয়া, এবং মস্তিষ্কচর্চা করেন—এমনটা আদৌ বলা যায় না। মস্তিষ্কচর্চা শুরু করতে চাইলে আজ থেকেই শুরু করুন। যা পরে করবেন, তা আজ শুরু করাই ভালো, যদি তা ভালো কাজ হয়।

মস্তিষ্কচর্চা মানে ভাবনার চর্চা। নতুন নতুন ভাবনার চর্চা। সেটা একই বিষয়-নির্ভর হতে পারে ; আবার বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর হতে পারে।

চিন্তাভাবনা একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের জন্য বই পড়তে হতে পারে, ওয়েবসাইট ঘাঁটতে হতে পারে, সিডি দেখার প্রয়োজন হতে পারে আবার কোনও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছু দিন-মাস-বছর কাটাতে হতে পারে।

রাণা হাজরা। বয়স একুশ বছর। লম্বায় ৫ ফুট দশ ইঞ্চি। ওজন চল্লিশ কেজি। যুক্তিবাদী সমিতির একটা কাজে মোটরবাইকে অন্ডাল থেকে বাঁকুড়া শহরে যাচ্ছিল।

একটা লরির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে শিরদাঁড়ায় চোট পায়। তারপর থেকে একের পর এক শারীরিক সমস্যা চলছে। নিউরো পেসেন্ট হয়ে পড়েছে। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই চলাফেরায় অনেক বাঁধন পড়লো। ট্রাকশন দিয়ে কোনও মতে খাড়া করানো রাণা এরপরও আমাদের সমিতির সবচেয়ে প্রাণবন্ত, উদ্দীপ্ত, 'তেজ-দিমাগ' তরুণ। যুক্তিবাদী সমিতির কাজ-কর্ম নিয়ে পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করতে সবচেয়ে সক্রিয় মানুষটি রাণা। এমনকি সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত নানা প্রশ্ন বারবার ওর কাছ থেকেই পেয়েছি।

একবার প্রশ্ন করেছিল, "আমাদের দেশ দুর্নীতিতে পৃথিবীর প্রথম পাঁচে আছে। মন্ত্রী-সেনা-পুলিশ-প্রশাসন থেকে সামান্য কেরানি পর্যন্ত সকলে গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে বসে আছে। আমরা যারা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখি ও দেখাই, যারা এদেশে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র আনার জন্য লড়াইতে সামিল, তাদেরও তো একদিন দুর্নীতির ঘূর্ণিস্রোত গ্রাস করে নেবেই। লোভ আমাদের কিনে ফেলবে-ই। আমাদের স্বপ্ন সার্থক করার কোনও পথ না থাকলে কেন এই আদর্শকে আঁকড়ে ধরে এগোবার জন্য জান লড়িয়ে দেবো?"

এই প্রশ্ন তো আর কেউ করেননি এতদিন? কেন করেন নি? ভাবনায় আসেনি তাই। রাণা সমাজ পরিবর্তনের নানা পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে পড়াশুনা করে, মত বিনিময় করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্টি প্রোগ্রাম, প্রয়োগ এবং দু'য়ের মধ্যে দুরন্ত ফারাকের খবর রাখে। এই যে পার্টি প্রোগ্রামগুলোতে লেখা থাকে এক রকম, পার্টি চলে আর এক রকম—এটাই দুর্নীতি। এসব নিয়ে বিস্তর বিশ্লেষণ ও মস্তিষ্কচর্চার পরিণতিতেই উঠে আসতে পারে এমন প্রশ্ন।

দুর্নীতি বিষয়ে বাম ছাত্র রাজনীতিকদের চিন্তাভাবনা কেমন—একটু ফিরে দেখা যাক।

২০০৫ সালের মাঝামাঝি কলকাতার গায়েই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অশান্ত ছাত্র-বিক্ষোভ চলছে, সেই সময় 'তারা নিউজ' চ্যানেল দেখালো ছাত্রদের হোস্টেলের ভিতর খুলামখুল্লা মদ্যপানের দৃশ্য। ছাত্রদের এই বেআইনি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রসঙ্গ তুলে তারা'র এক সাংবাদিক এক ছাত্র নেতার কাছে জানতে চাইলেন এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য। ছাত্র নেতা জানালেন—এটা কোনও সমাজ-বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ছাত্রসমাজ আমাদের দেশের মূল সমাজের-ই অংশ। সমাজে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে—এঘটনা তারই পরিণতি।

রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাঁদের দলের দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তুলুন; দেখবেন তাঁদের উত্তর ছাত্র-নেতার থেকে আলাদা কিছু নয়। রাজনৈতিক দলের পোষা সমাজ বিরোধীদের কথা তুললে চট্‌জলদি উত্তর মিলবে, সমাজ-ই ওদের সমাজবিরোধী তৈরি করছে। ওদের দোষ কোথায়? আমরা বিশ্বাস করি 'লুম্পেনদের'ও

'প্রলেতারিয়েত' তৈরি করা যায়। পার্টিতে এখন সেই প্রক্রিয়া-ই চলছে। অর্থাৎ সমাজবিরোধীদের শ্রমিকশ্রেণীতে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে।

কীভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে? মস্তিষ্কচর্চা চালু থাকলে এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সুষ্ঠু উত্তর মিলবে কি? ওঁরা কি স্বীকার করবেন যে, এইসব আশ্রিত লুম্পেনরা শ্রমবিনিয়োগ করে প্রমোটার, বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লায়ার, তোলাবাজ, রিগিং স্পেশালিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে উঠছে। এতে সমাজবিপ্লব না হোক, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বিপ্লব হবে-ই।

তাহলে সত্যি-ই কি এই ভয়াল দুর্নীতির থাবা থেকে বাঁচার কোনও পথ নেই? শোষিত মানুষরা আরও শোষিত হওয়ার অনিবার্য পরিণতির জন্য অপেক্ষা করবে?

আছে। উত্তর কিন্তু আছে। দুর্নীতি দূর করার এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করার স্পষ্ট পথ আছে। সেদিন রাণাকে যা বলেছিলাম, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো—"আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দুর্নীতি এমন সর্বগ্রাসী ছিল কি? ছিল না।

সমাজটা একটু একটু করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কেন?
কারণ সমাজ শুধু মানুষকে প্রভাবিত করে না, মানুষও
সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষ যদি একটু একটু
করে সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পারে,
তবে মানুষ কেন পারবে না
সমাজকে একটু একটু করে
দুর্নীতিমুক্ত করতে?"

"এটা হলো তাত্ত্বিক উত্তর। এবার আসি প্রয়োগ প্রসঙ্গে। গত বছর দু'য়েক হল একটা নতুন হাওয়া এসেছে সমাজে। স্বরাজ-গ্রাম, স্বয়ম্ভর-গ্রাম, কমিউন বা সমবায়ের হাওয়া। দু'বছরে অন্তত আড়াই হাজার এমন গ্রাম গড়ে উঠেছে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার সর্বত্র। আর তিন বছরে সংখ্যাটা পঁচিশ হাজার হলে একটুও অবাক হবো না।

"এই স্বয়ম্ভর গ্রাম বা স্বরাজ গড়তে অংশ নেয় পাঁচ-দশ-বিশ-চল্লিশটা গ্রামের দলিত শ্রেণীর, শোষিত শ্রেণীর মানুষগুলো। তাঁরা সরকারের খাস জমি চাষের জন্য পেতে সরকারি সাহায্য নেন। গ্রামে বিদ্যুৎ আনতে সরকারি অর্থ সাহায্য নেন। যেখানেই সরকারি অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, সেখানেই চেষ্টা করেন। তবে গ্রামে বিদ্যুৎ আনার কাজ বা সেচের কাজ তারা সরকারি কন্ট্রাক্টরদের সাহায্য ছাড়াই করেন। ওঁরা নিজেদের স্বরাজ বা স্বশাসিত অঞ্চলে অজাচিত আমলাদের আনাগোনা, রাজনৈতিক দলের দল পাকাবার চেষ্টা, রাজনৈতিক নেতাদের 'ভোটের

রাজনীতি' একটুও পছন্দ করেন না। এঁরা নিজেরাই গ্রামের প্রতিটি কাজে এগিয়ে যান, অংশ নেন, গ্রামসভাকে সাহায্য করেন আন্তরিকতার সঙ্গে।

"এই যে সয়ম্ভর গ্রাম, কমিউন বা সমবায় গ্রাম এগুলোর অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি পুরোপুরিভাবে গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল, গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল।

"এই অবস্থা মাথায় রেখে আমরা বলতেই পারি, আরও বেশি বেশি করে স্বনির্ভর গ্রাম হওয়ার অর্থ আরও বেশি বেশি করে মানুষ গণতন্ত্রের সঙ্গে জেনে না জেনে যুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। গণতন্ত্রের সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার বর্তমানে কোনও বিকল্প নেই—অন্তত এদেশে।

"রাণা, তুই দেখবি, যত বেশি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তত বেশি দুর্নীতি কমতে থাকবে। এইসব স্বয়ম্ভর গ্রামের শোষিত শ্রমজীবী মানুষ কেন তাদের রক্ত ঘাম ঝরানো শ্রমের উৎপাদনে দুর্নীতিবাজদের থাবা বসাতে দেবে? গ্রামসভার যে কেউ দুর্নীতি চালাবার চেষ্টা করলে সক্রিয় সমবায় শ্রমজীবীদের চোখে পড়বেই। পড়া মানেই সোজা বহিষ্কার।

"এতো সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন 'সমবায়িকা' বা 'তন্তুজ' ইত্যাদি নয়। শেয়ার যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা বা তাঁদের বংশধরেরা সেই শেয়ারের কথা ভুলে বসে আছেন। নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক নেতারা স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি করে প্রতি বছর বিশাল ক্ষতি করে চলেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায়গুলোয় শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নেই, গণতন্ত্র নেই। তাই 'এলোমেলো করে দে মা, লুটে-পুটে খাই', অবস্থা এতটা প্রকট। সেখানেই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সমবায় গড়ে ওঠে, সেখানে দুর্নীতি থাকে না, থাকতে পারে না।

"এই স্বয়ম্ভর গ্রাম বা সমবায়গুলোই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও
দুর্নীতি উচ্ছেদে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে।
এইসব স্বরাজের প্রতিষ্ঠা মানেই সুষ্ঠু
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা
ও দুর্নীতির অবলুপ্তি।"

এ তো গেলো নির্মাণের কথা। এরপর আরও একটি কথা বাকি থেকে যায়। সংঘর্ষের কথা বিহারের শব্দগাঁও ঘিরে বেশ কিছু গ্রামে সমবায় পরিকল্পনাকে বিস্তৃত করেছিলেন মহেশ ও সরিতা। শোষিত মানুষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে কাতর হলো কেউ কেউ। তাদের হাতে মারা পরলেন মহেশসরিতা। হত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের 'বাহুবলী'। 'বাহুবলী' তাদের বলে 'যারা' শক্তের ভক্ত নরমের যম' রাজনীতিক যারা গরীব ও দুর্বলশ্রেণীর উপর বলপ্রয়োগ করে নানাভাবে।

যথা—ধর্ষণ-হত্যা- লুঠ-অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। যারা চায় অসাম্যের সমাজব্যবস্থা বজায় রাখতে, তারা তো স্বয়ম্ভর গ্রাম পরিকল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইবেই। একথা মাথায় রাখাটা যে জরুরি ছিল, সে'টাই আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন মহেশ ও সরিতা। আত্মরক্ষার জন্য হত্যার আইনি অধিকার এদেশের সংবিধানই আমাদের দিয়েছে। এই অধিকার প্রয়োগের জন্য আগাম প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

আঘাত করতে গেলে প্রত্যাঘাত আসবেই—এ বিশ্বাসই যদি নেকড়েদের মনে গাঁথা থাকতো তাহলে মহেশ-সরিতার উপর থাবা বসাবার সাহস পেত না।

"রাণা তুই ভাব, ২০০৩-এর বিহার, ঝাড়খণ্ড ও আশেপাশের এলাকার কথা। বিশাল অরণ্য সম্পদে ঘেরা অঞ্চল। এই সম্পদ চুরির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে বিশাল সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী। তবু অরণ্য-মাফিয়াদের নেতৃত্বে গাছ কাটা হচ্ছে প্রতিদিন। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রক্ষীরা অবশ্য নীরব দর্শক নয়। ওরা হিসেব রাখে বিভিন্ন মাফিয়াদের কে কত গাছ কাটল। পাওনা কত হল। হিসেব কষে পাওনা আদায় করে। এই সব চোরাই গাছ প্রকাশ্যে বিভিন্ন হাটে বিক্রি হয়। সেখান থেকে লরিতে চেপে গাছগুলো যায় করাত কলে। চোরাই গাছের কল্যাণে করাত কলের সংখ্যাও রমরম করে বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর মন্ত্রী-সচিব-পুলিশ- প্রশাসন-পরিবেশ দপ্তর সব্বাই এসব খবর সুদীর্ঘ বছর ধরে জানেন। রাজ্যের মানচিত্র পাল্টেছে, সরকার পাল্টেছে, কিন্তু জঙ্গল মাফিয়া-রাজ পাল্টায়নি। ওয়াকিবহাল মহল বলে, এএক বিরাট চক্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ সব্বাই। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার কাঠ লুঠ হয়ে যাচ্ছে, করার কিচ্ছু নেই।

"সম্প্রতি কিছু লড়াকু ভূমিপুত্র এই চুরি প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা আদেশ জারি করেছেন—বেআইনিভাবে গাছ কেটে যারা অরণ্য উজাড় করছে, তাদের এবার কেটে উজাড় করা হবে। রেহাই পাবে না এদের সঙ্গে যুক্ত অরণ্যরক্ষী থেকে করাত মালিক কেই-ই। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। মাফিয়া-রক্ষী-কাঠ ব্যবসায়ীদের সুদীর্ঘকালের আঁতাত শিকেয় তুলে ত্রিমূর্তি এখন 'ধোয়া তুলসী পাতা'। গাছ কাটা, গাছের বাজার রাতারাতি বন্ধ।

"মাফিয়া-রক্ষী-পুলিশ-প্রশাসকদের শক্তিশালী আঁতাতও বোঝে কোনটা ফাঁকা আওয়াজ, কোনটা সারগর্ভ।

"রাণা তুই তো জানিস, বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত বিহার ঝাড়খণ্ড সীমান্তে

ট্রেনে ডাকাতি শীলতাহানির ঘটনা আকছার ঘটতো। বছর দুয়েক আগে এক ভয়ঙ্কর ও বড় রকমের ট্রেন ডাকাতি ও ধর্ষনের ঘটনা ঘটে। মিডিয়ায় বিশাল হইচই হয়। এ পর্যন্তই। রাজনীতির ছাতার তলায় থাকা বাহুবলীদের চুলটি ছোঁয়ার সাধ্য নেই পুলিশের। ইচ্ছেও নেই। কারণ লুটের বখরা আসে। মাঝে মধ্যে শ্লীলতাহানী বা ধর্ষনের ভাগও মেলে। অপরাধীরা এতটাই বে-পরোয়া যে অপরাধের পর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। অপরাধের মুখরোচক অশ্লীল গল্প বলে বুক বাজিয়ে। কয়েক মাস আগে একটা ট্রেন ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘযনা ঘটলো। অপরাধী ছিল পাঁচ জন। ওদের দিনের বেলায় প্রকাশ্যে গুলি করে মারলেন কোনও আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এই নিহত অপরাধীদের মধ্যে পুলিশও ছিল। তারপর অদ্ভুত কাণ্ড! ঝাড়খণ্ডে ট্রেন ডাকাতি, ট্রেনে শ্লীলতাহানী ভ্যানিশ।

"বছর তিনেক আগের ঘটনা। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নবাগত ছাত্রদের উপর র‍্যাগিং হলো। পরিণতিতে হাসপাতাল-মামলা—জনা পাঁচেক ছাত্রকে বহিস্কার। ফল—তীব্র ছাত্র আন্দোলন। কলেজ কর্তৃপক্ষের নতিস্বীকার। বহিষ্কৃতদের ফিরিয়ে আনা। পরিণতিতে পরের বছর র‍্যাগিং আরও জোরদার হবে—প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কোথায় কী? ২০০৩-এ নতুন ছাত্রদের নতুন আস্তানায় রাখা হলো। নো র‍্যাগিং সিন! কেন এমন আমূল পরিবর্তন? শুনেছি, কোনও তথাকথিত উগ্রপন্থীরা নাকি একাধিক ছাত্রনেতার কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে চম্‌কেছেন—একটা র‍্যাগিং মানেই একটা ছাত্র নেতার লাশ পড়বে। তাইতেই নাকি পরিবেশ পাল্টে গেছে।

"গত শতকের ছয়ের দশকের শেষে এবং সাতের দশকের শুরুতে নকশালদের আদেশ মেনে ডাক্তাররা ফি কমিয়ে দিয়েছিলেন চুপচাপ।

"বিহার কা যমরাজ, মাফিয়া সর্দার সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সাংসদ। তাঁর নিজের রাজত্বে একটা অপরাধ ঘটে না। পুলিশ থেকে সেলসট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সব্বাই ধোয়া তুলসি পাতা। কেন? সাহাবুদ্দিন চায় না তাঁর নির্বাচনি এলাকায় কেউ দুর্নীতি করুক। সবার ঘাড়ে একটা মাথা, তাই দুর্নীতি হয় না।

"ভাই রাণা, এসব কথা বললাম এজন্যে যে, দুর্নীতি আটকাতে মাঝেমধ্যে বলপ্রয়োগের দরকার হয়। এজন্য নিজেদের শক্তি রাখার প্রয়োজন হয়।

"একই সঙ্গে দেশের কিছু অঞ্চলের মানুষকে গণতন্ত্রমুখী করতে সমবায় চিন্তাকে প্রয়োগ করবো এবং প্রয়োজনে সীমিত শক্তি প্রয়োগ করবো। এই শক্তি প্রয়োগ কখনই সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ। দুর্নীতিবাজদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করতে শক্তিপ্রয়োগ।

"দুর্নীতি তাড়িয়ে সুনীতি আনতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতি দলিত সম্প্রদায়ের আগ্রহ বাড়াতেই হবে। এই গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতি আগ্রহ-ই স্বয়ম্ভর গ্রাম পরিকল্পনাকে সার্থক করতে পারে। সমবায় প্রকল্পকে দুর্নীতি উচ্ছেদের হাতিয়ার করতে পারে। দলিতশ্রেণীর আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নতি ও সাম্য আনতে পারে। মানুষ হিসেবে শির তুলে বাঁচার চেতনা তৈরি করতে পারে। এ হলো নির্মাণের অংশ।

"প্রয়োজনে সংঘর্ষে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি চাই। হ্যাঁ, শুধু প্রয়োজনে। সন্ত্রাসের শিকার হয়ে সাম্য-চিন্তা, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার চিন্তাকে বিসর্জন দেওয়া নয়। সন্ত্রাসকে উৎখাত করতে সংঘর্ষে যেতেই হবে—সে সন্ত্রাস রাজনৈতিক দলের তৈরি হোক বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হোক। দুর্নীতিবাজদের ভয় দেখাতে কখনও সখনও একটু আধটু শিক্ষা তো দিতে-ই হবে। শিক্ষা কতটা কঠিন হবে, তা অপরাধ বিচার করে ধার্য করবে গ্রামের কমিউনের বা সমবায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। যেখানে আইন অচল, দুঃশাসন চলছে, সেখানে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা মুর্খতা।"

এই যে উঠে আসা প্রশ্ন, ও তার ফলে উত্তর খোঁজা, দুই-ই মস্তিষ্ক চর্চার ফল।

অধ্যায় : তিন

স্মৃতি-শক্তি ও প্রতিভা এক নয়

কাশী থেকে ভাটপাড়া সর্বত্রই টোলে গেলে দেখা মিলবে বহু শ্রুতিধরের। ছাত্র জীবনেও অনেককে দেখেছি, যারা দারুণ মুখস্ত করতে পারতো। পরীক্ষার খাতায় সেসব উগরে দিয়ে আসতো। টোল থেকে কলেজ জীবনে দেখা এদের 'স্মৃতিধর' বলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু 'প্রতিভাধর' বলে মেনে নিতে অসুবিধে আছে। একজন স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছাত্র যখন তার লেখায় মৌলিকত্ব হাজির করতে পারে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারে, এগিয়ে থাকা চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারে, তখন তাকে প্রতিভার অধিকারী বলা যায়।

আবার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী না হয়েও চিন্তাবিদ, প্রতিভাধর হিসেবে পরিচিত হতে পারেন। সমরেশ বসু থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কেউ-ই অসাধারণ স্মৃতিধর ছিলেন না। ডাঃ রায় তো পরিচিত জনদেরও নাম ভুল করতেন। তারপরও তাঁদের প্রতিভা ছিল প্রশ্নাতীত।

আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গটা বেঁধে রেখেছি বিদ্যা সংক্রান্ত প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির উপর। আলোচনা যদি আরও একটু ছড়িয়ে দিই, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়?

মারাদোনার ফুটবল প্রতিভা, উত্তমকুমারের অভিনয় প্রতিভা, লতাজির সংগীত প্রতিভা, গণেশ পাইনের পেইন্টিং প্রতিভাকে মুখস্ত বিদ্যার সঙ্গে জুড়বেন কেমন ভাবে?

শুধু মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেও বেশি দূর এগোনো অসম্ভব। প্রচলিত শিক্ষার ক্ষেত্রেও কৃতী হতে গেলে বইয়ের লেখা ও নোটকে আত্মস্থ করার দরকার হয়। মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মতো চিন্তা শক্তির অধিকারী হতে মনযোগ ও বোঝার ক্ষমতাই হল প্রথাগত শিক্ষা থেকে জ্ঞানার্জনের পথ।

প্রতিভা বিকাশে মনযোগ, বোধ ও প্রেরণার ভূমিকা

মনযোগ ও বোঝার ক্ষমতা-এর সঙ্গে প্রেরণা (motivation) প্রতিভা তৈরিতে বড় ভূমিকা নেয়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রধানত অনেকগুলো বিষয় বা factor

কাজ করে। যেমন : মনযোগ আসে ভালোলাগা এবং গভীরতর ভালোলাগা ও মানুষের প্রেরণা থেকে। আমার জন্ম সংগীত পরিবারে হলে সংগীতে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। সচিনকে সচিন বানাবার জন্য ক্রিকেট গুরু রমাকান্ত আচরেকরের অবদান অনস্বীকার্য। সচিনের ক্রিকেটের প্রতি প্রেমের অন্যতম কারণ যদি হয় মুম্বাইবাসী হওয়া, প্রতিদিন ক্রিকেট প্র্যাকটিশ দেখার সুযোগ পাওয়া, তবে আরও একটি অন্যতম কারণ অবশ্যই গুরু রমাকান্ত আচরেকর। সঙ্গে মোটিভেশন তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আপনি ইংরাজি সাহিত্যে অনার্স নিয়েছেন। ক্লাশের লোকচার শুনে আপনি নিরাশ। অধ্যাপক যা পড়াচ্ছেন, সে বিষয়ে তাঁর নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি আদৌ পরিষ্কার নয়। প্রাইভেট টিউটরও তথৈবচ। ওঁদের বিদ্যে-বুদ্ধির উপর আপনি আস্থা রাখতে পারছেন না। ওঁদের মুখস্থ করে পড়ানো আপনার মনযোগ টানতে পারছে না। আবার কোনও কোনও শিক্ষক বা অধ্যাপক বিষয়কে এমন প্রাঞ্জল করে, আকর্ষণীয় করে বোঝান যে ছাত্রদের মনযোগ আকর্ষণ করেন।

মোটিভেশন বা প্রেরণা এমন একটা বিষয় যার অনুপস্থিতে প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বেছে নিতে পারি। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন 'ডিক্টেটর'। দলে ও সরকারে তাঁর ইচ্ছে-ই ছিল শেষ কথা। শ্রীমতি গান্ধী গ্রাজুয়েটও ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে 'ডিক্টেটর' হয়ে ওঠার মোটিভেশন তাকে স্বজনপোষণ বা চাটুকার পোষণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দলের ভিতর কোনও সৎ বা ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজনীতিকের উত্থান দেখলে তাঁদের ডানা ছেঁটেছেন নির্দয়ভাবে। এইগুলো করতে পেরেছেন সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মোটিভেশন থেকে।

২২ অক্টোবর ২০০৫। বিহারে লালু সাম্রাজ্যের পতন হলো। জাল ভোটার লিস্ট, ছাপ্পা ভোট—ভোট কেন্দ্রে বাহুবলীদের দাপাদাপি—বুথ জ্যাম যুগের পতন ঘটলো। বিহারের মানুষ দীর্ঘ বছরের পর এই প্রথম স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন। জয়ী নীতিশ কুমারকে নিয়ে বিহার-জনতা যতটা উচ্ছসিত, তারচেয়েও উচ্ছসিত নির্বাচনের স্পেশাল অফিসার কে জি রাও-কে নিয়ে। বিহারের আকাশ-বাতাস সবচেয়ে বেশি মুখরিত হয়েছে কে জি রাও-এর জয়ধ্বনিতে। জনাদেশের সঠিক প্রতিফলনের রূপকার কে জি রাও না থাকলে দুর্নীতি ও গণতন্ত্র লুটেরাদের রাজত্ব-ই চেপে বসে থাকতো বিহারে—এমনটাই বিশ্বাস আমবিহারীদের।

কে এই কে জি রাও? নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পরামর্শদাতা। বৃদ্ধ। বিহারে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে যা করেছেন, তাকে অসাধ্য সাধন বললে একটুও বাড়াবাড়ি হয় না। রাত-দিন এক করে দিয়ে খেটেছেন। ১৮ লক্ষ জাল ভোটারের নাম বাতিল

করেছেন। লালু-রাবড়ির ক্রীতদাস আমলাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। লালু-রাবড়ির অনুগত বিহার পুলিশের হাত থেকে বুথ পাহারার দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে তা দিয়েছেন আধা সামরিক বাহিনীকে। পুলিশ ও প্রশাসনের খামতি দেখলে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন দুর্নীতি আর বাহুবলীদের যুগ শেষ করতে চলেছেন। নির্বাচনের আগে বিহারের প্রচার-মাধ্যমগুলো সশস্ত্র ভোটলুটেরাদের ব্যাপক প্রস্তুতির ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু দেড় মাস ধরে ভাগে ভাগে চলা ভোটে ভোটলুটেরারা গর্তে ঢুকে গেছে কে জি রাওয়ের ভয়ে। হেলিকপ্টারে আধা-সামরিক বাহিনী নিয়ে চক্কর কেটেছেন বিভিন্ন বুথে। হেলিকপ্টার থেকে নেমেই দৌড়েছেন বুথে। এলাকার বাসিন্দারাই 'হিরো'-কে মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন গন্তব্যস্থলে।

বৃদ্ধ বয়সে এমন অসম্ভব সম্ভব করলেন কী করে? মোটিভেশন। দুঃশাসনের রাজত্বেও গণতন্ত্র আনতে হবে—এই মোটিভেশন।

অপরাধী মানসিকতার কেউ পৃথিবী কাঁপানো অপরাধী যখন হয়ে ওঠেন তখন তার পিছনেও এক বা একাধিক মোটিভেশন থাকে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক নারী-ই তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির প্রেরণা ছিলেন।

নারী অনেকের জীবনেই প্রেরণা হয়েছেন। প্রেরণা হয়েছেন পুরুষ। প্রেম অনেককেই মোটিভেট করেছে; তাঁরা শিল্পী, লেখক, চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী থেকে বিপ্লবী—সব-ই হতে পারেন।

অধ্যায় : চার

জ্ঞান (wisdom) ও শিক্ষা (education) এক নয়

শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি স্কুল, কলেজের প্রথাগত শিক্ষা। এই শিক্ষা চলে নির্ধারিত পাঠ্যসূচি মেনে। জীবিকার প্রয়োজনে পরীক্ষায় পাস করতে চাই আমরা। তাই পড়ি। পড়ার পিছনে 'জীবিকা' মোটিভেশন। তার সঙ্গে এটাই আমাদের মাথায় গেঁথেই আছে যে—এখন ক্লাশ নাইনে উঠলাম, ক্লাশ এইটের ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি অনেক কিছুই আর মনে রাখার প্রয়োজন নেই। অবচেতন মন অপ্রয়োজনীয় স্মৃতিকে বাতিল করে দেয়।

কেমিস্ট্রিতে এম এস সি করা সুজিত গুহ ব্যাঙ্কে ঢুকলেন ক্লার্ক হয়ে। ব্যাঙ্কের ডেস্‌পাচ সেকশনে চিঠি 'সর্ট' করে খোপে ঢোকাতে ঢোকাতে কেমিস্ট্রির প্রায় সব শিক্ষাই ভুলে বসলেন। আমার ছেলে ক্লাশ নাইনে ওঠায়, সপ্তাহে একটা দিন কেমিস্ট্রি পড়াবার অনুরোধ করেছিলাম। সুজিত বলেছিলেন—ধু-র, কিছু মনে নেই। আমার দ্বারা হবে না। এইভাবে চর্চার অভাবে, সঠিক পেশার অভাবে, বহু মানুষের বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়, প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়।

জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি দীর্ঘ কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। একজন কৃষক তাঁর শৈশব থেকে নিজে হাতে নিজের জমিতে চাষ করছেন। তিনি জানেন কোন্ ফসল চাষ করলে জমিটায় কী ধরনের মাটি বা সার মেশাতে হবে। কোন্ বীজ ভালো, কোন্‌টা খারাপ। জানেন, কখন কতটা জল সেচের প্রয়োজন। কখন কীভাবে কতটা কীটনাশক দিতে হবে। তাঁর এই বিস্তৃত কৃষি জ্ঞান থাকার পরও আমরা শহুরে বাবুরা তাঁকে জ্ঞানী মনে করি না। কারণ, আমাদের মগজে ঢুকে রয়েছে—স্কুল কলেজের প্রথাগত বিদ্যে না থাকলে জ্ঞানী হওয়া যায় না।

বাংলার কীট-পতঙ্গ নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর এই জ্ঞান আজ স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রকাশিত হয়েছে কয়েক শো প্রবন্ধ। কলেজ-ইউভার্সিটির প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই তিনি আজ 'জ্ঞানী' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন গুণীজনের।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভা আমাদের অবাক করে। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি যতটা স্বশিক্ষিত ছিলেন, আজ পর্যন্ত তাঁর ধারে কাছে যাওয়ার মতো প্রতিভার দেখা আমরা পাইনি।

সমরেশ বসু থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেউ-ই গ্রাজুয়েট ছিলেন না। অথচ বাংলায় এম এ পড়তে গেলে তাঁদের লেখা না পড়ে উপায় নেই।

শিক্ষা জ্ঞানকে পরিমার্জন ও তীক্ষ্ণ করতে পারে। আবার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, আগ্রহ মোটিভেশন এবং নিষ্ঠা একজনকে জ্ঞানী মানুষে পরিণত করে। এই কথা যেমন বহু ক্ষেত্রে সত্য, তেমন সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, খেলাধুলায় আন্তর্জাতিক মানে উঠতে হলে কোচিং বা শিক্ষা জরুরি। ফুটবল, টেনিস, জিমনাস্টিক, সাঁতার, লংজাম্প বা দৌড়—যে কোনও খেলার বেলায় আধুনিকতম কোচিং অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। একইভাবে আরও বহু ক্ষেত্রেই জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে মনসংযোগের সম্পর্ক বড়ই নিবিড়

আসল নাম প্রকাশে অসুবিধে আছে। ধরে নিন, নাম জিৎ। জিৎ সুদর্শন ও স্মার্ট যুবক। নামী কলেজের ছাত্র। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এমন ছাত্র পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ফেল। বাবা ও মা দু'জনেই একমাত্র সন্তানের এমন পতনে ভেঙে পড়লেন। দু'জনেই আমার বন্ধু। দু'জনেই চাকুরে। ছেলের বিষয়ে আমার সাহায্য চাইলেন। বললাম, জিৎ-কে আমার কাছে পাঠাতে। কিছু দিন আমার সঙ্গে ঘুরুক।

ঘোরাঘুরি, পত্রিকা, সেমিনার সবেই জিৎ আমার সঙ্গী। আমার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গেও ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান বিষয়ে ঢুকতাম। আলোচনায় বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের নাম উঠে আসতো। তাঁরা নারী সঙ্গের তীব্র ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিতে অসাধারণ। আবার অসাধারণ সম্ভাবনার পরিসমাপ্তিও ঘটতে দেখেছি। নারী লিপ্সা তাঁদের প্রতিভাকে গ্রাস করেছে। সব সময় শুধুমার যৌনচিন্তায় আত্মমগ্ন থাকলে, অন্য কাজে গভীর মনোযোগ অসম্ভব।

এক একজন করে লেখক, খেলোয়াড়, সিনেমার ডিরেক্টর, পেন্টারের নাম টেনে এনেছি। এদের মধ্যে অনেকেই যখন যা করেছেন, তাতে সমস্ত মনপ্রাণ লাগিয়ে করেছেন।

যখন শিল্প কর্মে বা খেলায় মনসংযোগ করেছেন, তখন ভোগ চিন্তার স্মৃতি মুহূর্তের জন্যেও চিন্তায় আনেননি। যাঁরা এমনভাবে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাঁরাই পেরেছেন সৃষ্টিতে অসাধারণ হয়ে উঠতে। যাঁরা মুহূর্তে ভোগ থেকে সৃষ্টিতে পুরোপুরি মনকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছেন, তাঁরাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফল হয়ে উঠতে পেরেছেন।

যাঁরা লাম্পট্যের স্মৃতিকে মুহূর্তে বিদায় দিয়ে সৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে মন ঢেলে দিতে পারেননি, তাঁদের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছে।

কিছু ছাত্র আছে, যারা শুধুমাত্র বইয়ের পোকা। কিছু ছাত্র আছে যারা দারুণ রেজাল্ট করে, কিন্তু আড্ডা, প্রেম, সিনেমা, টিভি, খেলার মাঠ থেকে ডিস্কো—সবেই আছে। এরপরও তারা ভালো রেজাল্ট করছে। কারণ ওরা যখন পড়তে বসে, তখন অন্য কোনও চিন্তাই ওদের মনযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। ওরা ইচ্ছেমতো মনকে বিষয় থেকে বিষয়ে নিবিষ্ট করতে পারে।

জিৎ একদিন আমার কাছে বলে ফেললো তার চেপে রাখা মনের কথা। বাড়িতে মা-বাবা আর ও ছাড়া থাকে একজন পুরো সময়ের মধ্যবয়সী মহিলা। রান্না করা প্রধান কাজ। দুপুরে মাঝে-মধ্যে কলেজ অফ থাকলে, খেলা না থাকলে বাড়িতেই থাকতো। মহিলা জিৎ-কে প্রলুব্ধ করে ও দু'জনে মিলিত হয়। কিছু দিন মিলনটা ছিল নেশা। তারপর থেকে সর্বক্ষণের চিন্তায় ঘুরে ফিরে আসতে থাকে মিলন দৃশ্য।

শেষপর্যন্ত মহিলাকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয় অন্য অজুহাতে। আমার কাউনসেলিং-এ জিৎ আবার স্বমহিমায় ফেরে। বর্তমানে সফল অধ্যাপক। ওর দৈনন্দিন রোজ-নামচা আমি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি—ও ইচ্ছেমতো খেলা থেকে লেখাপড়ায় মনসংযোগ করতে পারছে।

অধ্যায় : পাঁচ

মস্তিষ্ক ও তার কিছু বৈশিষ্ট্য

মনোহর মাহাতো বাঁকুড়ার গ্রামের ছেলে। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উচ্চমাধ্যবিক স্ট্যান্ড করে কলকাতায় এলো পড়তে। হাঁটায় চলায় কথা-বার্তায় গ্রাম্য-সরলতা; আমরা যাকে চলতি ভাষায় বলি গাঁইয়া। পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী। বই পড়তে ভালোবাসতো। আমার কথা শুনতে ভালোবাসতো। লক্ষ্য করেছি—চট্ করে বিষয়ান্তরে যেতে পারতো না।

তিন বছরের মধ্যেই শহর কলকাতার জল-হাওয়ায় রপ্ত হয়ে গেল। স্মার্ট ছেলে। এখনকার পড়াশুনা শেষ করে ইউ এস এ-তে গেল। দেখা হল দশ বছর পরে। ব্যক্তিত্ব-ই পাল্টে গেছে। অনেক কম কথা বলে, অহেতুক কৌতুহল নেই, জিজ্ঞাসা বেড়েছে, দ্রুত বিষয়ান্তরে মনসংযোগ করতে পারে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে। এখন ইউ. এস. এর একটা বৃহৎ কোম্পানির অংশীদার। মনোহর এখন 'মন' নামে পরিচিত।

'মন' বা মনোহরের চরিত্রটিকে মনোবিদের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে আমরা কী পাব? আসুন দেখি।

মনোহরের শৈশব কেটেছে গ্রাম বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে। মা-বাবা, আত্মীয়-পড়শি, বন্ধু, শিক্ষকদের ভাষা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস-চিন্তা-ভাবনা-সরলতা প্রভাবিত করেছে মনোহরকে। তার শেখা (learning) ও শিক্ষা (education) ছিল গ্রাম বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের শ্রেণী চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত।

শহর কলকাতায় আসার পর শহরের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতি মনোহরকে তৈরি করেছে।

আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার পর সেখানকার রুচি, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার তাকে আরও পাল্টে দিয়েছে।

গ্রাম বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আমেরিকার বিশাল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হওয়া পর্যন্ত সবটাই একটু একটু করে হয়ে ওঠা। গ্রামের আবেগ-প্রবণ মানুষ থেকে উদ্দমী, প্রাণচঞ্চল, উচ্চাভিলাষী, পরিশ্রমী মানুষ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রেণী চরিত্র (class character) একটু একটু করে পাল্টাতে

পাল্টাতে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

এ যেমন উত্তরণের কাহিনী, তেমনই এক তলিয়ে যাওয়ার কাহিনীও জানি, দমদম পার্কের শংকর সাহা উদ্যমী, পরিশ্রমী, ধীর-স্থির, যে কোনও কাজে লেগে থাকতে পারে। বড়বাজারে শাড়ি-কাপড়ের ব্যবসা। বিয়েতে বরযাত্রীরা গেলেন এলেন প্লেনে। শংকরের বাবা মারা যেতেই ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, ব্যবসা গেল দাদার দখলে। শংকর দমদম পার্কের বিশাল বাড়ি ছেড়ে দমদমে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে টিকে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো। মানসিকভাবে ধীর-স্থির শংকর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলো। আবার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে ব্যর্থ হতে হতে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব দেখা দিল। বিষণ্ণ শংকর এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বিষণ্ণ মানসিকতাই এখন ওর নিত্য সঙ্গী।

একজন উদ্যমী, অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ী আর্থিক বিপর্যয়ে, ভাইয়ের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাতে একটু একটু করে উদ্যম হারিয়েছে, বিষণ্ণতার শিকার হয়েছে, এসবই একটা শ্রেণী চরিত্র থেকে (class character)-এ নেমে যাওয়ার পরিণতি। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে নেমে যাওয়ার পরিণতি। শংকর যদি একজন রিক্সাওয়ালা বা কুলীর জীবনযাপনে শুরু থেকে অভ্যস্ত হতো, তাহলে আর্থিক অবস্থার জন্য মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার প্রশ্ন-ই ছিল না। শংকরের আর্থিক বর্তমান বিপর্যয়-ই তার বিষণ্ণতার প্রধান কারণ। ভাইয়ে ভাইয়ে ব্যবসা পৃথক করে নেওয়ার ঘটনায় সাধারণভাবে ব্যবসায়ী শ্রেণীর মনে এতটা আঘাত তৈরি করে না। বাবার মৃত্যুর পর এমনটা আকছার ঘটেই থাকে। ধীরুভাই আম্বানীর মৃত্যুর পর অনিল ও মুকেশ দুই ছেলে সম্পত্তি ভাগ নিয়ে অনেক তিক্ত অধ্যায় অতিক্রম করেছেন—ঠিক ঠাক থেকেই।

ভাইয়ের তরফ থেকে শংকরকে যত-ই আঘাত দিক, তারপরও সে যদি আগের স্বচ্ছল অবস্থায় থাকতে পারতো, তাহলে ব্যবসায়ী শ্রেণীচরিত্রের মানুষ শংকর বিষণ্ণতা ও নিস্তেজনার শিকার হতো না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনে করে, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে কখনই নির্দ্দিষ্ট কোনও ছকে (type) বাঁধা যায় না। মন গতিশীল। যার জীবনে উত্থান-পতন বেশি, তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ তথাকথিত 'ছক' বা 'type' বদলাতে থাকে।

অধ্যায় : ছয়

পাভলভ-তত্ত্বে মস্তিষ্কের 'ছক' বা type

আইভান পাভলভের (Ivan Pavlov) মনোবিজ্ঞান-তত্ত্বে আস্থাশীলেরা মনে করেন, মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের বিশেষ কয়েকটা 'ছক' বা 'টাইপ' আছে।

এই ছক বা 'টাইপ' বুঝতে গেলে আগে বুঝতে হবে মস্তিষ্ককোষের স্নায়ুক্রিয়ার 'ধর্ম'। স্নায়ুক্রিয়ার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তিনটি। (১) শক্তি (Strength), (২) গতিময়তা (mobility) ও (৩) ভারসাম্য (balance)।

'শক্তি' হলো মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের সহ্য করার ক্ষমতা। মাফিয়া ডন আবু সালেম আর বেলেঘাটার স্টেশনারি দোকানের কর্মী জীতেনের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের সহ্য ক্ষমতা সমান নয়। টাডা কোর্ট, সি বি আই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরার পরও আবু সালেমের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ সতেজ, একই রকম কর্মক্ষম।

আর জীতেন? পোলিও রোগী। শান্ত, সরল তার দোকানের উল্টোদিকের এক প্রাসাদ বাসিনীর এক তরফা প্রেমে পড়লো। মেয়েটি ব্যবসা করেন। আর মাস গেলে আয় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার। মাঝে-মধ্যে এটা-সেটা কিনতে জীতেনের দোকানে আসেন। জীতেনের পোলিও রোগ এবং সুন্দর ব্যবহারের কারণে জীতেনের প্রতি করুণা ও সহানুভূতি আছে। জীতেনকে জীতু'দা বলে সম্বোধন করেন। ভালো ব্যবহারের করেন। এই করুণাকেই ভালোবাসা বলে ধরে নিল জীতেন। জীতেনের মাস মাইনে সাত'শো। থাকে খালপারের বস্তিতে। প্রেমের কথা মেয়েটিকে জানাতে পারেনি কোনও দিন। কিন্তু ওর দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি ওকে ভালোবাসে। জীতেন এখন মানসিক রোগী। বিষয়টা এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—জীতেনের দুর্বল টাইপের মস্তিষ্ক। সহ্য ক্ষমতা খুব-ই দুর্বল। ফলে তার মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সাদা-মাটা কথায় পাগল।

'গতিময়তা' হলো মস্তিষ্ক কোষের সেই গুণ, যা থাকলে একটি মানুষ দ্রুত একটি থেকে আরও একটি বিষয়ে মনোসংযোগ করতে পারে। এ দেশের রাজনীতিকদের দিকে তাকান। এদের বেশিরভাগ-ই একই সঙ্গে সাংসদ, বিধায়ক অথবা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। পাবলিক রিলেশন, ক্যাডার রিলেশন, তাঁর এরিয়ায় ব্যক্তিগত ও দলীয় প্রভাব বাড়াতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম কাজ,

ম্যাসলম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ, তোলা আদায়ের ভাগ নেওয়া, ক্যাডারদের খুশি রাখতে স্কুল-কলেজ হাসপাতালে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করা। খেলার জগতে কোনও দিন পা না রেখেও খেলার সর্বময়-কর্তা হতে হয়। স্টেডিয়ামে মাঝে মধ্যে ফাংশন করতে হয়। মুম্বাই-চেন্নাই-কলকাতার সিনেমার স্টার-মেগাস্টার ও গায়ক-গায়িকা, নাচক-নাচিকাদের ধরে আনতে হয়। এমনি হাজারো ঝক্কি-ঝামেলা সামলে বই লেখেন, নাটক করেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। এঁদের মস্তিষ্ক কোষের গতিময়তা সাধারণ মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি। বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বহুজাতিক সংস্থার বড় এক্সিকিউটিভ থেকে দাউদ, তেলগির মতো অপরাধ জগতের বাদশাদেরও মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা খুব-ই বেশি।

সব মস্তিষ্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা সমান নয়। কেউ আবেগে গা ভাসান, উত্তেজনায় মাত্রাবোধ হারান, দুঃখে ভেঙে পড়েন, নিস্তেজনার শিকার হয়ে পড়েন। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে বা প্রেমে ব্যর্থতায় মানসিক ভারসাম্য হারানো মানুষের সংখ্যা কম নয়। আবার আনন্দের আতিশয্যে আবেগতাড়িত মানুষও আমরা দেখেছি। দেশের ফুটবল টিমের জয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সমর্থকরা এলোপাথারি গুলি চালিয়েছে, দুরন্ত বেগে মোটর চালিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ওদের আনন্দের আতিশয্যে মরেছে বহু মানুষ। ওদের সবার-ই মস্তিষ্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা কম।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বপ্ন ছিল পুত্র সঞ্জয়কে নিয়ে। তাঁকেই দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিতে বসাবার চিন্তায় যখন মশগুল, তখন-ই সঞ্জয়ের মৃত্যু হল। এত বড় আঘাতের পরও শ্রীমতি গান্ধী শ্রীমতি গান্ধী-ই ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা ছিল অসম্ভব রকমের বেশি।

মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের এই তিন 'ধর্ম' বা বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে তৈরি হয় বিভিন্ন টাইপ বা ছকের। এই টাইপ বা ছককে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেছেন পাভলভ। (১) মেলানকলিক (Melancholic), (২) কোলেরিক (Choleric), (৩) ফ্লেগমাটিক (Phlegmatic) ও (৪) সাংগুইন (Sanguine)।

মেলানকলিক বা বিষাদগ্রস্ত টাইপ। ব্যাঙ্কের কেরানি বিনোদবাবু। ঘষটে স্কুল ফাইনাল পাশ করতেই কাকা ব্যাঙ্কে কেরানি পদে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজে প্রচুর ভুল করেন। চুরি না করলে ব্যাঙ্কের চাকরি যায় না। বিনোদবাবুরও যায়নি। ভালো মাইনে। ব্যাঙ্ক লোনে বাড়ি করেছেন। বিয়ে করেছেন। সংসার বলতে বউ আর ছেলে। ব্যাঙ্ক কো-অপারেটিভে বাড়ি না করলেই ভালো হতো—এটা প্রতিদিনই মনে হয় বিনোদবাবুর। অফিসে যাঁদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকতে হয়, অফিসের পর বাড়ি ফিরে আবার তাদের মুখ-ই দেখতে হয়। মনটা সব

সময় বিষণ্ণ। বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি—সব সময় মন খারাপ।

কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করলে একটাই উত্তর, 'আর....চলছে, জিনিসপত্রের যা দাম? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। ভালো আর কোথায়? ভালো থাকার উপায় আছে?

লাগাতার বিষণ্ণতা এসেছে অফিসের কাজে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। লাগাতর বিষণ্ণতা থেকে এসেছে সব কাজেই আত্মবিশ্বাসের অভাব। প্যারেন্টস মিটিং-এ ডাক পড়লে কী করবেন, কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে ছেলের সহপাঠীদের মা-বাবার কাছে দৌড়ে বেড়ান। ক্লাশটিচারের রুমে ঢোকার আগে অন্তত একবার টয়লেটে ঢুকতেই হয়। পরিবেশের সামান্য চাপেই বিনোদ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ফলে সহকর্মীদের কাছে বিনোদ 'খোরাক'।

বিনোদ 'মেলানকলিক' টাইপের একটি উদাহরণ। ছা-পোষা আত্মবিশ্বাসহীন, মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষদের মধ্যে এই ধরনের টাইপ বেশি দেখা যায়।

কোলেরিক ব অসুহিষ্ণু টাইপ। এরা অতিমাত্রায় উৎসাহী, অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী, অসহিষ্ণু, প্রাণশক্তি টগবগ করে ফুটছে। অস্থিরমতি, অসংযত, হঠকারি, ডিক্টেটর মানসিকতা থেকে বে-হিসেবি ঝুঁকি নিতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল। হিটলার থেকে ইন্দিরা গান্ধী কোলেরিক টাইপের সুন্দর উদাহরণ।

ফ্লেগমাটিক বা **শান্ত,** ধীর টাইপের মানুষরা অচঞ্চল, অধ্যবসায়ী, আঘাত সহ্য করতে পারেন উদাসীনতার সঙ্গে। এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রমে। ধীর-স্থির। ভেবে চিন্তে কাজ করেন। গভীর গবেষণায় আন্তরিকতার সঙ্গে দীর্ঘকাল লেগে থাকতে পারেন। বিফল হলেও ভেঙে পড়েন না। নতুন করে আবার কাজে মনোসংযোগ করেন। আবার কাজে মনসংযোগ করেন। গবেষক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এই টাইপের স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী।

'স্যংগুইন' বা **'প্রত্যয়ী'** টাইপ মানুষরা একই সঙ্গে অনেক ধরনের কাজে মন বসাতে পারে। দ্রুত এক বিষয় থেকে আর একটি বিষয়ে গভীরভাবে মনসংযোগ করতে পারে। রেগে গেলেও বাইরে প্রকাশ করে না। আনন্দে সংযত থাকতে পারে। দ্রুত বিচার করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এইসব গুণের সমাহার সাধারণভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের মধ্যে তাকে।

** মস্তিষ্কের বিশেষ ধর্মের এই যে চারটি শ্রেণি বিভাজন বা টাইপ বিভাজন করেছিলেন পাভলভ, তাকে চূড়ান্ত বা অভ্রান্ত ধরে নিলে ভুল হবে।*

কুড়ি বছর আগে 'অলৌলিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পাভলভের এমন

বিভাজনের পক্ষে মত পোষণ করেছিলাম। সেটাকে সর্বশেষ তত্ত্ব ধরে নিয়ে। মনে রাখতে হবে—একজন যুক্তিবাদী সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কোনও মত প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা অথবা ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্বও তো প্রমাণ হতে পারে, এমন নির্বোধ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হন না।

এক সময় ফ্রয়েডের তথ্য বিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আজ সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-এর অতি যৌনতা (Pan-sexualism) তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেছে। তাঁর তত্ত্ব এখন স্থান পেয়েছে মনোবিজ্ঞানে নয়, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে।

সর্বশেষ পাওয়া তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে একটা বলতেই পারি—পাভলভের করা মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের 'টাইপ' অনুসারে এক একটা মানুষকে এক একটা খোপে ঢুকিয়ে দিলে ভুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ (১) মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, পরিবর্তিত পরিবেশ সব-ই তার 'টাইপ' বা ছক পাল্টে দিতে পারে। (২) এক একটি ঘটনাও মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে সাময়িকভাবে পাল্টে দিতে পারে, যাতে আপনার 'টাইপ' ক্যালকুলেশন ভুল হবে। ২০০৪-এর নভেম্বরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচের কথা ভাবুন। সৌরভ টিম থেকে বাদ। দল নির্বাচক থেকে কোচ সবাই মনে করছেন সৌরভের বর্তমান ফর্ম খারাপ। বাঙালিদের আবেগ সেই বাস্তবতা মানতে নারাজ। ফলে তারা নির্ভেজাল সৌরভ প্রেমে ও বাঙালি প্রেমে মাতোয়ারা হলেন। খাঁটি বাঙালিত্ব তাঁদের খাঁটি সাম্প্রদায়িক করে তুললো। ভারতীয় দলকে হারাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন পিচ নির্মাণের দায়িত্বে থাকা মানুষটি থেকে সিনেমা স্টার, মন্ত্রী থেকে দর্শক 'বিশুদ্ধ' বাঙালিরা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে গলা ফাটালেন, ভারতীয় ক্রিকেটার দিকে জুতো দেখালেন। এঁরা কারা? 'কোলারিক' টাইপের 'অসহিষ্ণু' 'অসংযত' মানুষ। (৩) পাভলভ যে সময় মানুষের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষকে চারটি টাইপে ভাগ করেছিলেন, সময়টা সেখানে আটকে নেই। যে সমাজে যত বেশি জটিলতা দেখা দেবে, ততই আরও বহু ও বিচিত্র সব টাইপের উদ্ভব হতে থাকবে। (৪) মানসিকতা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে অনেকেই 'বিহেবিয়ারাল থেরাপি' (Behavioural Therapy), 'গ্রুপ থেরাপি' (group therapy), ব্যক্তিত্ব তৈরির ক্লাশে ভর্তি হচ্ছেন, কেউবা যাচ্ছেন ম্যারিটাল কাউন্সেলিং সেশনে।

এরপর আর টাইপের অচলায়তনে আস্থা রাখি কী করে!

অধ্যায় : সাত

আচরণগত সমস্যা

শিশুদের আচরণগত সমস্যা

এক : "একমাত্র সন্তান। বয়স ছয়। ক্লাশ ওয়ানে পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে। মায়ের বক্তব্য স্কুল থেকে মাঝে মধ্যে আমাদের ডেকে পাঠানো হয়। অভিযোগ নানা রকমের। ক্লাশের ছেলে-মেয়েদের মারধোর করে সুযোগ পেলেই। ক্লাশে গোলমাল করে। মিসকেও পাত্তা দেয় না। বাড়িতেও ওকে নিয়ে একই প্রবলেম। দুরন্তপনার শেষ নেই। খাওয়া নিয়ে নানান বায়না। টর্চ থেকে ঘড়ি সব-ই ভেঙে রাখবে। কেউ বেড়াতে এলে তাদের নানাভাবে বিরক্ত করবে। একটা কাজ নিয়ে দু-মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে পারে না। মনোরোগ চিকিৎসক দেখিয়েছি। তারপরও অবস্থা একই রকম আছে।"

সব শিশু সমান মানসিকতার হয় না। খুব দুরন্ত, মানে এনার্জিতে ভরপুর। খাওয়া নিয়ে বায়না প্রায় বাচ্চারাই করে। জোর করে খাওয়াবার দরকার নেই। খিদে পেলে খাবে। ঘড়ি থেকে টর্চ ইত্যাদি ভাঙে হয়তো জানার ইচ্ছে থেকে। কীভাবে ঘড়ি চলছে, কীভাবে টর্চ জ্বলছে—জানতে চায়। শিশুটি ওগুলো ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে? নাকি তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে? ওরা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ আচরণগুলোকে বকে মেরে বন্ধ করবেন না। তাতেই বরং ভবিষ্যতে ছেলের প্রবলেম হতে পারে।

আপনার ছেলের এনার্জিকে কাজে লাগাতে ওকে খেলাধুলায় মাতিয়ে রাখুন। দেখবেন ও কেমন পাল্টে যাচ্ছে। নিয়ম করে রোজ একই সময়ে ওর সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হুটোপুটি করে খেলার সুযোগ দিন। একদম ঠিক হয়ে যাবে।

দুই : আমার নাতি ঋজু। বয়স পাঁচ। সপ্তাহের শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঠাকুরদা-ঠাকুরমা'র সঙ্গে কাটিয়ে যায়। ও আসা মানেই খেলে-নেচে-হইহই করে আমাদের দুজনকে নাচিয়ে সময় কাটানো।

একদিন এসেছে। হঠাৎ দেখি হই-হই নেই। স্ত্রী টয়লেটে। আমি লিখছিলাম। ঋজু চুপ কেন? ভিতরের ঘরে ঢুকে দেখি ঋজুর ডান হাতের তালু থেকে টপ্-টপ্

করে রক্ত ঝরছে, আর ওর দু'চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে ঝরছে বড় বড় জলের ফোঁটা। একটা গ্লাস ভেঙেছে। তারই ভাঙা কাঁচ ফুটে এই বিপত্তি।

এই মুখ হাসি নিয়ে বললাম, "এই ব্যাটা, কাঁদছিস কেন রে? এইটুকু লাগতেই কান্না? দেখ, এক্ষুনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।" বলে সবে পাশের ঘরে গেছি, অমনি আমাদের রাধুনি মাসির গলা পেলাম, "আহারে, কি সাংঘাতিক রক্ত পড়ছে। ই-স্!" সঙ্গে সঙ্গে ঋজু শুরু করলো ভ্যাঁ কান্না।

তুলো, ওষুধ ব্যাড-এইড নিয়ে ঘরে ঢুকেই এক ধমক লাগালাম মাসিকে, "তুমি তোমার কাজে যাও। কিচ্ছু হয়নি। তাই নিয়ে চেঁচামেচি লাগিয়ে ঋজুকে নার্ভাস করতে হবে না।"

তুলোতে স্যাভলন লাগিয়ে জায়গাটা মুছে দিয়ে বললাম, "বাঁ হাত দিয়ে তুলোটা চেপে থাক, দেখ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যত বড় হতে থাকবি, দুষ্টুমি করবি, ফুটবল খেলবি, ক্রিকেট খেলবি, কিংবা বকসিং। কত চোট খাবি, কাটবে, হাড় ভাঙবে। তার জন্য কাঁদবি নাকি? এই যে আমার হাত ভাঙা, নাক ভাঙা, বুকের পাঁজর ভাঙা, কোনও দিন কাঁদনি। তুই আসার নাতি হয়ে........" কাঁদবি।

না। নাতি আর কাঁদেনি।

তিন : আপনার সন্তান চুরি করতে শুরু করেছে। না বাড়ি থেকে টাকা পয়সা চুরি করছে না। কিন্তু ওর স্কুল ব্যাগে অন্য কারও পেন, পেনসিল বক্স থাকছে, লক্ষ্য করেছেন। আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। সন্তানও গেছে। কিন্তু ফিরেছে সে বাড়ি থেকে কোনও একটা খেলনা বা কস্‌মেটিক চুরি করে।

এটি একটি আচরণগত সমস্যা। আপনি যদি মনে করে থাকেন শুধুমাত্র ধমকে, মেরে ওর এই স্বভাব পাল্টাতে পারবেন, তা-হলে হয়তো ভুল করবেন।

আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন। তো—আপনার সন্তান একটা সুন্দর পেন্সিল বক্স দেখে যত বারই কিনতে চেয়েছে, ততবার-ই আপনি কি নানা অজুহাতে খরচা এড়াবার চেষ্টা করেছেন? অথবা, চাইলে-ই দিতে হবে—এমনটা পছন্দ করেন না? ভেবেছেন একটা পেন্সিল বক্স তো আছে। দিতে দিতে ওর লোভ বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আপনি কি সন্তানের জন্য অনেকটা সময় দেন? মনোযোগ দিয়ে ওর প্রশ্ন শোনেন? ওর সঙ্গে গল্প করেন? ওর ক্লাসের বন্ধু-বান্ধবদের নাম-পরিচয় জানেন? এ-সবের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে আপনি আপনার সন্তানকে সময় মতো বুঝিয়ে বলুন, কেন ওকে কিনে দিলেন না। পরের মাসে মাইনে পেলে কিনে দেবেন—প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করুন। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। সন্তান যা চাইছে, তা কিনে দেবার আর্থিক ক্ষমতা না থাকলে সেটাকেও সুন্দরভাবে বোঝান, এতে সন্তান সংযমী হবে।

শিশুদের মধ্যে ঝোঁক বা জেদ বেশি হয়। বায়না ধরার স্বভাব থাকে। এই ঝোঁক বা জেদবশত কোনও কিছু পাওয়ার জন্য বায়না ধরলে এবং তাকে সংযমী করতে না পারলে, অসংযমী মন, লোভ বা আপনার উপর রাগ থেকে চুরি করতে পারে। চুরি করতে পরে মানসিক শূন্যতা থেকেও।

এই ধরনের চুরির অভ্যাস এই বয়সে-ই বন্ধ করুন। যদি ভেবে থাকেন, এসব অপরিণত বুদ্ধির কাজ। বয়সে সেরে যাবে—তা'হলে ভুল করবেন। বড়, এমনকি ভবিষ্যতে বড় মাপের মানুষ হলেও চুরির স্বভাব যাবে না। এই চুরির স্বভাবের সঙ্গে ধনী হওয়া বা নামী হওয়ারও কোনও সম্পর্ক নেই। এটা একটা মানসিক রোগ। নাম, 'ক্লেপটোম্যানিয়া'।

চার : একমাত্র ছেলে। ক্লাশ সেভেন পড়ে। কিন্তু লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। সারাক্ষণ টিভি চালিয়ে বসে থাকে। স্কুল থেকে ফিরেই ওর ঘরের টিভি খুলে ধপাস্। অস্থির মতি। সব সময় টিভির রিমোট টিপেই যাচ্ছে। এবার রেজাল্ট যা করবে—ভাবতেই বুক হিম হচ্ছে।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখলেন সন্তান অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। সবে-ই অমনোযোগী।

মনে রাখবেন দশ-বার বছর বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েদের প্রেম, দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে জানার আগ্রহ বাড়ে। যে সব টিভি চ্যানেলে 'শরীরী প্রেম' বা শরীর দেখা যায়, সেগুলো দেখার আকর্ষণই ওকে টিভি সেটের সামনে বসিয়ে রাখে কিনা আপনি জানেন না। আপানি ওর ঘরে ঢুকছেন বুঝলেই চ্যানেল পাল্টে দেয় কিনা জানেন না।

এই নিয়ে বেশি গোয়েন্দাগিরি করার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওদের মন জয় করা সহজ। ওর সঙ্গে বসে 'ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক' 'অ্যানিমাল প্ল্যানেট' বা 'ডিসকভারি'র মতো চ্যানেল দেখতে দেখতে দেখা বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করুন, সন্তানকে বিশ্লেষণ করতে দিন। শরীরী গানের চ্যানেল ও স্থূল সিরিয়ালগুলো যে কত ফালতু, হাস্যকর তা হাসতে হাসতে চোখে আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে দিন। ওর বন্ধুদের ঘরে আনতে বলুন। তাদের সঙ্গে পরিচয় করুন। তাদেরও আপনার আপন করে নিন। সমস্যার মেঘ কেটে যাবে।

পাঁচ : ছেলের বয়স ১০ বছর। মা-বাবা দু'জনেই ব্যাঙ্ক কর্মী। বাড়িতে আর থাকেন দিদিমা। ছেলেটির মধ্যে একটা হিংস্রতা দেখা দিয়েছে। কুকুর দেখলে ঢিল মেরে আনন্দ পায়। একটা বেড়ালকে একবার দুধের সঙ্গে ইঁদুর-মারা বিষ মিশিয়ে খাইয়ে ছিল। ফড়িং বা প্রজাপতি ধরলে ডানাগুলো ছিঁড়ে আনন্দ পায়। এমন নিষ্ঠুর সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে মা-বাবা শঙ্কিত।

এই ধরনের নিষ্ঠুর চরিত্রকে মনস্তত্ত্বে বলে স্যাডিস্ট (Sadist)। এরা নিষ্ঠুর,

ধর্ষকামী। ভবিষ্যতে এসব শিশু পাশের বাড়ির বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করলে অবাক হবার হওয়ার কিছু নেই।

মা-বাবা দু'জনেই নিজেদের কাজ-কর্ম ও আড্ডা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে, অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হলে ছেলে-মেয়েরা নিষ্ঠুর হয়। বৃদ্ধা দিদিমা নিজের মনে টিভি দেখেন। ঠাকুমা (বাবার মা) থাকেন বৃদ্ধাশ্রমে। গোটা ব্যাপারটাই ছেলেটির একেবারে অপছন্দ। নিজেও অস্তিত্বের সঙ্কটে ভোগে। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায়।

ছেলেটির প্রয়োজন হৃদয়বান, সহানুভূতিশীল বন্ধু মা-বাবা। ছেলেটির জন্য সময় দিন। তাকে নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যান। তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিন। সন্তানকে ভালোবাসা দিন। সন্তান ভালোবাসা পেলে ভালোবাসার মূল্য বুঝবে, অন্যকে ভালোবাসতে শিখবে।

কৈশোরে পা দেওয়া সন্তানের সমস্যা

এক : মেয়ের বয়স ১৭ বছর। মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিল। কিন্তু টুয়েলভে উঠল অত্যন্ত খারাপ রেজাল্ট করে। মা-বাবা যত্ন নেন। দু-জন প্রাইভেট টিউটর আছে। তারপরও কেন যে এমন হল? অথচ অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে?

আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার কিশোরী কন্যা মধ্যরাতে ইন্টারনেট সার্ফিং করে সময় কাটায় না? বয়ঃসন্ধির কোনও সমস্যায় পড়েছে কিনা, বুঝতে চেষ্টা করুন। ইন্টারনেটের যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচ্ছল কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের সামনে এক নতুন সমস্যার পাহাড় খাড়া করেছে। পর্ণোছবির অমোঘ আকর্ষণ দ্রুত সমস্ত মনোযোগ টেনে নিচ্ছে।

আপনার চেঁচামেচি, বকাবকি ওর সংকোচের আড়াল ভেঙে দিতে পারে। খোলামেলা এবং আরও বেশি করে যৌনাচারের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ান। ওর বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হতে আমন্ত্রণ জানান। ওর সঙ্গে যৌনশিক্ষা নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করুন। রাতে পড়াশুনার চাপের সঙ্গী হওয়ার নাম করে। যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ সময়ে সময়ে হরলিক্স, ফ্রুটজুস ইত্যাদি এগিয়ে দিন। পড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রয়োজনে ওর বই পড়ুন। রাতে ওর ঘরে আলাদা খাটে বা বড় খাট হলে একসঙ্গে শোয়া অভ্যেস করুন। আশা করি সমস্যা মিটবে। না মিটলে একটুও দ্বিধা না করে মনোবিদের সাহায্য নিন। ও যে সব মনের কথা আপনাকে বলতে পারছে না, তা বলবে মনোবিদের কাছে। যদি ভেবে থাকেন—'আমি ওর সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমাকে সব বলে'—তা'হলে ভুল করবেন।

দুই : বাড়ি কিশোরী কাজের মেয়ে থাকে? ছেলে কিশোর বা যুবক? একটু সতর্কতার প্রয়োজন আছে। যদি উল্টোটা হয়—কিশোর বা যুবক কাজের ছেলে থাকে বাড়িতে, আর মেয়ে কিশোরী বা যুবতী, তাতেও একটু সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করতে এসে আপনার ছেলে বা মেয়ের দ্বারা যৌননিগ্রহের শিকার হচ্ছে কিনা খবর রাখেন?

আমার এমন রুচিহীন, নোংরা কথায় ছিঃ ছিঃ করছেন? পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একাধিক যৌন নির্যাতিতদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলায় ব্রতী। তাদের হিসেব মতো পশ্চিমবঙ্গের শিশু শ্রমিকদের বড় অংশই যৌননিগ্রহের শিকার। বাড়ির কাজের মেয়ের বেলায় গৃহকর্তা থেকে গুণধর ছেলেও নিগ্রহকারী হতে পারে। বাড়িতে পুরুষ শিশু শ্রমিক থাকলে সে বাড়ির মেয়ে থেকে গৃহকর্ত্রীর কাছে যৌননিগ্রহে নাস্তানাবুদ হতে পারে।

এটা সমাজের পূর্ণ চিত্র নয়। তবে খণ্ডিত চিত্র অবশ্যই। সুতরাং সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে চোখ-কান খুলে রাখার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে—এই সমাজে অজাচার ছিল, আছে। নিজে চোখ-কান খুলে রাখলেই সমাজের অজাচার বন্ধ হবে না। সমাজকে সুন্দর করার জন্যেই সমাজের অসুখগুলোকে ঠিকঠাক চিনে নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। এই অসুখ ঠিক করতে আসুন না কেন—বেআইনি শিশু শ্রমিক রাখাটা আমরা বন্ধ করি। অথবা শিশু শ্রমিককে নিজের পালিত পুত্র-কন্যার মতো রাখি। রাখতে পারবেন?

আপনাদের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব-ই পারে সন্তানের মধ্যে কৃতকর্মের জন্য অপরাধবোধ তৈরি করতে। অপরাধবোধই চরিত্র সংশোধনের প্রথম ও প্রধান ধাপ।

তিন : ছেলেটি টুয়েলভের ছাত্র। দিদি বি এস সি পড়ছে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে। মেয়েকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যত সমস্যা ছেলেকে নিয়ে। দিদি, মা-বাবা, সবার সঙ্গেই কথায় কথায় ঝগড়া করে। অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। প্রায়-ই এটা-ওটা খাবার বানিয়ে দেওয়ার বায়না ধরে। বানিয়ে না দিলে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেয়। রাত ১১টার পর পড়তে বসে। অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। ওর ঘর সব সময় এলোমেলো করে রাখে, নোংরা করে রাখে। নিজে তো পরিষ্কার করেই না। মা পরিষ্কার করতে চাইলে, ওর জিনিস-পত্তর এলো-মেলো হয়ে যাবে বলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, পাড়া-পড়শি বা আত্মীয়দের সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করে যে, তাঁরা অত্যন্ত ভালো ছেলে বলে মনে করেন। ছেলে লেখা-পড়ায় ভাল। সে বিষয়ে অভিযোগ নেই। কিন্তু ওর অস্বাভাবিক আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পান না বাবা-মা।

ভুল না করলে, মা-বাবা মেয়ের প্রতি কিছু বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখান। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ওর অবচেতন মন এমন ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে।

ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মা-বাবাকেই বোঝাতে হবে, যেন তাঁরা দু-জনের প্রতি সমান ব্যবহার করেন। মা-বাবার মাত্রাতীত পক্ষপাতিত্বের জন্য ভাই ব্যথিত হচ্ছে, তাই ওর ব্যবহারে এই অস্বাভাবিকতা—এটা কোনও দিন দিদি বুঝে ফেললে দিদি'র একটা মানসিক সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মা-বাবার পক্ষপাতিত্ব মেয়েটির মধ্যে একটা অপরাধ বোধ তৈরি করতে পারে। অতএব আর দেরি না করে মা-বাবার সচেতন হওয়া উচিত।

চার : মা বাবা দু'জনেই অধ্যাপক। মা ইংরেজির, বাবা কেমিস্ট্রির। এক মাত্র ছেলে পড়ে ক্লাশ টেনে। দু'জনেই আন্তরিকভাবে চান, ছেলে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করুক। মা-বাবা দু'জনেই ছেলেকে পড়ান। এ ছাড়াও প্রাইভেট টিউটর আছে। এত করেও ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ছেলের লেখাপড়ায় একটুও মন নেই। ক্রিকেট খেলা, লিটিল ম্যাগাজিনের কভার আঁকা, ছবি তোলা, গল্প লেখা, গল্পের বই পড়া—এসবেই ওর আগ্রহ বেশি। পড়াশুনাতেই বড় আগ্রহের অভাব রয়েছে। মা-বাবা যত-ই বোঝাই,—এই বয়সে পড়াশুনাই ধ্যান-জ্ঞান করতে হয়। এসব হিজিবিজি কাজে সময় নষ্ট করিস না। পস্তাবি। কে শোনে কার কথা। এক কান দিয়ে শুনে, আর এক কান দিয়ে বের করে দেয়। প্রচণ্ড জেদি হয়ে উঠছে। এত করেও লেখাপড়ায় মাঝারি মানের উপর উঠতে পারেনি।

একটি অনুরোধ, ছেলের ভালোলাগা বিষয়গুলোর প্রতি আকর্ষণকে জোর করে বন্ধ করবেন না। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্ক অনেক সময়-ই থাকে না। ***খেলোয়াড় একনাথ সোলকার থেকে তেন্ডুলকর, পেলে থেকে মারাদোনা, লতা মঙ্গেশকর থেকে আশা ভোঁসলে, রামকিঙ্কর বেইজ থেকে প্রকাশ কর্মকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সমরেশ বসু, এঁরা প্রত্যেকেই কিংবদন্তী মানুষ। প্রতিভার শীর্ষে স্থান করে নিয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষাকে একটুও পাত্তা না দিয়েই। তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন শেখার (learning)-এর মধ্য দিয়ে। এমন উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে।***

ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার জন্য সন্তানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করবেন না। প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সন্তানদের সঙ্গে পড়াশুনার প্রতিযোগিতায় নামিয়ে

তার স্বাভাবিক ভালোবাসার সময়গুলোকে কেড়ে নেবেন না। যে কোনও কাজে পটু হয়ে উঠলে জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ অবশ্যই পাওয়া যায়।

পাঁচ : একটি ছেলে কলেজের পড়া শেষ করে এখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। মালদায় গেছে যুক্তিবাদী সমিতির কনফারেন্সে প্রতিনিধি হিসেবে। ভালো ছাত্র, লেখার হাত ভালো। কিন্তু খারাপ যেটা, সেটে হল ব্যক্তিত্ব নড়বড়ে। কখন দাঁত মাজবে, সাবান কোথায় রাখবে, শ্যাম্পু করবে কিনা, এখন খেতে বসবে কিনা—সবকিছু নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবে! সব কিছুতেই শিশুসুলভ পরনির্ভরতা। ছেলেটি নাকি আবার প্রেম করে! চিঠিতে-চিঠিতে প্রেম।

কথা বলে জেনেছি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেটিকে মা-বাবা মানুষ করেছেন একটু 'বেশি যত্নে'। কখন গলায় মাফলার জড়াবে, কখন পড়তে বসবে, কখন খাবে, সব মা বাবার রুটিন মাফিক। বন্ধু নেই। কলেজ থেকে ফিরতে হবে ক্লাশ শেষের আধ ঘণ্টার মধ্যে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মেরে বা খেলে সময় নষ্ট না করে পড়তে বসতে হবে। পড়াশুনার বাইরে ইচ্ছে মতো বই পড়া চলবে না।

এক টিচারের কাছ থেকে আমার লেখা পড়ে যুক্তিবাদের প্রতি আকর্ষিত হয়। টিচারের প্রযত্নে চিঠি দিয়ে আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। কনফারেন্সে এসেছে 'তাপ্পি' মেরে।

ছোটবেলা থেকে মা-বাবা যে কড়া শাসনের মধ্যে রেখেছেন, তা ওর ব্যক্তিত্বকে তলানিতে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মা-বাবার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে করতে নিজে ভাবার, নিজে করার, নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। কর্মজীবনে এবং বিবাহিত জীবনে এর ফল ভোগ করতে হবে-ই ছেলেটিকে। বান্ধবী স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের হলে ছেলেটির শিশুসুলভ আচরণ দেখলে তার প্রেম কর্পূরের মতো-ই উবে যেতে বাধ্য। কতদিন মেয়েটি মানসিকভাবে পিষ্ট হবে?

মেয়েটির শুভার্থীরা এমনকী কোনও কোনও মনোবিদ্ হয়তো বিয়ের পরের সমস্যা মেটাতে কিছু উপদেশ দেবেন। বলবেন, 'স্বামীর' স্বভাবের ভালো গুণগুলোকে ভালভাবে গ্রহণ কর। দেখবে ধীরে ধীরে স্বামীর ভালোত্বের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ। ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে স্বামীকে মানসিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলো।

বলা যতটা সোজা, করা ততটাই কঠিন। দু-চার বছরে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেই। তার চেয়ে অনেক সোজা ছেলেটিকে এখনই কোনও মনোবিদের কাছে কাউন্সেলিং-এর জন্য পাঠানো। কাউন্সেলিং কোনও ম্যাজিক নয়। এর জন্য

পরিবারের প্রত্যেকেরই সহযোগিতা করতে হবে কাউন্সেলারের সঙ্গে। তাঁর কথা মতো ছেলেটির সঙ্গে 'বিহেভ' করতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে ছেলেটিকেও। স্বাভাবিক করে তুলতে এক বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় লাগাতে-ই পারে।

ছয় : দুটি মেয়ে একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থেকে বি এ পড়ছে। হোস্টেলের অনেকেই শুভকামী। সমকামিতার পাশাপাশি ছেলেদের সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক করে সুযোগ পেলে। কিন্তু মেয়ে দু'টি সারাজীবন বন্ধু হয়ে 'লিভ টুগেদার' করতে চায়। এনিয়ে সমস্যা হবে কি? আমার কাছে এই ছিল ওদের জিজ্ঞাসা।

যুক্তিবাদী সমিতির স্টাডি ক্লাশে মেয়ে দুটির সমনে সমস্যাটিকে নিয়ে আলোচনা করেছি। কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছে, বছর কয়েক আগে 'ই টিভি'তে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নিই। বিতর্কের বিষয় ছিল 'সমকামিতা সহজাত প্রবৃত্তি নাকি মানসিক রোগ'। আমি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বিদেশী মনোবিজ্ঞানীদের মতামত এই প্রসঙ্গে তুলে ধরি। এবং বলি, ইন্টারনেট সার্ফিং করে বিষয়টি নিয়ে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব পাবেন, তাতে দেখতে পাবেন 'সমকামিতা' একটা অস্বাভাবিকমানসিক আচরণ। এটা কোনওভাবেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়।

সেনা ব্যারাকে, পুলিশ ব্যারাকে, জেলে, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক হোস্টেলে সমকামিতার প্রচলন আছে। 'যৌনতা' স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এইসব জায়গাগুলোতে পর্ণোবই, ব্লু-সিডি দেখার চল রয়েছে। স্থূল যৌনতা দেখতে দেখতে বিপরীত লিঙ্গের অভাবে সমকামিতার শিকার হয় ওরা।

এইসব সেনা-পুলিশ-ছাত্র-ছাত্রীরাই আবার বিয়ের পর বিপরীতকামী হয়ে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগতভাবে উভকামী গোষ্ঠী তৈরি হয়। গো-বলয়ে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কোনও পুরুষ বউ থাকা সত্ত্বেও পুরুষকে বা যৌনসঙ্গী হিসেবে অর্থের বিনিময়ে রেখে দেয়। এটা সংস্কৃতিগতভাবে গর্বের প্রতীক; যেমন, 'বাবু কালচারের যুগ'-এ বাঙালি ধনী সম্প্রদায় রক্ষিতা পুযতো।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যারাক বা হোস্টেল জীবনের সাময়িক অভ্যাস কাটিয়ে বিবাহিত জীবনে এরা স্বাভাবিক যৌন আচরণ করে। ব্যতিক্রমীর সংখ্যা শতকরা হিসাবে আসে না।

কোনও কোনও পুরুষ পুরুষত্বহীন হয় শুধুমাত্র ভুল ধারণা পোষণ করে। তারা বিভিন্ন যোগের ও ব্রহ্মচর্যের বইপত্তর পড়ে জেনেছে—বীর্য মানে তেজ। বীর্যক্ষয় অর্থাৎ তেজের ও জীবনীশক্তির ক্ষয়। স্রেফ এমন একটা ভুল ধারণা মাথায় পুষে রাখার ফলে বিয়ের পর স্বাভাবিক যৌনজীবনে প্রবেশ করতে পারে না। মানসিক কারণে পুরুষত্বহীনতায় ভোগে।

একইভাবে ছোট্ট বেলায় কোনও ছেলেকে যদি পরিবারের লোকেরা প্রায়শই

মেয়ে সাজিয়ে ওর রূপের প্রশংসা করতে থাকে, তবে তার মধ্যে এক নারী-মানসিকতা গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে এদের-ই কেউ কেউ শরীরে পুরুষ হলেও মনের দিক থেকে নারীতে রূপান্তরিত হয়। এরা পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে উৎসাহী হয়।

শারীরিকভাবে আকর্ষণহীন নারীদের কেউ কেউ সমকামী হয়ে ওঠে। ভালোবাসার পুরুষ এলে সমকামী জীবন থেকে বেরিয়ে আসে অনেকে-ই। তবে দীর্ঘকাল ধরে সমকামিতায় অভ্যস্ত হলে অনেক সময় তাতেই পুরোপুরি অভ্যস্ত ও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যৌনজীবনের আকর্ষণ তাদের শুরুই হয় না।

সমকামিতা সহজাত প্রবৃত্তি নয়—একথা বলার অর্থ এই নয় যে, সমকামিতা মাত্রেই সাংঘাতিক খারাপ, সমকামী বহুগামী হলে অবশ্যই খারাপ। উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনের জন্যই খারাপ। ভালোবাসাহীন দেহ মিলনের জন্যই খারাপ। সমকামী একগামী, ভালোবাসা গভীর হলে খারাপ বলি কী করে? দুটি নারি বা দুটি পুরুষ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া সারাটা জীবন কাটালে তা কখনই বেআইনি বলে গণ্য হবে না। তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশ্যে না আনলেই হল। কারণ সমকামিতা এদেশে অপরাধ। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন কোনও অপরাধ নয়। কিন্তু দু-জন নারী বা দু'জন পুরুষের দৈহিক মিলন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটাকে মাথায় রাখতে হবে।

সাত : মেয়েটি স্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান। আদরে মানুষ। প্রগতিশীল পরিবার। সহপাঠী একটি ছেলের সঙ্গে স্টেডি বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে দুই পরিবারেও সখ্যতা। ক্লাশ এইট থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্ক ভাঙলো টুয়েলভে। এক বুদ্ধিহীন সুন্দরীকে নিয়ে মেতে উঠেছে ছেলেটি।

মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমব্যথী বাবাও মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। মা কিন্তু একটুও ভেঙে পড়েননি। তিনিই কাউন্সেলিং করলেন। কয়েক দিনের মধ্যে মেয়ের মাথায় ঢোকালেন (এক) যে ছেলে সুন্দরী দেখলেই বন্ধুত্ব ছাড়তে পারে, সে আরও বেশি সুন্দরী পেলে একেও ছাড়বে। (দুই) এমন তরলমতি ছেলের সঙ্গে জীবনটা যে আরও বেশি রকম জড়িয়ে যায়নি, এটা ভালো হয়েছে। (তিন) বিশেষ একজনকে পেলেই জীবনে সুখী হবো, এ ধারণাটাই ভুল। দেখতে হবে যাকে চাইছি, সেও আমার চাওয়ার উপযুক্ত কিনা? (চার) অনেকের ভালোবাসা ও অনেক সম্পর্কের সঙ্গে একটা জীবন জড়িয়ে থাকে। শুধুমাত্র একটা ভালোবাসা বা সম্পর্ক ভাঙার উপর জীবনের সার্থকতা আদৌ নির্ভর করে না। (পাঁচ) অপাত্রে ভালোবাসা দিলে সেটা ভুল। কিন্তু দারুণ দুঃখ পাওয়ার মতো কোনও ব্যাপার নয়।

মায়ের কাউন্সেলিংয়ে অসাধারণ কাজ হয়েছে। পরিবর্তে মেয়ের তালে তাল রাখতে আ...হাঃ... উঃ... হু... করলে মেয়ের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ভারসাম্য হারাতে বেশি দেরি হতো না।

আট : রাণা আমাদের সমিতির ছেলে। তখন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষার দিন সাতেক আগে মা মারা গেলেন। মা ছিলেন রাণির সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। খবর পেয়েই দেশের বাড়ি অন্ডাল গেল। তিন দিনের মাথায় ওর মামাতো ভাই ফোনে খবর দিল, রাণার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকছে। চোখ থেকে জল পড়ছে যখন তখন। পরীক্ষার পড়া সব ভুলে গেছে। পরীক্ষায় বসবে না বলছে। এও জানলাম, পাড়াপড়শি, আত্মীয়-স্বজনরা অনবরত আসছেন, আর রাণাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

বললাম, কড়া হাতে লোক আসা বন্ধ কর। সহানুভূতি তো নয়-ই। এই সময় সহানুভূতি রাণাকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। দুঃখের আবেগকে উসকে দিচ্ছে। এই উৎপাত, অত্যাচার এক্ষুনি বন্ধ না করলে রাণা গেল। কালই ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে চলে এসো।

রাণা এলো সকালেই। আমার সঙ্গে আড্ডা দিল। দুপুরে ক্রিকেট খেলা দেখলো। বিকেলে মহাজাতি সদনে (সরকারী হল) জ্যোতিষ সম্মেলন বানচাল করায়, ভাঙাফোর করায়, জনা তিরিশেকের একজন হিসেবে অংশ নিল। কোয়াইট ওকে। হোস্টেলে ফিরে গেল। তারপর থেকে নো প্রবলেম।

নয় : আপনার আংটিটা খুলে রেখে ছিলেন বাথরুমে। স্নানের পর পরতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন মনে পড়লো, বাথরুমে গিয়ে দেখলেন, আংটিটা ভ্যানিস, কী হলো? কাজের মেয়েটা... ? ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে মাঝে-মধ্যে টাকা কমছে। ঘরেতে-ই কি চোর পুষছি? ভাবলেন আপনি। ভাবনাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু এখন যা হচ্ছে, তাতে তো চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। দামি দামি এবং দুষ্প্রাপ্য বই মাঝে মধ্যে আলমারি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বই চুরি, কাজের মেয়েটির কাজ হতে পারে না। বাইরের এত লোক ফ্ল্যাটে আসেন, তাঁদের মধ্যে কেউ? গ্রন্থপ্রেমিক তো কম আসেন না। হতেই পারে তাদের মধ্যে কেউ...

সন্দেহের বাইরে রেখেছেন আপনার একমাত্র ছেলেকে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। সেকেন্ড ইয়ার। কেন ওকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখেছেন? গভীর স্নেহ ও বিশ্বাস অটুট তাই?

ছেলে কি প্রায়-ই ঝিমিয়ে থাকে। অসময়ে অসময়ে বাইরে বেরিয়ে যায়? শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যে যত্ন আগে নিত, এখন কি তা নেয় না?

ঠিকমতো ক্লাশ করছে কিনা জানেন? পড়াশুনায় যে প্রচণ্ড আগ্রহ এক বছর আগেও ছিল, এখন কি তাতে ভাটা পড়েছে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর আপনাকেই খুঁজতে হবে। কারণ ছেলে আপনার। ওর ভালোমন্দ আপনাকেই দেখতে হবে। খোঁজ নিলেই হয়তো আবিষ্কার করবেন, বেশ কয়েকমাস ধরে আপনার ছেলে ড্রাগের নেশা ধরেছে। ড্রাগের টাকা যোগাতে বাড়িতে চুরি করতে শুরু করেছে। বাড়ির চুরি বন্ধ করলে বাইরে চুরি করবে, ছিনতাই করবে। কারণ প্রতিদিন ওর ড্রাগ চাই-ই।

সন্তানকে বিশ্বাস করাই সম্পর্কের ভিত। কিন্তু একে অপরের বিষয়ে জানাটাও জরুরি। 'সন্তানের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাই না'—এটা আপনার চোখে প্রগতির লক্ষণ মনে হতেই পারে। কিন্তু এই মানসিকতা সংসারের ভারসাম্য নষ্ট করলে দোষী হবেন আপনি-ই, আপনার স্বার্থপরতা।

সন্তানের প্রয়োজনীয় সব চাহিদা মেটাবার মতো অর্থ ব্যয় করলেই কিন্তু কর্তব্য পালন হয় না। সন্তানের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। সন্তানকে সময় দিতে হয়। তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। তার বন্ধু হতে হয়। তার আদর্শ হতে হয়।

অনেক সময় মা-বাবার উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি, চরিত্রহীনতাতে আঘাত পেয়ে আঘাত ভুলতেও তারা ড্রাগ ধরে। মা-বাবাকেও তাই আদর্শ চরিত্র, আদর্শ মা-বাবা হয়ে উঠতে হবে। নতুবা দেখা যাবে, নার্সিংহোমে রেখে সন্তানকে একবার করে সুস্থ করে তুলছেন, আবার সে নেশা ধরছে। কারণ তার মানসিক আঘাত পাওয়ার অবস্থাটা থেকেই গেছে। তাই আঘাত ভুলতে বা প্রতিশোধ নিতে নিজেকে সে আবার নেশায় ডুবিয়ে রাখছে।

দশ : কাঁকুরগাছির একতলার বিশাল ফ্ল্যাটে থাকেন অচিন্ত্য। পরিবারে আর আছেন স্ত্রী নয়না ও ছেলে রুদ্র। দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন অচিন্ত্যর দিদি মল্লিকা, তাঁর বর শরৎ ও ছেলে অর্ঘ, মেয়ে নন্দিনী।

অচিন্ত্য ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়র, বি. ই। পেশায় খুব ব্যস্ত। নয়নাও তার ইমপোর্ট- এক্সপোর্ট ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। একাধিক টিচারের কাছে টিউশন নিতে যায় রুদ্র। মাধ্যমিকে ফেল করলো রুদ্র। মা-বাবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সম্মানে বিরাট আঘাত লাগলো। ছেলের উপর ক্ষোভ উগরে দিতে লাগলেন দু-জনেই। ক্ষোভের আরও কারণ— রুদ্রর পিসতুতো দাদা অর্ঘ পুনে থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কমপ্লিট করে বম্বেতে কাজ করছে। সাজান ফ্ল্যাট-গাড়ি-সারভেন্ট কোম্পানি থেকে দিয়েছে। কত-ই বা বয়স? ২৪ বছর হবে। পিসতুতো বোন নন্দিনী বম্বেতে। অ্যাডভারটাইজিং-ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পোস্টগ্রাজুয়েশন করছে। ঝক্‌ঝকে মেয়ে। মল্লিকা ও শরৎ দু-জনেই মোটামুটি বড় চাকুরে। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটে সকাল থেকে রাত। তারপরও ওপর তলার ওদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে লজ্জায়

মাথা কাটা যায় রুদ্রর মা-বাবার। বুঝতে পারেন না রুদ্রর গোলমালটা কোথায়।

একজন শিশুর বেড়ে ওঠার সময় থেকেই মা-বাবার উচিত তার বন্ধু হয়ে ওঠা। তাকে 'বড়' হয়ে ওঠায় সাহায্য করা। তার সুবিধে অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখা। কখন খাবার দিতে হবে, টিফিনে কী দিতে হবে, টিচার কেমন পড়াচ্ছেন? হোমওয়ার্কে সাহায্য করা, তাদের খেলা-ধূলায় উৎসাহ দেওয়া, সন্তানের সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাদের মাঝে-মধ্যে আমন্ত্রণ করে খাওয়াতে ছোট-খাট পার্টি দেওয়া—এসেবরই প্রয়োজন আছে বইকী। ছেলে-মেয়েদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড় হওয়ার জন্য প্রতিটি দিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মল্লিকা। বড় পদে কাজের দায়িত্ব এবং অনেক সামাজিক দায়িত্ব সামলেও সন্তানদের প্রতি তাঁর 'অ্যাটিটিউড' বা মনোভাব তাঁর সন্তানদের এই অবস্থায় পৌছোবার পক্ষে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

ঠিক একই সময়ে রুদ্র তাঁর জীবনে একটা বিপরীত ব্যবহার মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। মা-বাবার নিস্পৃহতা এবং একই সঙ্গে অর্ঘ ও নন্দিনীর প্রতি তাদের মায়ের অর্থাৎ পিসির অফুরন্ত ভালোবাসা রুদ্র দেখে আসছে। এগুলো তাকে ব্যথিত করছে। সে লেখাপড়ায় খারাপ হয়ে বখে গিয়ে মা-বাবার উপর প্রতিশোধ তুলছে। মা-বাবা কোনও দিনই মন উজাড় করে ছেলের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে উঠতে পারেনি। শুধু রেজাল্ট কেন ভালো হল না—বকলেই ভালো হবে? অর্ঘ-নন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করে অপমান করার চেষ্টা করলে হবে? মল্লিকার মতো 'নারসিং' না করেই মল্লিকার মতো ফল চাইলে হবে?

এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। সমস্যাটা গুরুতর আকার নিয়েছে। মনোবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটা খুবই জরুরি।

সমস্যা যখন বড়দের

এক : শুভেন্দু আর সুলগ্না কলেজ জীবন থেকেই ছিল 'মেড ফর ইচ আদার'। দু'জনেই পড়াশুনায় ভালো। দু'জনের পরিবারই অতি স্বচ্ছল। দুজনই মাস্টার ডিগ্রি করেছে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। দুজনেই মুম্বাইয়ের দুটি কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে। থাকতো শুভেন্দুর কোম্পানির ফ্ল্যাটে। একসঙ্গে থাকতে থাকতে শুভেন্দু আবিষ্কার করলো, সুলগ্না বড় বেশি রকমভাবে শুভেন্দুর বিষয়ে যত্নবান হয়ে পড়েছে। কটা সিগারেট কখন কখন খাবে, ক'পেগ হুইস্কি পান করবে, কবে চুল কাটবে, বাঁ দিক ফিরে না শুয়ে যেন ডান দিক ফিরে শোয়া অভ্যাস করে ইত্যাদি। ফলে সম্পর্কটা আর টানা গেল না।

দুই : সঞ্জয়ের সঙ্গে সুজাতার গভীর বন্ধুত্ব ১৪ বছরের। কিন্তু তারপরেও

কোনও একটা ঘটনা নিয়ে দু'জনের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কের তিক্ততা দু'জনেই কারও কাছে প্রকাশ করেন না। কেন করেন না? এক সময়ের প্রিয়তম মানুষ ছিলেন বলে? ভবিষ্যতে সম্পর্কটা জোড়া লাগতে পারে ভেবে? নাকি শুধুই রুচির ব্যাপার?

সুজাতা মাঝে মধ্যে মেজাজ রাখতে পারেন না। সঞ্জয়ের মুখোমুখি হলে মাঝে মধ্যে বিস্ফোরিত হন। সঞ্জয় চুপ থাকেন, 'একজন গরম থাকলে অপর জন ঠান্ডা থাকা ভালো ভেবে।

সম্পর্ক আর আগের মতো হবে না—ধরে নিয়েও তিক্ততা বাড়াতে চান না সঞ্জয়। রাগ উগরে দেওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন নীরবতা। তারপর সুজাতা-ই বলেন, পুরোন প্রসঙ্গ টেনে আর কষ্ট দেবো না তোমাকে।

যাক, এইটুকু তো বলেছে। এতেই সঞ্জয়ের মন খারাপ একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে থাকে।

সঞ্জয়-সুজাতা তো আপনি আমিও হতে পারি। আমাদের সম্পর্কে তিক্ততা নেমে এলে এমনভাবে বিষয়টাকে গ্রহণ করলে সুন্দর হয় না কি?

তিন : ঠাকুরপুকুরের এক গৃহবধূ। বয়স ৩০। বরের বয়স প্রায় চল্লিশ। বিয়ে হয়েছে বছর আটেক। চার বছর আগে একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেন। তারপর থেকে মনে হচ্ছে, মৃত সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য হাজবেন্ড একটু একটু দূরে সরে যাচ্ছেন। সেই সময় তাঁর পাশে বন্ধুর মতো এসে দাঁড়ায় ৫ বছরের ছোট দেওর। ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে একটা শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারে এই তিনজনের বাইরে আর আছেন শাশুড়ি। বর ও শাশুড়ি দু'জনেই বউদি দেওরের শারীরিক সম্পর্কের কথা জানেন। গৃহবধূটি জানেন, পরিবারের কারও কাছেই বিষয়টি গোপন নেই। এই চিন্তা বধূটিকে অপরাধ বোধে তাড়িত করে ফিরছে। বর ও দেওর দুজনের সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক রাখার কারণে নিজের উপর ঘেন্না হচ্ছে।

একজনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বাড়লে সেই ফাঁকা জায়গা পুরণ করতে আর এক জনের প্রবেশ ঘটার মধ্যে অনৈতিক কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু একই সঙ্গে দেওর ও বরকে বিছানায় তোলাটা অবশ্যই অনৈতিক। গৃহবধূটির উচিত বর ও দেওরকে নিয়ে একসঙ্গে জটিল বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসা। যদি বউটি নিশ্চিত হন, মানসিক শূন্যতার সময় দুর্বল মুহূর্তে কিছু ঘটে গেছে; সেই ঘটনাকে আর টানতে চান না—সে কথাও দু'জনকেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন। তারপর পুরনো স্মৃতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। সমাজসেবামূলক কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত করুন। বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়ে দিন। প্রয়োজনে দত্তক নিন। তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুন।

আলোচনার সমাপ্তি এমন হতে পারে, চাকুরে দেওর আপনাকে বিয়ে করতে রাজি। বরকে ডিভোর্স দিয়ে দেওরকে বিয়ে করুন। একটু সাহসী হলে দেখবেন, নতুন জীবনে কোনও সমস্যা নেই। নতুন জায়গায় ঘর ভাড়া নিন। পুরনো স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে নতুন জীবনযাপন করুন। বিয়েতে বন্ধু-আত্মীয়দের আমন্ত্রণ করুন। যাঁরা সম্পর্কটাকে চাটনি না করে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যোগাযোগ রাখতে পারেন।

দুজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখলে অপরাধবোধ আসতেই পারে। অথবা ভবিষ্যতে আপনি আরও বড় রকমের বহুগামী জীবনে ঢুকে পড়তে পারেন। যার আর এক নাম 'ল্যাম্পট্য'।

চার : প্রথমার প্রিয়মানুষ অনুপ। প্রথমা ও অনুপ দু'জনেই জীবনে সফল, প্রতিষ্ঠিত, কাজপাগল। প্রথমা কাজের সঙ্গে বন্ধু-আত্মীয়, প্রবাসী ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ, পাড়ার রিক্সাওয়ালা থেকে রান্নার মাসির বিপদ-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়া, নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিটি ছেলে-মেয়েদের সুবিধে অসুবিধে খোঁজখবর রাখা সব কিছুতেই নিখুঁত।

এরই পাশাপাশি ভালো সিনেমা, থিয়েটার, গান শোনা, আড্ডা দেওয়া ওর চাই-ই। এগুলো ওঁর বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস! সবচেয়ে ভালোবাসায় মানুষ অনুপ মেধাবী, লড়াকু মেজাজ আর সারল্যের মিশ্রণে গড়া একটি চরিত্র। অনুপ সব সময় বড় বেশি কর্মব্যস্ত। হয় তো কর্মব্যস্ততা প্রথমার চেয়ে কম। হয়তো বা বেশি। কিন্তু অনুপের একটা ব্যবহার মাঝে মাঝেই প্রথমাকে ব্যথিত করে। অনুপ সব সময়ই নিজেকে এত বেশি রকম কাজেকর্মে ব্যস্ত রাখে যে, প্রত্যেক দিনই যে কিছুটা সময় নিজের জন্য একান্ত করে রাখতে হয়, ভুলে যান। প্রতিদিন দু'জনে যখন কথা হয়, তখন অনুপ কোনও নতুন পড়া আর্টিকেল নিয়ে বা নতুন পড়া বই নিয়ে আলোচনা করেন না, বিশ্লেষণে নামেন না। শুধু 'আপনাতে আপনি বিভোর' থাকতে ভালোবাসেন। অনুপের কাজের নেশা, শোষিত সমাজের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, প্রজ্ঞা ও সাহসকে শ্রদ্ধা করেন বলেই বোধহয় প্রথমার প্রিয়জন অনুপ। কিন্তু গল্পহীন, কাজ পাগল এমন মানুষকে রস-কষহীন মানুষ মনে করে মাঝে মাঝে মানসিক দূরত্ব অনুভব করেন প্রথমা।

সুসম্পর্কের চাবিকাঠি হল ভিন্নতাকে মেনে নেওয়া। প্রত্যেকটা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। অনুপের আদর্শ যদি হয়ে থাকে, সমাজকে সুন্দর বানানোর পরিকল্পনাকে সার্থক করার চেষ্টা, তাতে তো বাধ সাধছেন না প্রথমা। বরং সে কাজে অনুপকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেন যিনি, তিনি প্রথমা।

অনুপ প্রথমার সঙ্গ ভালোবাসেন। কথা বলতে ভালোবাসেন দিনে পাঁচ-সাতবার ফোন করবেনই। প্রথমার প্রতি সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দায়িত্ব সবই স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে পালন করেন। একগামী অন্তরস্থল থেকে। স্বপ্নেও অন্য নারী আসেন না। তারপরও কেন যে....

অনুপ উচ্চ মেধার পাঠক। তাঁর কাছে লেখকদের নাম নয়, লেখার প্রতিটি তত্ত্ব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। 'বিখ্যাত' লেখকদের ভুলে ভরা অংশে লাল কালিতে ক্রস কেটে নোট লেখেন বইতে। এটাই তাঁর পড়ার স্টাইল। কিন্তু সেসব কেন প্রথমার সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে না? প্রথমার প্রতি মুগ্ধতায়? প্রথমা সঙ্গে থাকলে যে মেট্রো স্টেশনে নামবেন, নামেন তার দু-তিনটে স্টেশন পরে। বাস, স্টপেজ ছাড়ায়। যে ম্যাগাজিনটা প্রথমাকে দেবেন বলে নিয়ে বেরিয়েছেন, সেটা না দিয়েই ফেরেন। এসবই ঘটে ভুলের জন্য। অনুপ কখনই ভুলো নন। ভুল হয় প্রথমাকে দেখলে। প্রথমা সাদামাটা চেহারার মানুষ। শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার মতো নন। প্রথমার ব্যক্তিত্ব, মেধা, সহমর্মিতা মুগ্ধ করেছে অনুপকে।

সেই যে শুরুতে যে কথা বলেছিলাম। আবারও সে কথাটাই মনে করিয়ে দিতে চাইছি—সুসম্পর্কের চাবিকাঠি হল চারিত্রিক বিভিন্নতাকে মেনে নেওয়া।

প্রথমা কী তাঁর পছন্দের সিনেমা বা থিয়েটারে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন অনুপকে? অনুপ রাজি হওয়ার পরও সময়াভাবে তখনই যেতে না পারায় প্রথমা অবস্থার চাপে অন্যের সাথে তা দেখে ফেলেছেন? অনুপ তা জেনেছেন? এ নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও তিক্ততা দেখা দেয়নি। কিন্তু অনুপের মন খারাপ কি হয়নি? আগেই দেখে ফেলেছেন, এটা না জানিয়ে আর একবার একসঙ্গে দু'জনে আর একবার দেখলে ভালো হতো। তারপর নিশ্চয়ই দুজনে সিনেমা বা থিয়েটারটি নিয়ে বিশ্লেষণে নামতে পারতেন। দেখতেন, আলোচনা-সমালোচনা তরতর করে এগোতো। অনুপের সঙ্গে সিনেমা দেখার কথা না রাখার পর অনুপকে যখন সিনেমাটি দেখতে বলেছেন, তিনি দেখেছেন? সম্ভবত তিনি দেখেননি। আপাত কঠিন-কঠোর মানুষটিরও একটা দুর্বল জায়গা আছে। বুঝতে হবে। অভিযোগের আঙুল তোলার আগে বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে নামার দরকার। নিজেকে কোথায় কতটা পাল্টাবো—তা বুঝতে হবে। অন্যকে পাল্টাতে চাপ দেওয়ার দরকার হয় না। বিহেভিয়ার পাল্টানো যায় সুন্দর বিহেভিয়ারের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে।

প্রথমা দেখতে সাদামাটা হলেও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মন টানে। কো-এড কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ও এক্সিকিউটিভ পদে দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে ও খুব সহজে মিশতে পারেন ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। আবার দরকার মতো দূরত্বও রাখতে জানেন। স্বাভাবিকভাবেই ওর বন্ধুর সার্কলটা বেশ বড়। ও খুব পপুলার।

ওর ইদানিং মাঝে মাঝে মনে হয় অনুপ যেন বড্ড বেশি নজরদারি করে, ও কখন কার সঙ্গে, কতটা কথা বলছে—তাই দেখে কে কি ভাবতে পারে ইত্যাদি নিয়ে। এটা প্রথমার কাছে অসহ্য ঠেকে। ওর মনে হয় সম্পর্ক ভালো থাকে যদি দুজনের মধ্যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা অটুট থাকে।

প্রথম আলাপে যেমন খুঁতগুলো চোখে পড়ে না—তেমনি সম্পর্ক পুরনো হলে পরস্পরের ব্যবহারিক ত্রুটিগুলো বড্ড বেশি চোখে পড়ে। গুণগুলো গা-সওয়া হয়ে যায়। তাই সম্পর্ক পুরনো হলেও টিকিয়ে রাখতে হলে—প্রথমত, পরস্পরকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয়; ছোটখাট ভুল ত্রুটি (যেমন জন্মদিন ভুলে যাওয়া) নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। দ্বিতীয়ত, ভুল বা ব্যবহারিক ত্রুটিগুলোকে কিছুটা হিউমার বা ঠাট্টা দিয়ে উড়িয়ে দিতে জানতে হয়। এর জন্য চাই দু পক্ষের উদারতা।

নয়ত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সুলভ সন্দেহ প্রবণতা ও অতিমাত্রায় অধিকার সচেতনতা বা 'পসেসিভ্‌নেস্‌' এসে গেলে সম্পর্ক পুরো ভেঙে যাওয়াও বিচিত্র নয়। না ভাঙলেও যা পড়ে থাকে তা যান্ত্রিক, আবেগহীন অভ্যাস।

দু'জনের ছোটো-খাট দোষত্রুটি ভুল দু'জনকেই বুঝতে হবে, মেটাতে হবে, নতুবা ফাটল বাড়বে। সঙ্গে একে অন্যকে বুঝতে হবে। দেখতে হবে অন্যকে বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? হতেই পারে। অভিমান আঁকড়ে থাকা ভালো নয়। আবার সেটাকে 'সন্দেহ' ভাবছেন, আদৌ কি তা সন্দেহ? নাকি বোঝার ভুল? সন্দেহ হলে বিশ্বাসের ভিত ভাঙবেই। ভাঙবে-ই বন্ধুত্ব।

পাঁচ : স্ত্রী গৃহবধূ। চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাণপণে। পরিবার বলতে শিশুকন্যা ও বর। মেয়ে ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। বিয়ের এক বছর পর থেকে বরের সঙ্গে কোনও শারীরিক সম্পর্ক নেই। বর জানিয়ে দিয়েছে—অমন ক্যাডবেরি বেবি মার্কা বউয়ের সঙ্গে 'ইয়ে' করা অসম্ভব।

অফিসে বিভিন্ন সময় খবর নিয়ে জেনেছেন, প্রায়ই অফিস যান না। অথচ টাকার সাচ্ছল্য উপছে পড়ছে। ঘুষ? সুযোগ আছে। কিন্তু কাজে না গেলে ঘুষ খাবে কী করে? দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে চাকরি গেছে। তারপরও টাকার রমরমা একটুও কমেনি। জিমে যায়। দামি জামাকাপড় পরে। চোখের রোদ চশমা থেকে হাতঘড়িটা পর্যন্ত ইমপোর্টেড। বিদেশী প্রসাধনে অভ্যস্ত। ট্যাক্সি ছাড়া চড়ে না। দুপুর বারোটা নাগাদ বের হন। রাত করে ফেরেন। কী যে করছেন? কখন ফাঁসবেন ভেবে সব সময় উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় স্ত্রীকে।

গৃহবধূ ও তাঁর পরিবার আমার পরিচিত। কিন্তু সমস্যার যে কথা আমাকে শুনতে হলো, তা ছিল সম্পূর্ণ অজানা। তরুণটির সুন্দর ব্যবহার, গভীর কণ্ঠস্বর, আকর্ষণীয় চেহারা ও সাজপোশাক, হিউমার সেন্স ও আপাত-পরিচ্ছন্ন মানুষটির যে নতুন পরিচয় স্ত্রীর কাছ থেকে পেলাম, তা অজানা ছিল। কিন্তু অবাক্ হওয়ার

মতো কিছু ছিল না। এমন চরিত্রের মানুষ 'পুরুষ বেশ্যা' পেশায় থাকে। সাধারণভাবে এদের ক্লায়েন্ট অবাঙালি (প্রধানত মাড়োয়ারি) এবং বিবাহিত, বিবাহবিচ্ছিন্ন, বিধবা বা বরপ্রবাসী এমন ধনী রমণীরা। লজ, রিসর্টস, হোটেল, ক্লায়েন্টের ফ্ল্যাট বা অফিস-চেম্বার হলো এদের মিলনস্থল। এইসব পুরুষ দেহজীবী বা কলবয়দের বলে 'জিগোলা' (gigolo)। এরা কেউ-ই পেটের দায়ে এ লাইনে আসেনি। মস্তি করবো আবার মোটা রোজগার করবো—এই মানসিকতা থেকে এরা এসেছে। রোজগার দৈনিক এক হাজারের নিচে নয়।

এরা মোটা টাকা গুণে নেয়, যখন তিন-চার বা পাঁচজন মহিলা এক সঙ্গে ভাড়া করে। মিউজিকের তালে তালে ছেলেটি নাচতে নাচতে পোষাক ছাড়তে শুরু করে। উত্তেজিত মহিলারও নগ্ন হয়। তারপর শুরু হল অতি নোংরা যৌনতা। প্রত্যেক ক্লায়েন্ট যেহেতু শক্ত পৌরুষ নিয়ে খেলতে চায়, তাই প্রত্যেক জিগোলোকেই এমন খেলার আগে 'ভায়গ্রা' জাতীয় ওষুধ খেতে হয়। এখানে পূর্ণ শরীরী মিলন হয় না। একাধিক ধনী সুন্দরীদের শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কম করে হাজার তিনেক টাকা রোজগারের মধ্য দিয়ে জিগোলোদের বিকৃত কামনা চরিতার্থ করা ও রোজগার দুই-ই হয়। উচ্চবিত্তের ক্লায়েন্টদের তুষ্ট করতে গৃহবধূটির বর খুবই আদর্শ।

বউটিকে কোনও মিথ্যে আশার কথা না শুনিয়ে নির্মম সম্ভাবনার কথা জানালাম। বললাম, এমন বন্ধনটিকে টিকিয়ে রেখে প্রতিদিন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য না করে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবুক। স্বনির্ভর হওয়ার মতো যোগ্যতা যখন আছে, তখন সেই যোগ্যতাকে প্রয়োগ করুক।

হ্যাঁ ওরা এখন বিচ্ছিন্ন। প্রতিদিনের নোংরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।

ছয় : উদিত বিয়ে করেছে রচনাকে। পরিচয়, প্রেম, বিয়ে। রচনার অভিযোগ, উদিতের চয়েস বলে কিছু নেই। কি যে হিজিবিজি শাড়ি কিনে আনে। বাধ্য হয়ে আবার ওকে নিয়ে দোকানে যেতে হয়, পাল্টে আনতে হয়। আমি কী ধরনের শাড়ি কিনি, কী কসমেটিক্স ব্যবহার করি, তার খবরও রাখে না। সে কথা বললে আবার বাবু'র অভিমান হয়।

অত 'সত্যবাদী যুধিষ্ঠির' হওয়া যে অনেক সময় অনেক বড় ক্ষতির শুরু করতে পারে, সেই বোধ রাখতেই হবে রচনার। হাজবেন্ডের আনা শাড়িটা না হয় খুব অপছন্দই হলো ; কিন্তু তিনি তো আপনার জন্যে খুব খুশি মনেই কিনেছেন। যদি হেসে বলতেন, 'খুব সুন্দর হয়েছে' মহাভারত অশুদ্ধ হতো না ; হাজবেন্ডও খুশি হতেন। একটা ছোট্ট মিথ্যেতে যেখানে খুশি আনতে পারতেন, সেখানে দুঃখ

দিলেন কেন? দুঃখ দিয়েছেন, দুঃখ দিতে চান বলে। অথবা আপনার রুচি খুবই বদখত।

শুধু হাজবেন্ড-এর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে একটা দারুণ পরামর্শ দেবো। সুখি হতে হয় স্বভাব পাল্টান, নতুবা হাজবেন্ড পাল্টান। ব্যবহারটা সবার বেলায় চালু রাখলে সবার অপছন্দের তালিকায় জাগা পাবেনই।

আপনি নিশ্চয়ই আপনার রান্নার নতুন রেসিপিটা পছন্দ হয়েছে কিনা—বরকে জিজ্ঞেস করেছেন? বর নিশ্চয়ই তারিফ করেছেন। কারণ নিজের মন্দ লাগাকে প্রকাশ্যে না এনে উড়িয়ে দিয়েছেন। বর আপনাকে খুশি রাখতে চান, দুঃখ দিতে চান না, তাই এই মিথ্যেটুকু বলেছেন। আপনিও খুশি রাখার চেষ্টা করুন। দেখবেন—দু'জনের পৃথিবীটা কেমন সুন্দর হয়ে গেছে।

সাত : চাকুরে বউ। বয়স ৩১ বছর। একটি নামী বেসরকারি সংস্থার মাঝারি অফিসার। বরও একটি বেসরকারি সংস্থায় মাঝারি মাপের অফিসার। বউটি কথাবার্তায় ঝকঝকে, স্মার্ট, লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, খুব পরিশ্রমী। দোষের মধ্যে সন্দেহপ্রবণ, আত্মকেন্দ্রিক, বস্তিবাসীদের মতো পাড়া মাথায় করে ঝগড়া করেন। ভয়ংকর জিদ্দি, হিস্টিরিক ও ডমিনেটিং। নিজের হাতে ব্লেড চালিয়ে মাঝে মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে দেন। আত্মহত্যা করবেন বলে ইমোসনাল ব্ল্যাকমেলিং করেন। ডিভোর্স দেওয়ার ভয় দেখান।

বরটি স্বল্পবাক, গলা চড়িয়ে ঝগড়া করতে পারেন না। বড় ম্যাগাজিনের রেগুলার গল্প লেখক। বড় প্রকাশক ওর লেখা খানকয়েক বই প্রকাশ করেছেন। ছবি আঁকায় যথেষ্ট নাম আছে। সুতরাং গুণগ্রাহী আছেন। অনেক গুণগ্রাহীদের মধ্যে সুন্দরীরাও আছেন।

সুন্দরীরা তাঁদের প্রিয় লেখক, প্রিয় মানুষটিকে বউয়ের হাতে অত্যাচারিত হতে দেখে সহানুভূতি জানান। পরিণতিতে কিছু শিক্ষিতা সুন্দরী এখন ছেলেটির বন্ধু হয়ে উঠেছেন। ছেলেটি ডিভোর্স দিয়ে নতুন ঘর বসাবার কথা ভাবতে চান না একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে। দুজনের ঝগড়ার সময় শিশু সন্তান জড়সড় হয়ে থাকে ভয়ে।

বউয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চলতে ছেলেটির চরিত্রে এক বিপুল পরিবর্তন এসেছে। ছেলেটি এখন বউয়ের জুতোর শুকতলা। পরিশ্রমী, উদ্যমী, প্রতিভাবান ছেলেটি এখন ব্যক্তিত্বহীন, অমেরুদণ্ডী।

বর-বউ দু'জনে একসঙ্গে পড়েছেন। সাত বছর প্রাক-বিবাহ মেলামেশার পরও দু'জনে এতো মিসফিট্? মেলামেশা পর্বে দু'জনে যুক্তিহীন জেদ, বদমেজাজ, কর্তৃত্ব

করার স্বভাব জানতেই পারেননি? নাকি সেসব স্বভাব যখন বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তখন প্রেমের আবেগে তা ঢাকা থেকে গেছে?

সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাইলে দু-জনেরই উচিত ম্যারিটাল কাউন্সেলিং সেশনে নিয়মিত যাওয়া এবং মনোবিদের সাহায্য নেওয়া। বউটি মানসিক রোগী। চিকিৎসার প্রয়োজন। লাগাতার অবদমনে বরটিরও মানসিক রোগী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বউটি কাউন্সেলিং সেশনে যেতে বা মনোবিদের নিতে রাজি না হলে ছেলেটির উচিত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করা।

আট : এক এম এ পাশ ব্যাঙ্কে চাকুরে মহিলা তাঁর সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন, কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্যে। ওই ব্যাঙ্কেরই একটি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর প্রতি আকর্ষিত হন। স্বল্প শিক্ষিত তরুণটিকে বিয়ে করেন। স্মার্ট, বাকচতুর, প্রাণোচ্ছল, হিউমার সেন্সে ভরপুর, উদ্যোগী ছেলেটি অফিসের মেয়েদের চোখে ছিলেন 'হিরো'।

উদ্যোগী ছেলেটি প্রমোশন পেয়ে কেরানি হয়েছেন। সবই মোটামুটি চলছিল। তৈলমসৃণভাবে না চললেও চলছিল। দুটি মেয়ে। এখন ওরা এইট ও টেনে পড়ে। মহিলা ও তার বর দুটি আলাদা ব্র্যাঞ্চে ট্রান্সফার হয়েছেন।

একদিন রাতে পুলিশের ফোন পেয়ে মহিলাকে দৌড়তে হলো কলকাতার লাগোয়া দক্ষিণ শহরতলীর এক থানায়। এক রিসর্ট-এ হানা দিয়ে পুলিশ ধরে এনেছেন বেশ কিছু নারী-পুরুষকে। ওঁদের পাকড়াও করা হয়েছে অশালীন অবস্থায়। রিসর্টের মালিককেও ধরে আনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রিসর্টে অসামাজিক কাজকর্ম চালান, দেহ ব্যবসা চালান। ধরা পড়া নারী-পুরুষদের একজন হলেন মহিলাটির বর। ছেলেটির মধ্যে কোনও লজ্জা ও অনুশোচনা দেখেননি মহিলা। বরং বউকে দেখে স্মার্টলি হাসলেন, যেন কিছুই হয়নি।

বর ওর এক সাংবাদিক বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও হাজির। দু'জনে থানা অফিসারকে বোঝাচ্ছিলেন, ছেলেটির সঙ্গী কলগার্ল নয়, অফিস কলিগ। টাকার বিনিময়ে স্ফূর্তি লুটতে আসেনি ছেলেটি। সুতরাং বেআইনি কিছুই করেননি।

থানা অফিসার বললেন, রিসর্টের ম্যানেজার তো আপনার সামনেই বললেন, মাঝেমধ্যেই আপনি নতুন নতুন মেয়েদের নিয়ে আসেন।

ছেলেটি বোঝালেন, ওরা কেউই কলগার্ল নয়। সহকর্মী বা অন্য অফিসে কাজ করেন। স্রেফ স্ফূর্তি লুটতে আসেন। টাকার লেনদেন নেই।

থানার অফিসার ছেলেটিকে বললেন, আপনি যাঁদের নিয়ে আজ পর্যন্ত স্ফূর্তি করেছেন, তাঁদের নাম ও অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে সই করুন।

বর যে সব নাম লিখলেন, তাঁদের অনেককেই চেনেন বউটি। চেনেন অফিসের

সহকর্মী হিসেবে। তালিকায় তরুণী থেকে বয়স্কা—সবই আছেন। বউ মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনলেন বরকে। তবে বরের সঙ্গে ধরা পড়া মেয়েটিকে আগে কখনও দেখেননি। শুনলেন, মেয়েটির বরকেও নাকি খবর দেওয়া হয়েছে।

বউটি তারপর থেকে তালিকার সহকর্মী মহিলাদের উপর যথেষ্ট বেশি ক্ষুব্ধ। কিন্তু মুখোমুখি ঝগড়া পছন্দ করে না বলে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেননি।

মহিলাটিকে জানিয়েছি, আপনার নরম মন ও সহ্যশক্তির কথা বর জানেন। আপনি বরের সহকর্মী শয্যাসঙ্গিনীদের নাম শুনে তাঁদের পাকড়াও করে ঝগড়া বাঁধাবেন না। বর তাই এমন কিছু নাম তালিকায় আনেননি, যাঁদের নিয়ে রিসর্টে আসতেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন। আবার এমন কিছু নাম তালিকায় ঢুকিয়েছেন, যাঁদের নিয়ে কখনওই আসেননি। আপনাকে বিভ্রান্ত করতেই পরিকল্পিতভাবে এই তালিকা তৈরি করেছেন। ঘাগু লম্পট হিসেবে এমনটা করাই স্বাভাবিক।

বরের যে কোনও লজ্জা বা অনুশোচনা লক্ষ্য করেননি, এটাই বরের চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক। মানসিকভাবে পুরোপুরি 'যৌন-অপরাধী' তৈরি হয়ে গেছেন। বারবার ও এই যৌন-অপরাধ বারবারই করবেনই। হয়তো আরও নিখুঁত পরিকল্পনা করে করবেন। মফস্‌সলের রিসর্টের বদলে কলকাতাতেই গোপন আস্তানা ঠিক খুঁজে নেবেন। যৌনতার নেশা মদের নেশার থেকেও প্রবল। এই নেশার জন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। চাহিদা মেটাতে আর্থিক অপরাধে যুক্ত হবেনই। ব্যাঙ্ক লোন দেওয়ার বিনিময়ে ঘুষ নেওয়া থেকে মেয়েদের দালালি সবই করতে পারেন।

আপনাকে বাস্তব অবস্থাটা বুঝে নিতে হবে (১) ছেলেটি বহু নারীতে আসক্ত ও নির্ভেজাল লম্পট। (২) যৌন অপরাধের পাশাপাশি আর্থিক অপরাধও করেন বা ভবিষ্যতে করবেন। (৩) এ হলো লস্ট কেস। এমন পোড়খাওয়া তৈরি চরিত্রকে সংশোধন করার সাধ্য কোনও মনোবিদের নেই। (৪) বর ভবিষ্যতে আবারও পুলিশের হাতে ধরা পড়বেন। জেলে যাবেন। পত্রিকায় খবর হবেন। আপনিও মেয়েরা লজ্জায় মিশে যাবেন। এমনটা যে কোনও দিন-ই ঘটতে পারে।

আপনি কি এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করবেন? ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য বজায় রেখে সহিষ্ণুতা দেখাবেন? মেয়েদের সঙ্গে বরং বাবার চরিত্র নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন। তাঁদের মানসিকভাবে তৈরি রাখুন। আমি নিশ্চিত, বাবার লাম্পট্য দোষ মেয়েদের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে না পারলে, মেয়েদের আপনি সঙ্গে পাবেন। ছেলেটিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন, হয় ওঁকে বদ অভ্যাস ছাড়তে হবে, নতুবা পরিবারকে।

যে সহকর্মীরা তরুণটির সঙ্গে রিসর্টে যাচ্ছেন, তাঁরা কি জানেন, ছেলেটি একজন নির্ভেজাল লম্পট? অনেককেই বিছানায় তোলেন? বউটি জানিয়েছিলেন, সম্ভবত

জানেন না কেউ-ই। মহিলার কথায়, ছেলেটি অত্যন্ত ধূর্ত। বিয়ের আগে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর ফিগারের, গায়ের রঙের, স্কিনের উজ্জ্বলতার, স্টাইলের প্রশংসা করে গেছেন দিনের পর দিন। মহিলা তাতে মুগ্ধ হয়ে থাকতেন। জন্মদিন জেনে নিয়ে সবার অজান্তে টুক করে একটা গোলাপ দিয়ে যেতেন ছেলেটি। মাঝে মাঝেই রাতে ফোন করতেন গদোগদো কণ্ঠে। এসবের নীট ফল—শিক্ষা, চাকরির পদ-পার্থক্য সব কিছু ভুলে বিয়ে করেছিলেন। প্রশংসায় ভেসে যেতে বিচার করতেই ভুলে গিয়েছিলেন—দু'জনের রুচির মিল কতটা।

মেয়ে শিকারী 'হিরো'রা এমনটাই করে। যোগ্যতার প্রশংসা না করে শরীরের, পোশাকের প্রশংসা করে। প্রশংসার মধ্য দিয়ে অনেক সময় অন্য রকম ইঙ্গিত পৌঁছে দেয়। যেমন — 'সুমনদাকে সত্যিই ঈর্ষা করি। কী অসাধারণ বউ পেয়েছেন। আপনাকে এখনও বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায়।' এ'সবই বললো হয়তো প্রবীণা সুন্দরীকে। অথবা অশ্লীল চুটকুলি বা জোকস বলে অন্য রকম ইঙ্গিত দিত।

যে সব লম্পটরা সহকর্মী মেয়েদের ফাঁদে ফেলে প্রতারিত করে, তারা কখনই এক নারীর কাছে অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলে না। সুতরাং 'এইসব নারীরা প্রতারিত'—একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু এঁরা কেউই যৌন নিগ্রহের শিকার নন। সচেতন ও সচেষ্ট আদান-প্রদানকে কখনই 'যৌন নিগ্রহ' বলা যায় না।

এইসব লো-গ্রেডের লোফারদের চরিত্র জেনেও যে সব মেয়েরা যায়, তাদের 'লম্পট' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।

বহু অফিসেই এমন ধরনের লম্পট পুরুষের দেখা মিলবে। মিলবে লম্পট মেয়েদেরও। লম্পট পুরুষরা অনেক মেয়েদের চোখেই 'হিরো'। লম্পট মেয়েরা 'হিরোইন'।

পারফরমিং আর্ট জগতের অনেক কিংবদন্তী চরিত্র বা মেগাস্টারদের জীবনে বহু বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা দেহ-মিলন হয়। কিন্তু তাঁরা সেসব নিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করতে বসেন না। আর এইসব পেঁচি লোফাররা তাদের লম্পট বন্ধুদের কাছে গপ্পো করে, কোন্ কোন্ উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চমেধার মেয়েদের বিছানায় তুলেছে। এমন গপ্পের মধ্যে সত্যি আছে, আবার মিথ্যেও আছে। যাদের তোলার ইচ্ছে আছে, কিন্তু তোলা হয়নি, তাদের কীভাবে কী করেছে

সে সব গপ্পো বলে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। এখানেই পেঁচি লোফার ও সুপারস্টার চরিত্রহীনের অ্যাটিচুডের পার্থক্য।

যে সব কর্মরত মহিলারা সুনাম বজায় রাখতে চান, তাঁরা একটু চেষ্টা করলেই এইসব লম্পট সহকর্মীদের চিহ্নিত করতে পারবেন। এদের মাথায় উঠতে দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনার ফিগার বা শাড়ির প্রশংসা কোনও পুরুষ করলে তাও 'যৌন নিগ্রহ' বলে বিবেচিত হবে, যদি আপনি মনে করেন, এর মধ্যে কোনও অন্য রকম ইঙ্গিত ছিল এবং এটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নয় : ৪৭ বছর বয়সের মহিলার এক নতুন স্বপ্ন-সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঘুমোলেই আজেবাজে নোংরা যৌনতার স্বপ্ন এসে হানা দেয়। ঘুম ভাঙলে ব্যাপারটা উপভোগ্য মনে হয় না। বরং বিশ্রী গা-ঘিনঘিনে অবস্থা চলতে থাকে।

এই বয়সটা মেনোপজাল পরিবর্তনের সময়। শরীর মনে একটা বিশাল ভাঙাচোরা হয় এই সময়। এই সময় অনেকেরই মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যায়, ধৈর্য কমে যায়, মনে অস্থিরতা দেখা দেয়, শারীরিক মিলনের আগ্রহ অতি-মাত্রায় কমে যায়। সেক্স হরমোনগুলোর নিঃসরণ কমে যায়। যোনিপথ শুকনো থাকে। মিলন যন্ত্রনাদায়ক হয়। পাল্টে যায় যৌন-ব্যবহার। এমনটা সবার না হলেও অনেকেরই হয়।

স্বপ্নে উঠে আসে অবচেতন মনের অনেক অবদমিত ইচ্ছে, উদ্বেগ, ভয় ইত্যাদি। স্বপ্নে অপছন্দের মানুষকে শাস্তি দেওয়া যায়, প্রিয় অভিনেত্রী বা অভিনেতার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করা যায়। এই সবই হয় লিম্বিক সিস্টেম বা ইমোশনাল ব্রেন ঘুমের সময় খুবই সক্রিয় থাকে বলে।

মেনোপজাল পরিবর্তনের সময় যে শারীরিক মিলন কষ্টের মনে হয়, সেই মিলনই যখন স্বপ্নে হয়, তখন আনন্দানুভূতি নিয়ে আসতেই পারে। যৌনমিলন বাস্তবে যার সঙ্গে কষ্টদায়ক, স্বপ্নেও তার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছে না হতেই পারে। স্বপ্নে অবচেতন মনে অনেক পুরুষই দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও থাকতে পারে আরও অন্য কিছু কারণ। যেমন—অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা। হাজবেন্ড যদি সব সময় নিজের ইচ্ছেমতো মিলিত হতে থাকেন, বউয়ের ইচ্ছে অনিচ্ছাকে গুরুত্ব না দেন। মিলনের সময় হাজবেন্ড সব সময় সক্রিয় ও বউ নিষ্ক্রিয় থাকেন। শৈশবে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন বা যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যা অবচেতন মনে আজও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অথবা যৌনরসাত্বক কথাবার্তা, পর্ণো বই, ব্লু-ফিল্ম ইত্যাদি ভালো লাগে, যার সামগ্রিক প্রতিফলন হিসেবে হানা দিচ্ছে অশ্লীল নানা স্বপ্ন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে মনোস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন একটুও দেরি না করে।

দশ : এক চাকুরে বউ, বয়স ৩৩ বছর। তাঁর কথা মতো বিয়ে হয়েছে সাত বছর। বিয়ের বছর তিনেক পর থেকেই দেহ-মিলনের সময় বর খুব নোংরা সব গল্প বলেন। এর আগে দু'জনে এক সঙ্গে পর্ণো বই পড়েছেন, পর্ণো ছবি দেখেছেন। বউটি উত্তেজনা অনুভব করছেন। কিন্তু বরের গল্পগুলো কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না। গল্পে তিনি বলেন, "ভাবো, আমি তোমার বউদির সঙ্গে...., তোমার দাদা তোমাকে....।" বর গল্পের চরিত্রগুলো মাঝে-মধ্যেই পাল্টে দেন। কিন্তু গল্পের ধরন পাল্টায় না। গল্প বলার সময় চোখ বুজে আমার শরীরকে নানাভাবে উপভোগ করেন।

বরের ইচ্ছেমতো চরিত্রগুলোর সঙ্গে মিলিত হতে হচ্ছে—এই গল্প এক সময় একঘেয়েমি এনে দিল। বিরক্তির জন্ম দিল। অবস্থা পাল্টাবার একটা উপায় বউটি নিজেই তৈরি করে নেন। বছর দেড়েক হলো বরের গল্পে আর মন দেন না। চোখ বুজে কল্পনায় এনে ফেলেন ইচ্ছেমতো পুরুষকে। কল্পনায় সিনেমা স্টার থেকে আত্মীয় সবাই আসেন। এখন চোখ বন্ধ করে বরকে অন্য পুরুষ ভাবতে একটুও অসুবিধে হয় না। ৫-৬ বছর আগে নগ্ন বরকে দেখতে দেখতে মিলনে যে উত্তেজনা অনুভব করতেন, এখন তা-ই অনুভব করেন কল্পনায়, মিলনের মুহূর্তে চোখ খুলে বরকে দেখতে ভয় পান। উত্তেজনার আগুনে জল পড়ার ভয়।

সম্প্রতি একটা বড় রকমের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মুশকিলটা হলো, মিলন শেষে একটা অপরাধবোধ মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই অপরাধবোধই এখন সব সময় অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

বাস্তবে অনেক সময় সুস্থ-সুন্দর যৌনজীবন পাওয়া যায় না। বিশেষত মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাঙালি মেয়েরা তাদের যৌনতাকে অবদমিত রাখতেই অভ্যস্ত। ছোটবেলা থেকেই মা-মাসিদের মতো মহিলারা কিশোরী বয়স থেকেই শিখিয়ে এসেছেন, লজ্জাবনত থাকতে। স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে দেখতে, সেবা করতে। স্বামী যেভাবে দেহ মিলন চাইবে, সেভাবেই নিজেকে উজাড় করে দেবে। স্বামী মিলিত হতে চাইলে নিজেকে নিবেদন করে দেবে। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে কোনওভাবেই মাথা ঘামাবে না। কখনও যদি নিজের মিলন ইচ্ছে প্রবল হয়, তাকে সংযত করবে। সংযম নারীর গুণ। কখনই সংযম হারিয়ে স্বামীর কাছে মিলনের ইচ্ছে প্রকাশ করবে না। তাতে স্বামী ধরে নেবেই স্ত্রী আমার বড়ই কামুক। স্বামীর মনে এমন ধারণা তৈরি হওয়া মানেই ঘর ভাঙলো।

মধ্যবিত্ত-মানসিকতার মেয়েরা তাই মিলনের সময় কখনই সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না। মরার মতো নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে থাকে। 'স্বামী' অর্থাৎ 'প্রভু' রাতে বিছানায় শুয়েই তাঁর মৈথুনকর্ম সেরে ভোস্ ভোস্ করে ঘুমোতে থাকে। বউ কী ভাবছে, না ভাবছে—এসব ভাববার মতো মন মধ্যবিত্ত মানসিকতার পুরুষদের মধ্যে

তৈরি-ই হয়নি। এইসব মধ্যবিত্ত মানসিকতার পুরুষরা প্রবলভাবে ডিক্টেটর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে।

নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানসিকতার মানুষদের মধ্যে একটা বড় রকমের মিল আছে। এই দুই শ্রেণীর মেয়েরাই অনেক বেশি স্বাধীন। ওরা পছন্দ না হলে ঘর ছাড়ে, বর ছাড়ে। নতুন করে ঘর বাঁধে। এই দুই শ্রেণীর নারী-পুরুষই ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মিলনে নারী-পুরুষ দু'জনই সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাঙালি মেয়েরা 'কুড়িতে বুড়ি' হয়। যৌনতাকে অবদমিত রাখার কারণে নানা ধরনের 'সাইকো সোমাটিক ডিজিজ' বা মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে ভোগেন। অথবা যৌন বিকৃতির শিকার হন, ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা আসে। চাকুরে বধূটি এমনই এক যৌন বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ছেন, ফলে তাঁর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারছে না। কারণ বউটি মধ্যবিত্ত মানসিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি।

বউটি তাঁর সমস্যা আমাকে জানিয়েছিলেন কাউন্সেলিংয়ের জন্য। এসব ক্ষেত্রে দু'ভাবে কাউন্সেলিং করা যেতে পারে। এক : মানসিকভাবে অবদমিত, অপরাধবোদে পীড়িত মানুষটিকে মনের কথা খুলে বলতে সাহায্য করা। তাঁর বলাটা আন্তরিকতার সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে শুনলে অপরাধবোধে পীড়িত মানুষটির মন অনেক হালকা হয়। এই প্রথম পদ্ধতিকে বলে 'ক্যাথারসিস' (Catharsis)।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সাহায্যপ্রার্থী মানুষটিকে নিশ্চিত করা, যে তাঁর কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করছি। বরের এমন যৌনআচরণ আদৌ বিশ্বাস করছি কিনা, এই নিয়ে তিনি সংশয়ে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর হয়তো জানা নেই পুরুষদের এমন যৌন আচরণ বহুল প্রচলিত। অনেক মহিলা ভাবেন, আমার জীবনেই বোধহয় এমন আকাশ ভাঙা ঘটনা ঘটেছে। আর আমি যা ভাবছি, সেই ভাবনাও খুবই নোংরা, অসম্ভব রকমের খারাপ, অবিশ্বাস্য।

সহানুভূতির সঙ্গে যদি কাউন্সেলিং করা যায়, তবে রোগী নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়েই বুঝে নেবেন যে—নিজেকে অপরাধী ভেবে পীড়িত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এতে রোগী অস্থিরতা কাটিয়ে আবার পুরোন আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। এই ধরনের কাউন্সেলিংকে বলে 'সাপোর্টিভ (supportive) কাউন্সেলিং'।

যাই হোক, মেয়েটিকে বুঝিয়েছিলাম, যৌনজীবন সুন্দর হলে, পছন্দসই হলে, মনের মতো হলে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালিদের জীবনে সাধারণভাবে বরই তার পছন্দসই যৌন

জীবন বউয়ের উপর চাপিয়ে দেয়। এই চাপিয়ে দেওয়া যৌনজীবন বউটির কেমন লাগছে, সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করে না।

বাড়িতে একটা বেড়াল পুষল তাকে খেতে দিতে হয়। নতুবা সে তো অন্য বাড়ির হেঁসেলের দিকে মুখ বাড়াবেই। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত যৌনতা প্রকাশের সুযোগ যদি বন্ধ করে দেয় বর, তবে তা বাঁকা পথ ধরতেই পারে।

এমন বোকা বরদের জন্যই মধ্যবিত্ত সমাজে অজাচার উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মেয়েদের কাছে মিলন হয়ে দাঁড়ায় 'মোস্ট বোরিং' ব্যাপার। মেয়েটি আজ মিলনের সময় চোখ বুজে নিজের পছন্দমতো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন ভাবতে পারছেন। উত্তেজনা অনুভব করছেন। বরের ওই বিকৃত গল্পগুলোই বউটির এমন চিন্তা করার প্রথম ধাপ। বরটি যদি বউয়ের কাছে সোচ্চারে অন্য নারীর সঙ্গে উত্তেজনক মিলনের কথা বলে যান নিজের চোখটি বুজে রেখে, তবে বউটি শুধু কল্পনায় অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে দোষ কোথায়? কোথায় বা অপরাধ?

কিন্তু মেয়েটির অবচেতন মনে আরও একটি যন্ত্রণা লুকিয়ে রয়েছে। অবচেতন মন বুঝে গেছে—বর আদৌ বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রের নয়। কোনও সম্পর্কই ও শ্রদ্ধা করে না। দৈহিক সম্পর্কই ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

মেয়েটির মন জেনে গেছে, বর আদৌ সাময়িকভাবে ওর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না। বর কি নানা অজাচারে জড়িত? নিজেও কি এইসব কল্পনা করতে করতে এক সময় বাস্তবে আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ নেবেন?

বর-বউয়ের মূল্যবোধের পার্থক্যের জন্যেই বউটি অপরাধবোধে ভুগলেও, বর ভোগেন না। বউটির উচিত সমস্যাকে আর চেপে না রেখে এ বিষয়ে বরের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া—অমন নোংরা গল্প শুনতে শুনতে দেহ মিলনে রাজি নন। দু'জনে একই সঙ্গে গিয়ে কোনও মনোবিদের পরামর্শ নিতে চান—একথাও জানিয়ে দিন।

মনোবিদের পরামর্শে কতটা কাজ হচ্ছে দেখুন। সঙ্গে সুসংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবেশে ডুবে থাকতে চেষ্টা করুন। রুচিপূর্ণ বই পড়ুন। ভালো সিনেমা, থিয়েটার দেখুন। সংগীত শোনায় ডুবে থাকুন। যৌন আলোচনায় আবদ্ধ বন্ধু-আত্মীয়দের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করুন। সমাজসেবামূলক কাজে বা ক্রিয়েটিভ কাজে সময় দিন—আনন্দ পাবেন। জীবনে যৌনতাই শেষ কথা নয়। জীবনে কেউ যদি ফাগুন

হাওয়া নিয়ে আসে, দ্বিধা না করেই গ্রহণ করুন।

বরের সঙ্গে প্রেমহীন নোংরা মিলনের চেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমময় মিলন অনেক বেশি শ্রদ্ধেয়, অনেক বেশি কাম্য।

ওঁর বর মিলনের সময় যা করছেন তা অবশ্যই 'যৌননিগ্রহ' শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যৌননিগ্রহ শুধু অফিসে, বাসে, পথে-ঘাটে-ই ঘটে না, আত্মীয়দের দ্বারা ঘটে, অপিসের বসের দ্বারা ঘটে, আর ঘটে হাজবেন্ডের দ্বারা। ভালোবাসাহীন বিকৃত যৌনমিলন যা নারীকে পীড়িত করে তাই যৌননিগ্রহ।

বরের অথবা যে কোনও মানুষের দ্বারা যৌননিগ্রহের শিকার মেয়েদের সাহায্যের জন্য কিছু সংস্থা আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এগারো : মেয়েটির বয়স ২৮ বছর। চাকরি করেন একটি বিশাল কোম্পানিতে। স্মার্ট, ঝক্ঝকে কথাবার্তা, আকর্ষণীয় চেহারা, সাজতে জানেন। ওই অপিসে 'ড্রেস কোড' চালু আছে। অবিবাহিত। মেয়েটি হঠাৎ-ই তাঁর বসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, তাঁকে 'যৌননিগ্রহ' করছেন। হায়ার অথারিটিকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালেন। মেয়েদের যৌননিগ্রহ নিয়ে কাজ করে, এমন একটি সংস্থাকেও সব জানালেন।

'যৌননিগ্রহ' কাকে বলে? কোনও পুরুষ যখন কোনও মহিলাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিরক্ত করেন, তখন তাকে বলা হয় 'যৌননিগ্রহ'।

যখন কোনও পুরুষ সহকর্মী মেয়েদের সামনেই অশ্লীল কথাবার্তা বলেন, পর্ণোবইয়ের ছবি দেখান, কুশ্রী প্রস্তাব দেন, অশালীন ব্যবহার করেন, শরীরে হাত দিয়ে স্পর্শের উত্তেজনা নেন, যোগ্যতার প্রশংসা না করে চেহারার স্তুতি করেন, তখন এ'সবই যৌননিগ্রহের পর্যায়ে পড়ে।

অবশ্য শুধু পুরুষরাই যে নারীদের যৌননিগ্রহ করে, তা কিন্তু নয়। বাড়িতে কাজে লাগান কিশোর শ্রমিক অনেক সময়ই পরিবারের মহিলাদের দ্বারা যৌননিগ্রহের শিকার হয়। গ্লামার জগতে নাম কিনতে অনেক মেয়েই সব কিছু দিতেই একেবারে তৈরি। যাদের হাতে গ্লামার জগতে ঢোকার চাবিকাঠি আছে বলে মনে করে, তাদেরকেই যৌনজীবনে জড়াবার চেষ্টা করে এসব মেয়েরা। চাবিকাঠি নিয়ে বসে থাকা সব পুরুষই তো সমান নন। যাঁরা সুযোগ নিতে উৎসাহী নন, তারা তারা এমন আগ্রাসী মেয়েদের দ্বারা যৌননিগ্রহের শিকার হন। ফোনে

বা মুখে সরাসরি নোংরা প্রস্তাব দেন। ফ্ল্যাটে ডেকে বা পুরুষটির ফ্ল্যাটে গিয়ে দেহমিলনের জন্য প্রলুব্ধ করেন।

ডায়নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়ানো তালিকায় আছে বাটলার, ব্যক্তিগত টিচার, ঘোড়সওয়ার হওয়ার শিক্ষক, দেহরক্ষী, নিউট্রিশনিস্ট, পামিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট থেকে ফেংশুইওয়ালা ইত্যাদি। কারও সঙ্গে দেহমিলনে নাকি কোনও ছুঁৎমার্গ ছিল না। ডায়নার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই ডায়নাই বেছে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-ই কি মনে করেননি যে তাঁকে যৌননিগ্রহ করছেন লেডি ডায়না?

লিজা মিনেলি অস্কার উইনার সুপারস্টার। ৫৮ বছর বয়সী এই সুপারস্টারের বিরুদ্ধে ২০০২-এ যৌননিগ্রহের অভিযোগ করেন তাঁর-ই গাড়ির ড্রাইভার মহম্মদ। আদালতে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে লিজা সত্যিই তাঁকে শরীর দিয়ে তৃপ্ত করতে বাধ্য করতেন।

অনেক সময়ই নারীর উপর যৌননিগ্রহ হয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তিগত রাগ মেটাতে বসের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগও তোলা হয়। উদ্দেশ্য পুরুষটিকে বেইজ্জত করা, যৌননিগ্রহ আদৌ ঘটেছে কিনা প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পুরুষ মাত্রই সুযোগ পেলে নিগ্রহ করবেন এমন ধারণাটা আদৌ ঠিক নয়।

'পুরুষশাসিত' সমাজ ব্যাপারটা মধ্যবিত্ত সমাজে টিকে থাকলেও আর সব জায়গায় অচল। অন্তত বর্তমান যুগে। বরং এটা বলা ভালো, শাসক সুযোগ পেলে নিগ্রহ করতে পারে।

আজকাল বিভিন্ন মিডিয়ায় বিভিন্ন বড় পদেই মেয়েদের ভিড়। মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির একজিকিউটিভ পদ দখল করতে ঝক্‌ঝকে তরুণীরা বিপুল সংখ্যায় এসে পড়েছেন। ওঁরা নিগৃহীত হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। অবদমনের শিকার হন না।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার মেয়েরাই অফিস বসের কাছ থেকে নোংরা প্রস্তাব পেয়ে থাকেন। চাকরি হারাবার ভয়ে অনেক সময় এইসব নিগ্রহকে সহ্য করে নেন। আবার অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে চুপ করে থাকাটাই ভালো মনে করেন। এদেরই কেউ কেউ অপরাধবোধে ভোগেন, মানসিক অবদমনের কারণে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

কোনও কোনও মেয়ে অবশ্য বসকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে, অনেক কিছুই আদায় করে ছাড়ে। জানে—কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়।

অভিযোগকারী বউটি যে অভিযোগ অফিস বসের বিরুদ্ধে করেছেন, তা প্রমাণ করা খুব কঠিন। এবং সম্ভবত প্রমাণ করতেও পারবেন না। উর্ধ্বতন মহল এই অভিযোগ খারিজ করে দেবেন। অন্য ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করবেন। পুরোন বসকে সাহায্য করতে নতুন বস সত্যিই যৌননিগ্রহ শুরু করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে কোনও দায়িত্বশীল স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বসকে জেলে পুরে সাড়া ফেলে দিন।

অধ্যায় : আট

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত কিছু পাল্টে যায়

আজকের শহর জীবনে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে লক্ষ্যণীয়ভাবে। শহরের বস্তি এলাকার পরিবর্তন গতি প্রায় স্থির। মধ্য-মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের সাংস্কৃতিক চেতনা পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। অর্থাৎ মূল্যবোধ পাল্টে যাচ্ছে। সমাজে যত জটিলতা দেখা দিচ্ছে, ততই চিন্তায় জটিলতা বাড়ছে। শিশু থেকে বৃদ্ধদের নিয়ে নানা মানসিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সমস্যা আছে মানে, সমাধানও আছে। সমাধান আপনার-ই হাতে। অথবা সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ মনোবিদ্, কাউন্সেলারের সাহায্য নিন নির্দ্বিধায়।

আমাদের কুশিক্ষা, আমাদের ভুল জানা, আমাদের অশিক্ষা এই অবস্থার জন্য দায়ি।

আমরা প্রিয়জনকে মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে চাই না। নিয়ে গেলেও বিষয়টা গোপন রাখি। এ এক অদ্ভুত বোকা-অহং বোধ, বোকা জড়তা।

পাশ্চাত্যের অবস্থাটা উল্টো। ওঁরা নিজেরা যখনই মনে করে মনোবিদের সাহায্য নিলে ভালো হয়, তখন-ই সাহায্য নেন।

আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো। অগ্রগমণ-ই সভ্যতা।

মস্তিষ্ককে শতায়ু করতে ঘুমের ভূমিকা বিশাল

মস্তিষ্ককে দীর্ঘকালের জন্য কর্মশীল ও চিন্তাশীল রাখতে যথেষ্ট ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম নিয়ে বিজ্ঞান যতটা এগিয়েছে আমাদের শিক্ষিতদের জ্ঞান ততটাই পিছিয়ে আছে।

একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে গড়ে ৮ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। এই ঘুম রাতে একটানা হতে হবে, এমন নয়। রাতে ৬ ঘণ্টা, দুপুরে ২ ঘণ্টা হলে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

কিছু প্রচলিত ধারণা চালু আছে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ২৪ ঘণ্টায় ৪-৫ ঘণ্টা ঘুমোতেন। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ১২ ঘণ্টা ঘুমোতেন। আবার চার্চিল সুযোগ পেলেই যেখানে সেখানে ১৫-২০ মিনিট ঘুমিয়ে নিতেন।

শ্রীমতি গান্ধী নাকি প্রতিদিন শবাসনে রিলাক্সেশন নিতেন। এই রিলাক্সেশন এক বা দু-বারে ঘণ্টা দু'য়ের জন্য নাকি হতো। রিলাকসেশন আধা ঘুম, আধা জাগরণের-ই একটা অবস্থা। এই অবস্থায় স্নায়ুকোষের বড় অংশই বিশ্রাম পায়। 'বড়অংশ' বলার কারণ তখনও কিছু মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ জেগে থাকে বলেই আমরা ঘুমের মধ্যে মল বা মূত্র ত্যাগ করে ফেলি না। জোরে ডাকলে শুনতে পাই এবং ঘুম ভাঙে।

প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম যাঁরা করেন, তাঁরা শুলেই ঘুমিয়ে পড়েন, এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে। কিন্তু যাঁরা একই সঙ্গে প্রচুর শারীরিক ও মানসিক শ্রম করেন, তাঁরা শুলেই ঘুমিয়ে পড়বেন, এই তত্ত্ব খাটে না। কিছু দেশনেতারা এর প্রমাণ। তাঁরা দিনে দপ্তর সামলাচ্ছেন, দিন থেকে রাত—প্রকল্প উদবোধন, শিল্পপতিদের সঙ্গে মিটিং, নানা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কখনও রাত দুপুরে মন্ত্রী সভার মিটিংয়ে যোগ দিচ্ছেন। মিটিং ভোর অবধি চলছে। বিদেশ যেতে হচ্ছে হরদম। রাত দশটায় প্লেনে উঠলেন। ১০ ঘণ্টার পথ। সকাল ৮ টায় পৌঁছবার কথা। পৌঁছলেন যখন, তখন স্থানীয় সময় রাত ১১টা। মন্ত্রীর হিসেব গেল গোলমাল হয়ে। এর ফলে তাঁদের 'বায়োলজিক্যাল ক্লক' যায় বিগড়ে। ফলে ভালো ঘুম হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। শরীরে নানা অস্বস্তি দেখা দেয়।

অনেকের আবার দুপুরে পেট ভরে ভাত খাওয়ার পর ঘুম পায়। কার্য-কারণ সম্পর্ক অবশ্য একটা আছে—ভাতের সঙ্গে ঘুমের। ভাতে রয়েছে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট। হজমের সময় এই কার্বোহাইড্রেটের কিছুটা অংশ গেঁজে ওঠে। ফলে কিছুটা পরিমাণে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়। ঘুম পায়। পান্তাভাত গেঁজে ওঠে বেশি। খেলে ঘুম পায়ও বেশি।

ভাতঘুম কাটাতে ও রাতে ভালো ঘুম আনতে দুপুরে ভাত খাওয়া বন্ধ করুন। রাতে ভাত খাওয়া চালু করুন।

অনেকের আবার মদ না খেলে ঘুম আসে না। ভালো ঘুম, ভালো মেজাজ ও সারা দিনের শ্রম ঝেড়ে ফেলতে এক থেকে দু পেগ মদ্যপান চলতে পারে। মাত্রা ছাড়ালে পরদিন সকালেও মাথা ধরা, মাথা ভার থাকবে, যাকে বলে 'হ্যাং ওভার'।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসী হলে রাতে শোবার আগে আরাম করে স্নান করুন। শীতের রাতেও সামান্য গরম জলে স্নান করে নিন। ভালো ঘুমে সাহায্য করবে।

হালকা আলো অথবা অন্ধকার, আরামদায়ক বিছানা, সুন্দর হালকা গন্ধ, লো ভলিউমে রাগ সংগীতে সেতার-সরোদের মতো বাজনা শোনা—এসবই ঘুম আনার ভালো অনুসঙ্গ হতে পারে।

অনেক সময়ই শারীরিক মিলন উপভোগ্য ও আনন্দময় হলে দু'জনেই উত্তেজনা শেষের আবেশ ও ক্লান্তিতে দ্রুত সুখ-নিন্দা দেন।

অভাবনীয়ভাবে এসে পড়া বিপদ, ভয়, দুশ্চিন্তা, প্রিয়জনের অকালমৃত্যুর শোক, হঠাৎ চাকরি যাওয়া, ব্যবসায় বিশাল ক্ষতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গ্রাস করা সম্প্রদায়গত ভয়, নানা ধরনের শারীরিক অসুখে, মানসিক অসুখে, মেনোপজের পর, অথবা পড়াশুনোর চাপ স্বাভাবিক ঘুম কেড়ে নিতে পারে

অফিসের চিন্তা বা নোংরা চিন্তা বিছানায় শুয়ে করবেন না। তাতে ঘুমে বিঘ্ন ঘটবেই। ঘুম দেয় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে বিশ্রাম, যে বিশ্রাম দীর্ঘকাল কর্মক্ষম রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। বিছানায় শুয়ে আছেন অনেকক্ষণ। ঘুম আসছে না। টেপ চালিয়ে লো ভল্যুমে গান শুনুন, বই পড়ুন। ঘুম আসবে, প্রয়োজনে ঘুম আনতে ঘুমের ওষুধ নিন। ঘুমহীন থাকার চেয়ে ঘুমের ওষুধ নিয়ে ঘুম অনেক ভালো। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ খাবেন না। হিপনোটিক গ্রুপের ড্রাগ, ট্র্যাঙ্কুইলাইজার অ্যান্টিহিস্টামিনিক ইত্যাদি গ্রুপের ড্রাগ খেলেও ঘুম আসে। কোন্ ড্রাগ নিলে আপনি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হবেন না, তা আপনার নিজস্ব বা পারিবারিক ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিন।

মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন নামের হরমোন নিঃসরণ করে, যা ঘুম আনতে সাহায্য করে। বয়স যতই বাড়তে থাকে, ততই মেলাটোনিনের নিঃসরণ কমতে থাকে। এই নিঃসরণ আবার বাড়াতে বাজারে পাওয়া যায় 'মেলাটোনিন ট্যাবলেট।' পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন এই ওষুধ পাশ্চাত্যের বাজারে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়াই বিক্রি হয়। স্মৃতিকে দীর্ঘজীবী করতে মস্তিষ্ককে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিন ঘুমিয়ে।

অধ্যায় : নয়

অলজাইমারস্ সৃষ্টিশীল মেধায় ভয়ংকর অসুখ

বাংলা সাংবাদিক-জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন রণজিৎ রায়। বয়স আশি পেরিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না। হঠাৎ হারিয়ে গেলেন। বিভিন্ন পত্রিকা ও পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে খুঁজে পায়নি আজও।

হারিয়ে যাওয়ার বছর কয়েক আগেই শ্রীরায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল স্মৃতিভ্রংশতা। পরিচিতদের নাম ভুলে যেতেন। মনে রাখতে পারতেন না বাড়ির ঠিকানা, নিজের নাম, খেয়েছেন কিনা—এমনি অনেক কিছুই। পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন, এটা কোনও রোগ নয়, বার্ধক্যের দোষ। ভুল ভেবেছিলেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু জনারণ্যে হারিয়ে গেলে, পাওয়া অসম্ভব না হলেও বড়-ই কঠিন। এতো অপরাধীর লুকিয়ে থাকা নয় যে, ইনফরমার খবর দেবে, বেশ্যালয়ে অভিযান চালালে খোঁজ মিলবে। যিনি নিজের পরিচিয় ভুলে গেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

পরিচয় ভুলে যাওয়া, খেয়েছেন কিনা ভুলে যাওয়া ইত্যাদি স্মৃতিভ্রংশ অবস্থাকে 'বার্ধক্যের অনুসঙ্গ' ভাবার মধ্যেই রয়েছে ভুল। স্নায়ুবিদকে দেখালে তাঁরা সম্ভবত বলতেন, 'অলজাইমারস্ ডিজিজ'। এই অসুখটিকে চিহ্নিত করতে পারলে তাঁর হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা হয়ত ঘটত না। ঠিক ঠিক দেখভালের জন্যেই ঘটত না।

অলজাইমারস্ কি বৃদ্ধ বয়সের রোগ?

অলজাইমারস্ (Alzheimer's) রোগ ষাট-পঁয়ষট্টির আগে হয় না—এমন একটা ধারণা চালু আছে। ধারণাটা ঠিক নয়। এখন স্নায়ুবিদরা যে কোনও বয়সের গুরুতর স্মৃতিভ্রংশকেই অলজাইমারস বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

শীলা ধারালো বুদ্ধির বিদুষী মহিলা। বয়স পঞ্চাশ। বেশ কিছু বছর ধরেই অফিস, ছেলে-মেয়ে, বর, মা সব সামলে চলেছে। বরের বন্ধু, নিজের বন্ধু, বিশাল সংখ্যক আত্মীয় ও পরিচিতদের নিত্য আনাগোনা। সবাইকে সন্তুষ্ট করার 'মহান' দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। রাত দুপুরের অনেক পরে আড্ডা দিয়ে বা হোটেলে খেয়ে বাড়ি ফেরার পর বর যখন ছ-আট ঘণ্টা নিশ্চিন্তে ঘুম দেন, তখন তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোবার 'শৌখিনতা' দেখানো সম্ভব হয় না শীলার। সকাল বেলায় উঠেই ছেলে-মেয়েদের জন্য খাবার তৈরি করা, বাজার করা, বাস ধরে অফিস

দৌড়নো। অফিসে স্টাফ আর অফিসারদের সামলাতে হয় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার শীলাকে। ক্লান্ত শরীরে বাড়ি এসেই বন্ধু-আত্মীয়দের আগমনে মুখের হাসি ঝুলিয়ে রাখতে হয়। বর ন'টায় উঠবেন। বউয়ের তৈরি করা খাবার খেয়ে ড্রাইভ করে অফিস যাবেন। প্রায়ই ফিরবেন এক দঙ্গল বন্ধু বা চামচা নিয়ে। তাদের আপ্যায়নের দায়িত্ব অবশ্যই শীলাকেই নিতে হয়।

দীর্ঘ বছর এভাবেই চলছিল। দশ রকম কাজে বাধ্য হয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছিল। কিছু দিন হল কয়েকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেক নাম, অনেক কথা ভুলে যাচ্ছেন। এমনকি ক্ষিদের অনুভূতি কমেছে। দিকভ্রম হয়। অতি চেনা পথে নেমেও উত্তরকে মনে হয় দক্ষিণ, পূর্বকে পশ্চিম। কখনও অস্থিরতা দেখান। যে কাজে এসেছেন, সে কাজ শুরু করার আগেই ছট্‌ফট্‌ করতে থাকেন। অথবা দো'টানায় ভোগেন। আবার কখনও বা অতি উদাসীন হয়ে পড়েন, নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। ডাক্তার দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না—বাঙালি মেয়েদের 'সহনশীলতা' নামের ব্যায়রামের জন্যে।

হাউজ ফিজিসিয়ান দেখালে তিনি অবশ্যস নিউরোলজিস্ট দেখাতে বলতেন। নিউরোলজিস্ট দেখলে বলতেন, 'অলজাইমারস্‌'-এর প্রথম ধাপ।

রঞ্জন পঁয়তাল্লিশের স্বাস্থ্যবান যুবক। মাঝে মাঝে বুঝতে পারে খবরের কাগজে মন বসছে না। যে বই অন্ত প্রাণ, তার কাছে বই পড়াটা হঠাৎ-ই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। যে বইটা পড়তে খুবই ভালো লাগছিল, সে বইটাই অসহ্য লাগছে। আট-দশ বা পনের দিন বই পড়ায় চূড়ান্ত বিরাগ। হঠাৎ হঠাৎ অতি চেনা রাস্তা গুলিয়ে যায়। জানা নাম মনে পড়ে না। এও অলজাইমারস্‌-এর একটি ধাপ।

সাঁতারু মিহির সেন ছিলেন অলজাইমারস্‌ রোগী। তাঁর অতি পরিচিত বড়বাজার এলাকায় পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিছুই যখন চিনতে পারছেন না, তখন এক পথচারী তাঁকে চিনতে পেরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যান। না হলে মিহির সেনও হয়তো সাংবাদিক রণজিৎ রায়ের মতো হারিয়ে যেতেন।

কবি নজরুল ইসলাম, ভাস্কর রামকিংকর বেজ অলজাইমাস্‌ নামের ভয়ংকর রোগের শিকার হয়েছিলেন। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মেধা-বুদ্ধি-সৃজনশীলতা হারিয়ে বেঁচে মরে থাকা যে কি ভয়ংকর কষ্টের—ভাব যায় না।

'অলজাইমারস্‌' রোগটা ঠিক কী?

'অলজাইমারস্‌' রোগে যে কোনও বয়সের রোগী তার মস্তিষ্কের গুণাবলিগুলো হারিয়ে ফেলতে থাকে। মেধা, বুদ্ধি, বিশ্লেষণের ক্ষমতা হারায়। দেখা দেয় নামবিস্মৃতি, দিগ্‌বিস্মৃতি, শব্দ-স্মরণে অক্ষমতা। আসে অতি উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা।

পরিচিত মানুষ, পরিচিত ছাপার অক্ষর অপরিচিত, অজানা হয়ে যায়। পরিচিত ভাষার কথার অর্থ মগজে ঢোকে না। আবার দেখা দিতে পারে অস্থিরতা। মল-মূত্র ত্যাগের মতো ব্যাপারে সামাজিক নিয়মগুলোও ভুলে যেতেই পারেন। হারিয়ে ফেলতে পারেন পোশাক পরার প্রয়োজনীয়তা বোধ। ভুলে যেতে পারেন নিজের নাম, পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা। হাত-পা চালনা শক্তি হারাতে পারেন। লোপ পেতে পারে ক্ষিদে বোঝার ক্ষমতা। এমন হতে পারে পরম আত্মীয় বা প্রিয়জনকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারেন। স্মৃতিভ্রংশতার জন্য হয়তো ভুলে গেছেন কোথায় রয়েছে চটি জোড়া, পাজামা-পাঞ্জাবি। খুঁজে না পেয়ে মনে করলেন পরিবারেরই কেউ ওসব লুকিয়ে রেখেছে।

এই ধরনের স্মৃতিভ্রংশ রোগীকে প্রথম চিহ্নিত করেন জার্মান চিকিৎসক অ্যালইস অলজাইমার (Alois Alzheimer)। সালটা ১৯০৭। রোগীনি ছিলেন বছর পঞ্চাশের এক মহিলা। পরবর্তীকালে ডাঃ অলজাইমারের নামে-ই চিহ্নিত করা হয় রোগীটিকে।

অলজাইমারস্-এর কারণ

মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের দ্রুত মৃত্যুর ফলেই তৈরি হয় অলজাইমারস্-এল উপসর্গগুলি। কোনও রোগীর কোন্ অঞ্চলের স্নায়ুকোষের কতগুলোর মৃত্যু হল, তার উপর নির্ভর করে কার কোন্ উপসর্গগুলো কত বেশি প্রবল হবে।

এই দ্রুত কোষের মৃত্যুকে বলা হয় মস্তিষ্ক ক্ষয় (Cerebral atrophy)। মস্তিষ্ককোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে মস্তিষ্ক বা মগজের ওজন। কুড়ি বছর বয়সের পর সবারই মস্তিষ্কের ওজন কমতে থাকে। কিন্তু অলজাইমারস্ রোগীর বেলায় এই ওজন কমার ব্যাপারটা ঘটতে থাকে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে।

অলজাইমারস্ রোগের গোটা-চারেক কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ যন্ত্রের সাহায্যে। (১) স্নায়ুজট (neurofibrillary tangle) (২) জরা চাপড়া (senile plaque) (৩) মঙ্গল রোগ (mongolism) (৪) পারকিন্‌সন্‌স্ রোগ (Parkinsons disease)।

জরা চাপড়া হল অতি ক্ষুদ্র কণা বা দানা যা মস্তিষ্ক স্নায়ুপথের আশেপাশে বেশি করে জমা হয়ে স্মৃতির যাওয়া-আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

স্নায়ুকোষের প্রাচীরে থাকে বিটা প্রোটিন। স্নায়ুকোষের মৃত্যুর পর পড়ে থাকে এই প্রোটিন। বিটা প্রোটিন ঘিরে থাকে মৃত স্নায়ুকোষের অবশিষ্টাংশ। এই জমা হওয়া বিটা প্রোটিন ও মৃত স্নায়ুকোষের অবশিষ্টাংশের দানাগুলোকেই বলে জরা চাপড়া।

জরা চাপড়ার উপস্থিতি থাকলেই অলজাইমারস্ রোগ হবে, এমনটি নয়।

যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন হাজার পাঁচেক করে স্নায়ুকোষের মৃত্যু ঘটতে থাকে, তাই বৃদ্ধদের মগজে কম বেশি খুঁজে পাওয়া যাবেই জরা চাপড়া। জরা চাপড়া যখন স্মৃতির যাওয়া-আসার পথে বাধার সৃষ্টি করে, তখনই অলজাইমারস্ রোগ দেখা দেয়।

স্নায়ুজট বা স্নায়ুজ্যাম হল একগাদা চিন্তার ভিড়ে মগজে খবর পৌঁছতে গোলমাল হয়ে যাওয়া।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ্ শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীর মানুষদের কাজকর্মের ধারা একটু একটু করে মস্তিষ্কের গতিময়তা বাড়িয়ে তোলে।

চিন্তাবিদ্ গবেষক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পী শ্রেণীর মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বা ভাবতে ভালোবাসেন না। এঁরা আত্মস্থ বা ফ্ল্যেগমাটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী। এই আত্মস্থ বা ফ্লেগমাটিক মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ পাঁচটা কাজে মাথা ঘামালে স্নায়ুকোষগুলোর কাজে অনেক সময়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্নায়ুকোষের মাধ্যমে মগজে বিভিন্ন খবর পৌঁছতে গিয়ে জট পাকিয়ে যায়। ব্যাপারটা রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের মতো।

একসঙ্গে বিভিন্ন কাজে যতটা মগজ খেলান সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতার বাইরে বেশি কাজে মাথা ঘামালে স্নায়ুজট হবার সম্ভাবনা বাড়ে। আবার কোনও একজন চিন্তাশীল এবং একই সঙ্গে মাঝারি মাপের প্রশাসক যদি সবাইকে সন্তুষ্ট করার মতো নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, ঘুমের সময় কম দেন, কিছুক্ষণের জন্য একা থাকার, বিশ্রাম নেওয়ার মতো সময় বের করতে না পারেন, শরীর ও মনকে কিছুক্ষণের জন্য রিল্যাক্সেশন দিতে না পারেন, গভীরভাবে চিন্তা করার, একটা ঘটনা বা বিষয়কে বিশ্লেষণ করার মতো সময় বের করতে না পারেন, মগজ খেলাবার মতো সময় না পান, তবে স্নায়ুজট ও অলজাইমারস্ রোগী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

মোঙ্গল রোগ (mongolism) মঙ্গলজাতীয় লোকেদের কোনও অসুখ নয়। মঙ্গল রোগী হল তারা যারা জিনের অস্বাভাবিকতার জন্য বা প্রজননগত ত্রুটির জন্য একটি বাড়িতি ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মায়।

স্বাভাবিক মানবকোষে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম। কখনও কখনও কেউ কেউ একটি বেশি ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মায়। অর্থাৎ তাদের ২৩ × ২ = ৪৬ ক্রোমোজোমের পরিবর্তে থাকে ৪৭ টি। এই বাড়তি ক্রোমোজোমের জন্যেই যত গণ্ডগোল।

৪৬ টি ক্রোমোজোম তৈরি করছে লক্ষাধিক জিন। এই লক্ষাধিক জিনের মধ্যে

তিনটি জিনকে দায়ী করলেন জিন-বিজ্ঞানীরা (genetists)। জিন তিনটির নাম দিলেন 'প্রেসিনিলাইন-১' (preseniline-1), 'প্রেসিনিলাইন-২' (preseniline-2) এবং 'অ্যাপোলাইপোপ্রোটিন-ই' (apolipoprotin-E)।

মঙ্গল রোগীরা খুব অল্প বয়সেই অলজাইমার রোগের শিকার হচ্ছেন। ২০-২৫ বছরেই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

পারকিন্‌সনস্‌ রোগের উপসর্গগুলো দৈহিক। অলজাইমারস্‌ রোগের মতো মানসিক নয়। এই রোগে পেশীর নমনীয়তা কমে যায়। ফলে হাঁটা, কথা, খাওয়া সবই অতি স্লথগতিতে সম্পন্ন হয়। হাত-পা-মাথা সবই কাঁপতে থাকে। কথা জড়িয়ে যায়। মুখ দিয়ে লালা পড়ে।

বক্সার ও ফুটবলারদের মধ্যে 'পারকিন্‌সন্‌স্‌' রোগের সম্ভাবনা বেশি। মাথায় ঘুসি ও হেড দেওয়ার কারণে গুরুতর ধরনের মস্তিষ্ক ক্ষয়ের শিকার হন। নরওয়ের জাতীয় খেলোয়াড়দের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন কম-বেশি ৬০ বছর বয়সে মস্তিষ্ক ক্ষয়ে ভোগেন।

জেমস্‌ পারকিন্‌সন্‌ (James Parkinson) নামের এক ব্রিটিশ চিকিৎসক এই রোগটিকে চিহ্নিত করেন। বর্তমানে রোগটি 'পারকিন্‌সনস্‌' নামে বেশি পরিচিত হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় রোগটির নাম 'প্যারালাইসিস অ্যাজিটেন্স (paralysis agitans)। প্রতি চারজন পারকিনসনস্‌ রোগীর মধ্যে একজন অলজাইমারস্‌ রোগে আক্রান্ত হন। সর্বকালের সেরা বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে অর্থাৎ মহম্মদ আলি প্রথমে পারকিন্‌সনস্‌ পরবর্তী কালে অলজাইমারস্‌ রোগে আক্রান্ত হন।

আমেরিকায় এক সমীক্ষা চালান হয় বছর দশেক আগে। তাতে বলা হয়েছে ষাট পেরনো মানুষদের শতকরা পাঁচ জনই অলজাইমারস্‌ রোগে আক্রান্ত হন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের গড় আয়ু হয়েছে ৬৫ বছর। ভারতে সাধারণভাবে চাকরিজীবী মানুষ ৬০ বছরে 'কর্মজীবন' থেকে অবসর নেন এবং অনেক সময়ই চাকরি থেকে অবসর নেওয়া মানেই হয়ে দাঁড়ায় কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ।

অফিসে কাজের মধ্যে, সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আড্ডায় মগজ খেলাবার সে সুযোগ ছিল, অবসর গ্রহণ অনেক সময় সেই মাথা খাটাবার সুযোগটুকুও কেড়ে নেয়। চিন্তার অলসতার সুযোগে গুটি গুটি পায়ে অলজাইমারস্‌ রোগটি ঢুকে পড়ে মস্তিষ্কে।

অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, ষাট পেরনো মানুষদের মধ্যে শতকরা হারে আমেরিকার চেয়ে ভারতে অলজাইমারস্ রোগীর সংখ্যা বেশি। ভারতীয় বৃদ্ধদের অলজাইমারস্ হলে পরিবারের লোক ধরে নেন—বুড়ো বয়সে এমনটা হয়ই। ফলে স্নায়ুবিশেষজ্ঞ দেখাবার কথা মনেই স্থান দেন না।

আমেরিকা-ইউরোপের মতো স্বাস্থ্য সচেতন হতে আমরা আদৌ শিখিনি। অলজাইমারস্ রোগে এ'দেশে কতজন তাঁদের স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন? সংখ্যাটা কত? তা নিয়ে কোনও পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। কারণ এ বিষয়ে কোনও সমীক্ষা চালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি ভারত সরকার। সমস্যাটির গুরুত্ব বোঝার মতো মগজের অভাব মন্ত্রীদের মধ্যে প্রবল।

জরাকে জয় করতে, অলজাইমারস্ রোগ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করতে ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। গবেষণা চলছে মস্তিষ্ক বিজ্ঞান ও জিন্ নিয়ে। জমা হচ্ছে নিত্য-নতুন তথ্য। আর ঠিক তখন ভারতে যোগ ও মেডিটেশনের নামে বিজ্ঞান-বিরোধী চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে আখের গুছিয়ে চলছে কিছু প্রতারক বা মানসিক রোগী।

অধ্যায় : দশ

'আই কিউ' কি বাড়ানো যায়?

সহজ-সরল উত্তর—হ্যাঁ, বাড়ানো যায়। একটি স্বাভাবিক মানুষ চাইলেই তার 'আই কিউ' বাড়াতে পারে।

'আই কিউ' আর 'মেধা' দু'টোকে আমরা অনেকেই সমার্থক শব্দ ভেবে নিই। ভুলটা এখানেই। 'আই কিউ' আসলে মেধা-বুদ্ধির পরিমাপক নয়।

কোনও দিন ছিলও না। 'আই কিউ' মাপাতে সন্তানকে নিয়ে যাঁরা দৌড়োন কোনও মনোবিদের কাছে, তাঁদেরও 'আই কিউ' নিয়ে ধারণাটা ধোঁয়াশায় ভরা।

'I. Q.' শব্দের পুরো কথাটা হল "Intellignece Qudient'। বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'বুদ্ধির ভাগফল'।

ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড' বিনেট এই 'I. Q. পদ্ধতির জনক! ফ্রান্সের একটা স্কুলের ছাত্রদের পাশ করার হার কমে যাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ বিনেটের সাহায্য চাইলেন। সময়টা ১৯০৪-০৫ সাল। বিনেট বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের জন্য প্রশ্নাবলী তৈরি করেছিলেন। এক একটা ক্লাশের ছাত্রদের জন্য এক এক ধরনের গড় বয়েস ধরা হতো। যেমন—ক্লাশ ওয়ান সাত ; ক্লাশ টু আট, ক্লাস থ্রি নয় ইত্যাদি। উত্তরদাতা যে বয়সের, সেই বয়সের জন্য নির্ধারিত সঠিক উত্তর দিলে উত্তরদাতার মানসিক বয়স (mental age) ও প্রকৃত বয়স (chronological age) সমান বলে ধরে নিয়ে তাকে দেওয়া হতো ১০০ নম্বর। অর্থাৎ দশ বছরের কোনও বালক দশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে দেওয়া হবে ১০০। এর অর্থ দশ বছর বয়সে সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদের যে ধরনের বুদ্ধি থাকা উচিত, তা আছে। ১০ বছরের বালকটি ২০ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলোর ঠিক উত্তর দিতে পারলে তার প্রাপ্য বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি বার করতে হলে যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সেই মানসিক বয়সের সংখ্যাটিকে উত্তরদাতার প্রকৃত বয়সের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{২০}{১০} \times ১০০ = ২০০$। আবার দশ বছরের বালকটি যদি কেবল মাত্র ৫ বছরের একটি শিশুর

বয়সের উপযোগী প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তবে তার মানসিক বয়স ধরা হবে ৫। অতএব বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{৫}{১০}$ × ১০০ = ৫০ মানসিক বয়স ভাগ প্রকৃত বয়স × ১০০ করলে বেরিয়ে আসবে বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি।

বিশ শতকের প্রথম দশকে আলফ্রেড বিনেট যে বুদ্ধি পরিমাপক প্রশ্নাবলী তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নামে বিকৃতকরণের পর আমরা পেলাম বর্তমান 'আই কিউ'-এর রূপ। ব্রিটেন ও আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষীরা আই কিউকে সামাজিক শ্রেণী ও জাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু করলো। অর্থাৎ, যে বিনেট আই কিউ প্রয়োগ করা শুরু করেছিলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাই প্রযুক্ত হতে লাগলো সমষ্টির ক্ষেত্রে। বিকৃতকারীরা এই প্রয়োগের দ্বারা তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইলো, সাদা চামড়াদের আই-কিউ কালো চামড়াদের চেয়ে অনেক বেশি ; আই কিউ মেধা বা বুদ্ধির পরিমাপক এবং মেধা বা বুদ্ধি অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সাদা চামড়াদের মেধা ও বুদ্ধি কালো চামড়াদের তুলনায় অনেক উন্নত—এই ছিল তাঁদের বক্তব্য।

আই কিউ-এর প্রয়োগ সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ বা জাতি গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ না করে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই আই কিউ প্রশ্নাবলী নির্ভরযোগ্যতা পাবে, এমনটা ভাবারও কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। কারণ প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত অনুশীলনে আই কিউ বাড়ানো সম্ভব, এমনকি স্মৃতিকেও বাড়ানো সম্ভব। প্রতিভা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, যা আই কিউ-এর প্রাপ্ত সংখ্যা বা পরীক্ষা সাফল্যের ওপর সব সময় নির্ভর করে না। বহু ক্ষেত্রেই আই কিউ-এর সাহায্যে জিনিয়াস দূরে থাক, বুদ্ধি বৃত্তির কোনও হদিশ মেলে না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যার 'নিউ সাইনটিস্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক একজেটার (Exeter) বিশ্ববিদ্যালয়ের Human cognition বিভাগের অধ্যাপক এম হাও (M. Howe) সত্তর জন বিরল সংগীত প্রতিভার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—

জিনিয়াস তৈরি হয়, জন্মায় না
(Geniuses may be made rather than born)

আমরা আই কিউ পরীক্ষার সাফল্য নিয়ে বিচারে বসলে আইনস্টাইন, ডারউইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখ বহু প্রতিভাধরদের ক্ষেত্রে একেবারে বোকা বনে যেতাম।

অধ্যায় : এগারো

জিন বা বংশগতি-ই ঠিক করে মেধা-বুদ্ধি?

অনেকেই হৈ-হৈ করে বলে উঠবেন—এতো জানা কথা। বংশগতির নিয়ম অনুসারে একজন অপরাধীর ছেলে অপরাধীই হবে, ভালো মানুষের ছেলে ভালো। এই বংশগতি তত্ত্বের উপর নির্ভর করে একটা গোটা প্রবাদ আছে, 'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।'

বাংলা হিন্দি সিনেমায় আমরা এই ধরনের কাহিনী কম দেখিনি। সহজ সরল 'বিজ্ঞান-সম্মত' ফর্মুলা-১। একজন সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, খুনি, ডাকাত ইত্যাদি। আর একজন দয়ার সাগর রাজা। একই দিনে ডাকাত আর রাজার ছেলে জন্মাল। ডাকাত নিজের ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজমহলে ঢুকে ছেলে বদল করে নিল। সিনেমার অন্তিমলগ্নে আমরা নীতি উপদেশ পেলাম ডাকাতের ছেলে রাজবাড়ির পরিবেশে বড় হলেও 'ছোটলোক'-ই রয়ে গেছে। রাজপুত্র ডাকাতদের মধ্যে বেড়ে উঠেও আকাশের মতো উদার।

ন'লাখি পত্রিকার দৌলতে আমরা প্রত্যেকেই জেনে ফেলেছি, একজন মানুষ ভবিষ্যতে চোর হবে কি বহুগামী—সবই জিন ঠিক করে রাখে।

আমাদের জানা আর বিজ্ঞানের জানা এক কিনা দেখে নিই আসুন।

বিগত একশো বছরে আমরা Biological determinist (এঁরা মনে করেন মানব প্রতিভা বিকাশে জিনই সব) Cultural determinist (এঁদের মতে পরিবেশই মানব প্রতিভা বিকাশে সব) এবং Interactionist (এঁদের মতে জিন বা পরিবেশ দুই-ই মানব প্রতিভা বিকাশে ক্রিয়াশীল)-এদের নানা বক্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনেছি। সেসব নিয়ে সামান্য আলোচনায় ঢোকার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ইদানীং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। ব্যাপক গবেষণা চলছে মানুষের বুদ্ধির ওপর বংশগতি বা জিনের প্রভাব ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে।

আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জিন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে আপনাদের মূল বিষয় জানার উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না। জিন আলোচনা তাই কম কথায় সীমাবদ্ধ রাখবো।

মানুষের জন্মের শুরু ডিম্বকোষ শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে।

নিষিক্ত কোষ দু-ভাগ হয়ে গিয়ে হয়ে যায় দুটি কোষ। দুটি কোষ বিভক্ত হয়ে হয় চারটি কোষে। এমনিভাবে চার থেকে আট, আট থেকে ষোল—প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত বিভাজন ক্রিয়া চলতেই থাকে।

বেশিরভাগ কোষের দুটি অংশ। মাঝখানে থাকে 'নিউক্লিয়াস' ও তার চারপাশে ঘিরে থাকে জেলির মতো জলীয় পদার্থ 'সাইটোপ্লাজম'। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে 'ক্রোমোজোম'। এই ক্রোমোজোম আবার জোড়া বেঁধে অবস্থান করে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম আবার এক বিশেষ ধরনের 'ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড'-এর (Deoxyribonucleic acid) অণুর সমষ্টি—সংক্ষেপে ডি এন এ। দু-গাছা দড়ি পাকালে যেমন দেখতে হবে, অণুগুলো তেমনিভাবেই পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকে। সব প্রাণীর বংশগতির সংকেত এই ডি এন এ-তেই ধরা থাকে। ডি এন এ থেকে আর এন এ বা (Ribonucleic acid) তৈরি হয়। আর এন এ থেকে তৈরি হয় প্রোটিন (Protein)।

২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়ার ক্ষেত্রে একটি আসে পুরুষের শুক্রাণু থেকে, অন্যটি নারীর ডিম্বাণু কোষ থেকে। ক্রোমোজোমের এই জিন এককভাবে বা অন্য জিনের সঙ্গে মিলে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। চুলের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহের রঙ ও গঠন, রক্তের শ্রেণী (O, A, B, AB) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ জিনের ভূমিকা রয়েছে।

জিন বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন নারী-পুরুষের মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংযুক্তি ৮০ লক্ষ রকমের যে কোনও একটি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই দেখা যায়, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে বহু ধরনের অমিল থাকতেই পারে। লম্বা-বেঁটে, মোটা-রোগা, বাদামী চোখ, নীল চোখ, শান্ত-ছটফটে ইত্যাদি।

মা-বাবার চোখের মণি কালো, কিন্তু সন্তানের চোখের মণি কটা, মা বাবা স্বল্প দৈর্ঘ্যের মানুষ সন্তান বেজায় লম্বা, মা বাবা ফর্সা সন্তান কালো অথবা এর বিপরীত দৃষ্টান্তও প্রচুর চোখে পড়বে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেললে। বাবা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমনটা ঘটা সম্ভব।

কিছু জিন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, পিতা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমন ঘটা সম্ভব একাধিক বা বহু প্রজন্ম পরে জিনের সুপ্তি ভাঙার জন্য। যেখানে বাবাই

প্রকৃত সন্তানের জনক সেখানে অনুসন্ধান চালালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে সন্তানটির মা অথবা বাবার পূর্বপুরুষদের কারো না কারো চোখের মণি ছিল কটা, কেউ না কেউ ছিলেন লম্বা, গায়ের রঙ ছিল কালো ইত্যাদি। আমার এক নিকট আত্মীয়ার দু-হাতের কড়ে আঙুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাড়তি দুটো আঙুল। আত্মীয়ার নামটি প্রকাশ করায় অসুবিধে থাকায় আমরা এখানে বোঝার সুবিধের জন্য ধরে নিলাম, নামটি তার মাধুরী। মাধুরীর মা এবং বাবার নাম মনে করুন মিতা ও আদিত্য। মিতা ও আদিত্যে কোনও হাতেই বাড়তি আঙুল নেই। মাধুরীর এই বাড়তি আঙুলের মধ্যে আদিত্য রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মিতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নিজেকে মাধুরীর জনক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। স্রেফ দুটি বাড়তি আঙুল ওদের শান্তির পরিবারে নিয়ে এসেছিল অশান্তির আগুন।

ওঁদের অশান্তির কথা আমার কানেও এসেছিল। মিতা বাবাকে হারিয়ে ছিলেন শৈশবে। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানতে পারি, মিতার বাবার দু'কড়ে আঙুল থেকেই বেরিয়েছিল বাড়তি দুটি আঙুল। একটা পুরোন ছবিও উদ্ধার করা গিয়েছিল, যাতে মিতার মা ছিলেন চেয়ারে বসে, বাবা দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতের দৃশমান কড়ে আঙুল নজর করলেই চোখে পড়ে বাড়তি আঙুল।

ব্লাডপ্রেসার হাই? ডায়াবেটিসে ভুগছেন? হতেই পারে বংশগতির কারণে (সাদা বাংলায় বংশগত কারণে) এই রোগগুলোর শিকার হয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে শিশুরা চশমা পরে তাদের বাবা-মায়ের অন্তত একজন বেশি পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করেন। অলজাইমারস্ থেকে থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি বহু রোগই জিনের সাহায্যে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।

যেখানে রোগ আসে মানসিক কারণে

হাঁপানি জিন বাহিত রোগ নয়। অর্থাৎ বংশগতভাবে হাঁপানি হয় না। কিন্তু তারপরও আমরা দেখতে পাই বাবা বা মায়ের হাঁপানি আছে তো ছেলে-মেয়েরা হাঁপানিতে ভুগছে। অর্থাৎ বাবার হাঁপানি আছে, ঠাকুরদার হাঁপানি ছিল, সন্তানও হাঁপানিতে ভুগছে। এতে মনে হতে পারে যে রোগটা বোধহয় জিন দ্বারা বাহিত হয়।

অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের অনেকেই হাঁপানিতে ভুগছেন। তাতে বংশগত ভাবার যুক্তিটা আরও পোক্ত হয়। কিন্তু ধারণাটা ভুল। হাঁপানি বংশগত রোগ নয়।

এরপর প্রশ্ন উঠতেই পারে তাহলে বংশ পরম্পরায় রোগটা কেন চলে আসছে? হাঁপানি কি ছোঁয়াচে?

দ্বিতীয়টির উত্তর-ই আগে দিই। হাঁপানি ছোঁয়াচে নয়। এবার আসি প্রশ্নের প্রথম ভাগে। যে কোনও কারণে ফুসফুসের শ্বাসনালী সংকোচিত হলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। একেই বলে হাঁপানি। যে কোনও বয়সেই হতে পারে। অ্যালার্জি থেকে হতে পারে ; বিশেষ করে ধোঁয়া, ধুলো শষ্যকণা, ফুলের রেণু, পশুলোম যা নিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করে। আবার কিছু খাবার যেমন কাঁকড়া, চিংড়ি মাছ, ডিম ইত্যাদি থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। জীবাণু সংক্রামণ থেকেও হাঁপানি হতে পারে। কিছু জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মধ্যে হাঁপানি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন—খনি-শ্রমিক, সিমেন্ট কারখানার শ্রমিক তুলো শ্রমিক ইত্যাদি।

হাঁপানি এমন একটা রোগ যা মানসিক কারণেও হতে পারে। শুধু হাঁপানি নয়, অনেক রোগই মানসিক কারণে হতে পারে। কাশি, ব্লাডপ্রেশার, বুক ধড়ফড়, ক্লান্তি, অবসাদ, পেটের অসুখ, আলসার, শরীরের কোনও অংশে অবশতা, মাসিকে গোলমাল বা মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া, অনিদ্রা, তোঁতলামো, মাথা ব্যথা, হাড়ে ব্যথা ইত্যাদি রোগগুলো শুধুমাত্র মানসিক কারণেই হতে পারে। মানসিক কারণে যখন অসুখ হয়, তখন সেই অসুখকে 'দেহ-মনজনিত' অসুখ বা Psycho-somatic disorder বলে। রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন একটা বিশ্বাসবোধ কাজ করে, তেমনই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসবোধ খুবই কার্জকর ভূমিকা নিতে পারে।

হাঁপানি যখন অন্য কোনও কারণ ছাড়া শুধুমাত্র মানসিক কারণে হয়, তখন সাধারণভাবে যা হয়ে থাকে—

আমরা ছোট বয়েস থেকে শুনে আসছি, 'হাঁপানি বংশগত রোগ'। বাবা বা মায়ের অ্যালার্জি বা অন্য কোনও কারণে হাঁপানি আছে। সুতরাং সন্তান ভাবতেই পারে, ভবিষ্যতে তারও হাঁপানি হবে। এই ভুল বিশ্বাস থেকেই মানসিক কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট শুরু হতে পারে।

আজও অনেক শিক্ষিত পরিবার হাঁপানি রোগীর ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে সন্তানের বিয়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। একইভাবে পাগল পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান না।

গুজরাট দাঙ্গার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার নারী-পুরুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। সমাজজীবনে অনিশ্চয়তা, স্বপ্নভঙ্গ, তীব্র প্রতিযোগিতার চাপ, ভয়, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি কারণে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। কেউ বউ

ছেলেমেয়ে নিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করেছিলেন। কারখানা বন্ধ হলো। রাজনীতিকরা কারখানার জমি বেচে প্রমোটিং শুরু করলো। মানুষটি চারদিক অন্ধকার দেখলেন। উৎকণ্ঠায় মাথায় গোলমাল দেখা দিল। ওমনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে বংশগতির কারণে পাগল হওয়ার সম্ভাবনা-বীজ রোপিত হল—এমন চিন্তাটাই অসুস্থ ও বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তা। কিন্তু এই ধরনের বহু প্রচলিত ভুল ধারণার শিকার হতেই পারে সন্তানরা। তারা যদি ভাবতে থাকে, "ভবিষতে আমিও পাগল হবো না তো?"—"জেনেটিক কারণে আমরা পাগল হওয়ার সম্ভাবনা আছে"—তবে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে। এভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ মানসিক ভারসাম্য হারালে তা হবে Phycho-somatic disorder-এর উদাহরণ।

অধ্যায় : বারো

বংশগতি গবেষণা ও স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতি

গত ১৫ বছরে জিন বা বংশগতি নিয়ে গবেষণা যতটা এগিয়েছে, তার আগের ১৫০ বছরে জিন গবেষণার সামগ্রিক সাফল্য সেই তুলনায় অতি সামান্য। পাশাপাশি স্নায়ুবিজ্ঞানের জগতে এসেছে অসামান্য সাফল্য। আশ্চর্য সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জিন-বিজ্ঞানী ও স্নায়ুবিজ্ঞানীরা।

স্কটল্যান্ডের ড. উইলমট ও তাঁর সহকর্মীরা ৬ বছরের একটি স্ত্রী ভেড়ার স্তনগ্রন্থির থেকে একটি কোষ নিয়ে তা থেকে একটা ভেড়ার সৃষ্টি করেছিলেন। নাম রাখা হয়েছিল 'ডলি'। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নাম 'ক্লোনিং'।

ডলির ক্লোনিংয়ের এক সপ্তাহ পরেই জিন-বিশেষজ্ঞরা আরও বড় ধরনের একটা বিস্ফোরণ ঘটালেন। আমেরিকার ওরিগন রিজিওনাল প্রাইমেট রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা বানরের ভ্রূণকোষ থেকে যমজ বানরের সৃষ্টি করলেন। এই ক্লোনিং বিজ্ঞানের চোখে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বানর মানুষের খুবই কাছাকাছি প্রাণী। একটি বানরের সঙ্গে মানুষের জিনগত পার্থক্য শতকরা এক ভাগ মাত্র।

ভেড়ার ক্লোনিং প্রচারের আলো এতই বেশি টেনে নিল যে এক সপ্তাহ পরের বানরের ক্লোনিং তেমন সাড়া জাগাতে পারল না। কিন্তু জিন-বিজ্ঞানী, শারীর বিজ্ঞানী ও স্নায়ুবিজ্ঞানীদের কাছে এই সৃষ্টির গুরুত্ব ছিল ভেড়ার ক্লোনিং-এর চেয়ে বহুগুণ বেশি।

এই ক্লোনিং-এর সাফল্য বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখন জিনের ত্রুটি সারিয়ে তোলার বিষয়ে উন্নত দেশগুলোতে বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে।

স্নায়ুরোগে আক্রান্তকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলার জন্যে নার্ভ-ট্রান্সপ্লান্ট অর্থাৎ স্নায়ু-সংস্থাপন-এর প্রচলন হতে চলছে। স্তন্যপায়ী পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর মগজে ওই প্রজাতির বাচ্চার মগজ থেকে কোষ নিয়ে সংস্থাপন করা হচ্ছে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে।

গিনিপিগের ক্ষেত্রে মগজের কিছু অংশ বাদ দিয়ে স্মৃতি নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর বাচ্চা গিনিপিগের মগজ থেকে প্রয়োজনীয় স্নায়ুকোষ সংস্থাপন করলে দেখা যাচ্ছে তাদের স্মৃতিশক্তি আবার ফিরে আসছে।

স্নায়ুবিজ্ঞানীরা আশা করছেন কয়েক বছরের মধ্যেই অসুস্থ, বিনষ্ট স্নায়ুকোষগুলোর জায়গায় নতুন স্নায়ুকোষ স্থাপন করা যাবে। তার ফলে শতায়ু মানুষরা আর অথর্ব জীবন নিয়ে শতবর্ষ পার করবেন না। সমস্ত দিক থেকেই থাকবেন টগবগে তরুণ।

এই বিজ্ঞানীরা এমন আশাও প্রকাশ করেছেন যে, ইতিমধ্যে তাঁরা নতুন নতুন 'নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর আবিষ্কার করে ফেলবেন।

জিন-বিজ্ঞানী ও স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন Cultural determinist-দের সংখ্যা একচেটিয়া। এঁরা মনে করেন মেধা বংশগতির উপর নির্ভর করে না। পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এটাও স্বীকার করেন যে, মানবগুণ বিকাশের সম্ভাবনা জিনের প্রভাবে শুধু মানুষেরই আছে।

জিন মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করে

মানুষের জিন-ই মানুষকে মানুষ করে তুলেছে। মানুষের বদলে একটা বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে রেখে যতই চেষ্টা করুন না কেন, মানুষের মেধা-বুদ্ধি-বিদ্যে দিতে পারবেন না। কারণ বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় কোনওভাবেই তার বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়।

আমরা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মতো জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করি—এসবের কোনোটাই জন্মগত নয়।

এইসব অতি সাধারণ মানবধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা (Protentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, আশেপাশের মানুষরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। এই মানবশিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে সেই পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। আমার সমবয়স্ক বা তার চেয়ে প্রাচীন সংবাদ পাঠকদের অনেকেরই জানা নেকড়েদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া 'রামু' ও 'কমলার' ঘটনা। নেকড়েদের ডেরা থেকে বালক-বালিকা দুটিকে উদ্ধার করার পর তাদের এই নামকরণ করা হয়েছিল। ওরা দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতো, জিব দিয়ে চেটে জল পান করতো, রান্না করা খাবার খেত না। কথাও বলতে জানতো না, পরিবর্তে নেকড়ের মতোই আওয়াজ করতো। এরা মানুষের সমাজের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পেরে বেশি দিন বাঁচেনি।

আমার আপনার পরিবারের কোনও শিশু সভ্যতার আলো না দেখা আন্দামানের আদিবাসী জাড়োয়াদের মধ্যে বেড়ে উঠলে তার আচার-আচরণে, মেধায় জাড়োয়াদেরই গড় প্রতিফলন দেখতে পাব। আবার একটি জাড়োয়া শিশুকে শিশুকাল থেকে আপনি আমি আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলে দেখতে পাব শিশুটি বড় হয়ে আমাদের সমাজের আর দশটি ছেলে-মেয়ের গড় বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু একটি মানুষের পরিবর্তে একটি বনমানুষকে বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতোই তাকেও পড়াশোনা শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারবো না ; কারণ ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভিতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানবগুণ বিকাশে জিন ও পরিবেশ দুয়েরই প্রভাব বিদ্যমান।

অধ্যায় : তেরো

মানবগুণ বিকাশে পরিবেশের প্রভাব

একটি মানুষের শিশু বয়স থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানবিক গুণের ক্রমবিকাশের বিষয়ে উন্নততর দেশগুলোতে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চালান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ওইসব দেশের মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করেই নিয়েছেন—মানুষের বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ অবৈশিষ্ট্যই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। সেই কারণে "মানবিক গুণের বিকাশে কার প্রভাব বেশি—বংশগতি অথবা পরিবেশ?" এই জাতীয় শিরোনামের বিতর্কে ওসব দেশের বিজ্ঞানীরা আজকাল আর অবতীর্ণ হন না, এককালে যেমনটি হতেন। **তবে এখনও এদেশের বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানী বংশগতিকে অধ্যধিক বা চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাকেই অস্বীকার করে বসেন, নাকচ করে দেন। এমনটা করার কারণ সম্ভবত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজখবর না রাখা।** এক সময় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার পর প্রতিষ্ঠা পেতেই নিশ্চল হয়ে যাওয়া।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, বিগত বহু হাজার বছরের মধ্যে মানুষের শারীরবৃত্তিক কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

এই কম্পিউটার যুগের আধুনিক সমাজের মানবশিশুর সঙ্গে বিশ হাজার বছর আগের ভাষাহীন, কাঁচামাংসভোজী সমাজের মানবশিশুর মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না।

অর্থাৎ সেই আদিম যুগের মানবশিশুকে এযুগের অতি উন্নততর বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী কোনও সমাজে বড় করতে পারলে ওই আদিম যুগের শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজের গড় মানুষদের মতোই বিদ্যে-বুদ্ধির অধিকারী হতো। হয় তো গবেষণা করত মহাকাশ নিয়ে অথবা সুপার কম্পিউটার নিয়ে, অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকান দেশের নিরন্ন, হতদরিদ্র, মূর্খ মানুষগুলোও হতে পারে ইউরোপ,

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোর সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাতন্ত্র্যতা নিশ্চয়ই থাকতো, যেমনটি এখনও থাকে।

বর্ণপ্রাধান্য, জাতিপ্রাধান্য, পুরুষপ্রাধান্য বজায় রাখতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের প্রচার চালান হয়, উন্নত দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের বর্ণের, তাদের জাতির মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য। পুরুষরাও একইভাবে প্রচার করে নারীর চেয়ে তাদের মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতার।

বুদ্ধি মাপের নামে বুদ্ধ্যাঙ্ককে কাজে লাগিয়ে অনেক সাদা-চামড়াই প্রমাণ করতে চায় কালো চামড়ার তুলনায় তাদের মেধা ও বুদ্ধির উৎকর্ষতা। আবারও বলি এ যুগের বিজ্ঞানীরা কিন্তু যে বংশগতির তথ্য হাজির করেছেন, তাকে স্বীকার করলে বলতেই হয়, অনুকূল সুযোগ-সুবিধে না পাওয়ার দরুনই নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষগুলো অনুকূলতার সুযোগ পাওয়া মানুষের মতো মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত করার সুযোগ পায়নি।

এ কথাও সত্যি সামান্য অনুশীলনেই কিন্তু বুদ্ধ্যাঙ্ক প্রচুর বাড়ানো সম্ভব—প্রজ্ঞা বা মেধাকে আদৌ না বাড়িয়েই।

রাশিয়ার শিক্ষাসংক্রান্ত আকাদেমির (Pedagogical Acedemy)-র পূর্ণ সদস্য এ পেট্রোভস্কি (A. Petrovsky)-র প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি—স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই শিশুদের অনেক বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যক্রম রাশিয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা সৃষ্টি করা যায়। দু-সপ্তাহের শিশুকে সাঁতার শেখান হচ্ছে, স্কুলে ঢোকার আগেই তিন মিটার স্প্রিং বোর্ড থেকে ডাইভিং শিখছে। অনুকূল সুযোগ অনেককেই বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেকে প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে পরিণত বয়সে।

পরিবেশকে আমরা প্রথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক : প্রাকৃতিক পরিবেশ, দুই : সামাজিক পরিবেশ। মানবজীবনকে এই দুই পরিবেশই প্রভাবিত করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হলেও পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অনুকূলে আনার চেষ্টা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করি তার উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, জমির উর্বরতা ইত্যাদির উপর আমাদের বহু শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। তাইতেই গ্রামবাংলার মানুষের সঙ্গে পাঞ্জাবের মানুষের, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের, আফ্রিকার দক্ষিণবাসী মানুষদের সঙ্গে ইউরোপের মানুষদের, মেরু অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মরু অঞ্চলের মানুষদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখতে পাই।

বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন—চুলের রঙ, দেহের রঙ, দেহ গঠন, ইত্যাদির মতো অনেক কিছুর পিছনেই যদিও জিন বা বংশগতির অবদান যেমন আছে, তেমনই এও সত্যি—দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব শরীরগত নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই আবার জিনকে প্রভাবিত করে।

বিজ্ঞানীরা এও স্বীকার করেন—অতি বিস্ময়কর জটিল আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও ডি এন-এর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি বিস্ময়কর।

প্রকৃতির প্রভাব যে দেহগত বৈশিষ্ট্য, দেহ বর্ণের উপর প্রভাব ফেলে থাকে, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। পরিবর্তে বিষয়টা বুঝতে আমরা একটি দৃষ্টান্তকে ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

যে মনুষ্যগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের চামড়ার নীচে ঘোর কৃষ্ণ রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ঘটেছে তীব্র তাপ থেকে দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করতে। শরীরের ভেতরে যন্ত্রপাতিকে বাঁচানোর প্রয়োজনেই দেহ বর্ণের এই পরিবর্তন বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে সূচিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আমাদের শরীরবৃত্তির ওপর নয়, মানসিকতার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের চাষী উর্বর জমির মালিক, সহজেই সেচের জল পায়, সে অঞ্চলের চাষীরা আয়াসপ্রিয় হয়ে পড়ে। হাতে বাড়তি সময় থাকার জন্য গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। এমনি-ভাবেই তো বঙ্গ সংস্কৃতিতে এসেছে 'বারো মাসে তের পার্বণ'। আবার একই সঙ্গে আয়াসপ্রিয়তা আমাদের আড্ডা প্রিয়, পরনিন্দা প্রিয়, ঈর্ষাকাতর, তোষামোদ প্রিয়

ইত্যাদির মতো বদ্‌দোষের পাশাপাশি বড় বেশি নিরীহ, আপোষমুখি করতেই পারে, দূরে সরিয়ে রাখতে পারে লড়াকু মানসিকতাকে, যদি না সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তাদের এইসব দোষ থেকে মুক্ত করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বা মরু অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ন্যূনতম খাদ্য পানীয় সংগ্রহেই, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি, মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মতো সময়টুকুও থাকে না।

আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়ের তলাতেই তো গলানো সোনা। আয়াসহীনভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। শ্রমহীন, প্রয়াসহীন মানুষগুলো স্রেফ প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগ সর্বস্ব হয়ে পড়ে। ভোগ থেকে কিছু সময় বুদ্ধি মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে খরচ করতেও এদের অনীহা। কী প্রয়োজন শ্রমে, বুদ্ধি মেধা বাড়াবার শ্রমে? জীবিকার জন্যেই তো? প্রাচুর্য যেখানে অসীম, ফুরিয়ে দেওয়ার ফুরসৎ নেই, সেখানে শ্রম একান্তই নিষ্প্রয়োজন। পেট্রলখনির মালিকদের অর্থ প্রাচুর্য এদের ভোগ-সর্বস্ব করে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে যাদের বাসভূমি তাদের না আছে আবাদী জমি, না আছে শিল্প-কারখানা, না আছে কাজ পাওয়ার সুযোগ। বেঁচে থাকার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সামান্যতম খাদ্য পানীয় যোগাড় করতে এরা প্রতিটি দিন যে সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামই এদের অনেক বেশি অনমনীয় করে তোলে। আবার যে সব পাহাড়ি অঞ্চল ঘিরে ভ্রমণ ব্যবসা জমে উঠেছে, সে অঞ্চলে মানুষরা ভিন্নতর মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে।

বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকর এই চাপের মুখে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়ে না এবং মানসিক রোগের কারণেই রক্তচাপ বৃদ্ধি, হাঁপানি, আন্ত্রিক, ক্ষত, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগও অনেকেই ভোগ করেন।

মানবিক গুণের বিকাশে জনসংখ্যার ঘনত্বেরও কিছু প্রভাব আছে। ঘনবসতি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরীরা না পায় খেলার মাঠ, না দেখে মুক্ত আকাশ। বিরল বসতি বা পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা অঞ্চলে যে সব ছেলে মেয়েরা বড় হয়, তারা পার্কে ঘোরে, মাঠে খেলে, নদীতে বা পুকুরে সাঁতার দেয়, নীল আকাশ, সবুজ গাছ, সবই তাদের ভিন্ন-ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এখান

থেকেই দেশের ভবিষ্যৎ সাঁতারু, ভবিষ্যৎ ফুটবলার, ক্রিকেটার কি অ্যাথেলিট তৈরি হয়।

সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

সামাজিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

সামাজিক পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করলে সুবিধে হয়। এক : আর্থ-সামাজিক, দুই : সমাজ-সাংস্কৃতিক।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

দরিদ্র ও উন্নতিশীল দেশে, যেখানে জীবন-ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে রয়েছে বঞ্চনা ও অনিশ্চিয়তা, সেখানে মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এসব দেশের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের হাতে নেই জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ, নেই চিকিৎসার সুযোগ নেই শিক্ষা লাভের সুযোগ আছে, অপুষ্টি, আছে রোগ, আছে পানীয় জলের অভাব, আছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুরও অভাব, আছে বঞ্চনা, আছে দুর্নীতি, আছে শোষণ।

শৈশবে সন্তানের সবচেয়ে কাছের মানুষ মা। মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের মানসিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সন্তানের স্বাস্থ্য ও মানসিকতা। মায়ের অপুষ্টি, মায়ের বুকের দুধ দানের অক্ষমতা, শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে অক্ষমতা ; যে অক্ষমতার কারণ মাকে বেঁচে থাকার ভাত রুটি যোগাড়েই জেগে থাকা সময়ের পুরোটাই প্রায় ব্যয় করতে হয়। সময়ের অভাব ছাড়াও থাকে অর্থের অভাবজনিত অক্ষমতা। মায়ের দরিদ্র রুগ্ন স্বাস্থ্য ও মানসিক অবসাদ শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে।

শৈশব ও কৈশোরে শিশুরা ভোগে অপুষ্টিতে। খাদ্যাভাবে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবে আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরীরা বেশির-ভাগই অপরিণত দুর্বল দেহ ও মনের অধিকারী। এরা স্নায়ু দুর্বলতায় ভোগে, বোধশক্তি কম। আমাদের দেশে প্রতি-বছর আড়াই লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরী দৃষ্টিশক্তি হারায় স্রেফ ভিটামিন 'এ'-র অভাবে।

'ইউনিসেফ'-এর হিসেব মতো এই দুনিয়ায় প্রতিবছর উদরাময়ে মৃত্যু হয় চল্লিশ লক্ষ শিশুর, নিউমোনিয়ায় বাইশ লক্ষ, হামে পনের লক্ষ, ম্যালেরিয়ার দশ লক্ষ, ধনুষ্টঙ্কারে আট লক্ষ। অনাহারের তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণায় শিকার পনের কোটি শিশু—যাদের বয়স পাঁচ বছরের নিচে। ক্ষুধা আর রোগের আক্রমণে মৃত্যু পরোয়ানা লেখা জীবন্ত কঙ্কাল এইসব শিশুদের প্রায় সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশ,

লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাহারা মরু সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী।

বর্তমানে আমাদের দেশে দশ কোটি শিশু কোনও দিনই স্কুলের মুখ দেখেনি ও দেখবেও না—যাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। '৯০ সালে যে দশ কোটি শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে চার কোটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও শেষ করতে পারেনি স্রেফ দারিদ্র্যতার কারণে।

যে বয়সের শিশুরা পড়ে খেলে, আমাদের দেশের শিশুরা সেই বয়সেই নিজের পেট চালাতে, পরিবারকে সাহায্য করতে শ্রম বিক্রি করে। এরা কাজ করে ক্ষেতে, ইট ভাটায়, চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজে, বিড়ি তৈরির কারিগররূপে, গৃহভৃত্যরূপে, বাস, লরির ক্লিনাররূপে, ফেরিওয়ালারূপে, দোকানীরূপে, ঠোঙা তৈরির শ্রমিকরূপে; আরও বহু বহু রূপে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত ২০০৩-এর তথ্য অনুসারে ভারতে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা ১১ কোটির কাছাকাছি।

এর বাইরেও আরো কয়েক কোটি শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে জীবন-ধারণের জন্য পাচার করে চোলাই মদ, অন্যান্য মাদকদ্রব্য, বেআইনি বিদেশী দ্রব্য, আড়াই কোটি কিশোরী বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ বিক্রি করে।

এরাই যখন বড় হয়, হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী শক্তি। চুরি, ডাকাতি, লুঠপাট, ওয়াগান ভাঙা, ছিনতাই করা, দোকান-বাজার থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা, সাট্টা, জুয়া, চোলাই, হেরোইন ইত্যাদির ব্যবসা করা, নির্বাচনে বুথ দখল করা, লালসা মেটাতে ধর্ষণ করা ইত্যাদি নানা সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে কোনও উপায়ে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোই এদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামের কিশোরী-যুবতীদের চেয়ে শহর ও শহরতলী বস্তিবাসী ও ঘিঞ্জি এলাকার বস্তিবাসী কিশোরী ও যুবতীদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এখানে একটি ছোট্ট ঘরে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভোরের সূর্যের প্রতীক্ষা করতে হয়। অনেক সময়েই এরা নারী-পুরুষের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে যৌন আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ফুটপাতবাসী কিশোরীদের অবস্থাও একই রকম। অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও যৌনজীবনে প্রবেশ করে মস্তান, আত্মীয় বা পরিচিতিদের হাত ধরে। বহু ক্ষেত্রেই কর্মজীবনে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়ে, পরের বাড়ি রাঁধুনী বা দাসীর কাজ করতে গিয়ে, অন্যের লালসা মেটাতে বাধ্য হয়। পেটের তাগিদে যৌন-শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে না। ভোগবাদী সংস্কৃতি অনেক মেয়ে বউকেও কলগার্ল তৈরি করছে। ছেলেরা যৌন উত্তেজনা কিনতে বেশ্যালয়ে যায়। মেয়েরা যৌন-উত্তেজনা মেটাবার পাশাপাশি টাকা রোজগারও করে। যৌন-উত্তেজনা ও টাকা—দু'টোই জবরদস্ত নেশা।

বেঁচে থাকার তাগিদে যখন যৌন-শোষণের শিকার হয় নারী বা কিশোর (হ্যাঁ, অল্পবয়সী ছেলেরাও) তখন তাকে 'আর্থ-সামাজিক পরিবেশের শিকার' বলে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু যখন নারী বাড়তি রোজগার ও যৌন-উত্তেজনা মেটাতে নিজেদের যৌনতা বিক্রি করে, তখন সে সমস্যাকে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবেশের প্রভাব বলতে পারি।

যখন একজন শুধুমাত্র বাঁচতে ও পরিবারকে বাঁচাতে চুরি করে, চোরাচালানে বাহকের কাজ করে ইত্যাদি, তখন আমরা বলতে পারি, 'এসব অপরাধের কারণ আর্থ-সামাজিক'। কিন্তু সব অপরাধীদের বেলায় আমরা যদি বলতে থাকি, 'ওর কোনও দোষ নেই, আর্থ-সামাজিক অবস্থাই ওকে অপরাধী করেছে'—তবে তা হবে অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট।

আজকে যারা পরিবারের পেটে একবেলা ভাত জোটাতে 'সমাজবিরোধী' কাল তারাই রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের পোষা মস্তান। খুন, তোলাবাজি, প্রোমোটিং-এর পাশাপাশি বুথ দখল, বা রিগিং করে, পার্টির সিট জিতিয়ে দেয়। মন্ত্রী থেকে পুলিশ সব্বাইকে দিয়ে থুয়েই এদের এক এক জনের আয় মাসে ৩ লাখ থেকে ৩০ লাখ। কখনও বা এরাই হয়ে ওঠে মন্ত্রী-সাংসদ বা বিধায়ক। তেমনটা একবার হতে পারলে এক লাফে আয়টা ১০০ গুণ বাড়বে।

১৯৮৯ সালে গিয়েছিলাম সিংভূম জেলার বান্দিজারি গ্রামে। চাইবাসা থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের পথ। কিন্তু বেশ দুর্গম। গ্রামটি জঙ্গলের ভেতর। জঙ্গল ভেদ করে আলো আসে না, সবসময় অন্ধকার ঘেরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি এলাকা। গ্রামে শ'দুই ঘর—শ'দুই পরিবার। গত এক মাসে ১০০ জনের উপর অজানা মারণ ব্যাধির শিকার। খাওয়ার জল চাওয়াতে যে জল এনে দিলেন সে জলের রঙ কালচে শ্যাওলার মতো, তীব্র দুর্গন্ধ। জল খেতে পারিনি। শুনলাম এ জলই ওরা পান করেন। সংগ্রহ করেন একটা প্রাচীন কুয়ো থেকে। এক বাড়ির জলের হাঁড়িতে উঁকি মারতেই দেখতে পেলাম জলের পোকা ও বেঙাচি।

অবাক বিস্ময়ে এও জানলাম, এও শুনলাম, উপজাতি বা অনুপজাতীয় কোনও নেতাই এই মারণ রোগের প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলে তুচ্ছ কারণে ব্যতিব্যস্ত করতে চাননি সভার শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিদের।

বান্দিজারি গ্রামের মোনল লুগদি মুণ্ডার সঙ্গে কথা বলেছি। ওর নিজের ছেলেটিও এই অজানা রোগে মারা গেছে দিনকয়েক আগে। লুগদির ধারণা, বোঙ্গার অভিশাপেই এই মড়ক। দূরের হাসপাতালে রোগী পায়নি। কারণ পাঠিয়ে লাভ

নেই। যাদের মারবার, বোঙ্গা তাদের মারবেই। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটিই পথ, তা হলো বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট করা। তুষ্ট করতে তাই বোঙ্গার পুজো দেওয়া হয়েছে, বলি দেওয়া হয়েছে ছাগল-মুরগী।

বান্দিজারির কাছেই মনোহরপুর অঞ্চল। মনোহরপুর ব্লকের বারোটি গ্রামই আক্রান্ত। মনোহরপুরের আদিবাসীদেরও ধারণা বান্দিজারির আদিবাসীদের মতোই। তারাও বোঙ্গার রোষ কমাতে পুজো দিয়েছে। বাড়ি বাড়ি মরার খবর দিতে গিয়ে তাঁরা কাঁদছিলেন। না দোষারোপ করেননি সরকারের উদাসীনতার। দোষ দেননি বোঙ্গাকে পর্যন্ত। দোষ দিয়েছেন নিজেদের ভাগ্যকে।

দূরদর্শনের পর্দায় বা বাণিজ্যিক সিনেমায় আমরা যে সুন্দর শান্ত ছবি দেখি, তা নিয়ে কিন্তু আমাদের দেশ নয়। আমাদের দেশ লক্ষ বান্দিজারি গ্রাম নিয়েই।

এত সব আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই ফল।

এই পরিবেশের চাবিকাঠি যাদের হাতে তারা চায় না ওইসব বঞ্চিত মানুষগুলোর নেশা কাটুক, ঘুম ভাঙুক, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হোক। এই সচেতনতা আনতে পারে অনুকূল, সুস্থ সমাজ— সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

আর এও চরমতম সত্য—অর্থনৈতক স্বাধীনতা না থাকলে চিকিৎসা লাভের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতা ইত্যাদি সব স্বাধীনতাই অর্থহীন রসিকতা মনে হয়।

সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব

মানুষ সৃষ্ট যা কিছু, সবই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মূল উপাদান দু-রকম। বস্তুগত ও অবস্তুগত। গৃহ থেকে গৃহ-সামগ্রী, যানবাহন থেকে যুদ্ধাস্ত্র—সবই মানব সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান। অবস্তুগত উপাদান হল—নীতিবোধ থেকে নীতিহীনতা, স্পষ্টবাদীতা থেকে চাটুকারিতার মতো বিভিন্ন মানসিকতা।

এই বস্তুগত ও অবস্তুগত অর্থাৎ মনন-জগতের উপাদান নিয়েই চলমান একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকে, পাল্টে যেতে থাকে বস্তুগত সংস্কৃতির জগৎ। সময়ে পরিবর্তিত হতে থাকে মানুষের চিন্তা-চেতনা। পাল্টে যেতে থাকে অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদান। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলোর প্রধান নিয়ন্ত্রক ধনকুবের হুজুরের দল। তাদের সহায়ক শক্তি যো-হুজুরের দলে আছে গদি দখলের

প্রতিযোগিতায় নামা রাজনৈতিক দলগুলো, প্রশাসন, পুলিশ, সেনা, প্রচার মাধ্যম, বুদ্ধিজীবী। দেশ চালাতে বেয়াদপদের শায়েস্তা করতে পুলিশ-সেনার দরকার হয়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যেন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে—তা দেখভালের বনিময়ে প্রশাসনও হাতে হাতে ফল পায়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নানা ভোগ্যপণ্যের প্রতি তীব্র ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে বিজ্ঞাপন সংস্থা-বুদ্ধিজীবী-প্রচার মাধ্যমের যৌথ উদ্যোগ। এই ক্ষিদে জাগিয়ে তোলার জন্য যে মগজধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে, তা অবস্তুগত সংস্কৃতি। ফলে একটি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র বা বেকার ছেলেটিরও মোটরবাইক চাই, সেল-ফোন চাই, পিটার ইংল্যান্ডের সার্ট চাই, অ্যাভিসের প্যান্ট চাই, ওয়াকম্যান চাই, রে-ব্যান সানগ্লাস চাই, কিংফিসার বিয়ার চাই। চাই চাই যতই বাড়ছে ততই ভোগ্যপণ্যের বাজার বাড়ছে। বাড়ছে বস্তুগত সংস্কৃতির রমরমা।

আমরা কী ধরনের কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ পড়ব, তা ঠিক করে দিচ্ছে, বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রকাশক। খুল্লাম-খুল্লা মেয়েরা হল 'সাহসী' মেয়ে—এই প্রচার গত কয়েক বছর ধরে একটা বড় পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন্ ধরনের সিরিয়াল দেখবো, কোন্ ধরনের সিনেমা—সবই ঠিক করে দিচ্ছে কোটিপতি চ্যানেল মালিক ও সিনেমার প্রডিউসর। কাকে 'উগ্রপন্থী' বলব, কাকে 'নকশালপন্থী' কে 'দেশপ্রেমিক' কে 'দেশদ্রোহী' সবই ঠিক করে দিচ্ছে পোষা বুদ্ধিজীবীরা। কোনও কুকুরকে গুলি করে মারার আগে 'পাগলা কুকুর' বলে ছাপ মেরে দেওয়া হয়। তাতে পশুপ্রেমিকদের কাছেও হত্যাটা অনুমোদন পায়। ঠিক তেমনই ঘটে হতদরিদ্র, প্রতারিত, নির্যাতিত মানুষগুলোর চোখে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠলে। সবাই তার ন্যায্য অধিকার চাইলে কি দেশ চালানো যায়!

এইসব হতদরিদ্র 'ছোটলোক'রা উদ্ধত হলে তাদের
'নকশাল' বা 'উগ্রপন্থী' বলে দেগে দেওয়া হয়।
যদিও ওইসব শীর্ণ, অভুক্ত মানুষরা জানেই
না 'মার্কসবাদ' খায় না মাথায় মাখে।

এ দেশের মাতঙ্গিনী হাজরাদের সাহস গুঁড়িয়ে দিতে এ দেশের পুলিশ ও মিলিটারিরা গণধর্ষণ করে আসছে গত শতকের ছ'য়ের দশক থেকে। সেই ট্রাডিশন আজও বহন করে চলেছে আমাদের মহান ভারত?

মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের মগজধোলাইয়ের কল্যাণে 'নকশাল' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের হত্যা আমাদের ষোল আনা অনুমোদন পেয়ে বসে আছে। 'নকশাল' বা 'উগ্রপন্থী' মেয়েদের উপর পুলিশ সেনার গণ ধর্ষণ আমাদের মনে একটিও আঁচড় কাটে না।

আমাদের মূল্যবোধ, রুচি, চাহিদা, চেতনা, জীবনধারা সবই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের আশেপাশে মানুষজন, প্রচারমাধ্যম, সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রা-টিভি, রাজনৈতিক নেতাদের দলবাজি ইত্যাদি হাজারো বিষয়।

একটি জরুরি তথ্য : মানুষ যেমন সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি মানুষ সাংস্কৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিতও করে। সেই প্রভাব ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে।

মার্কস, লেনিন, মাও, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, শ্যামাপ্রসাদ, চারু মজুমদার-এর চিন্তাধারা এ দেশের লক্ষ কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছে। সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার, আন্দোলিত করার ক্ষমতা সবার নেই। তবে কারও কারও আছে।

অধ্যায় : চোদ্দ

মগজ কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং

শিশুকালে আমাদের প্রভাবিত করে মা-বাবা, পরিবারের বড়রা। কর্মব্যস্ত মা-বাবা, এবং ছোট পরিবার হলে অনেকটা সময় কাটে কাজের লোকের কাছে অথবা ক্রেসে। চেতনার স্ফুরণ ঘটে তাদের হাত ধরে। তারা কী খাওয়াচ্ছে, কী ধরনের পোশাক পরাচ্ছে, কী ধরনের ব্যবহার ও ভাষা শেখাচ্ছে—সবই ছাপ ফেলে শিশু মনে।

স্কুলে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুলের বন্ধু, খেলার সঙ্গীদের আচার, ব্যবহার, খাদ্যাভাস, পোশাক, অন্ধবিশ্বাস, মুক্তচিন্তা, বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের মূল্যবোধ গড়ে উঠতে থাকে। কেউ জেনে বুঝে, কেউ বা না জেনে প্রভাবিত হতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে ঈশ্বর ও জ্যোতিষে বিশ্বাস অথবা মুক্তচিন্তার ধারণা। গড়ে ওঠে রাজনৈতিক মতাদর্শ সমর্থন অথবা রাজনীতিতে বিরাগ। খেলা, সাহিত্যে, নাটকে বা অন্য কোনও বিষয়ে অনুরাগ।

শিশুকাল থেকে আমাদের মগজে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে নানা ধ্যানধারণা-মূল্যবোধ। মা-বাবা গুরুজন-শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করবে। ভাই-বোনদের ভালোবাসবে। দেশের মাটিকে শ্রদ্ধা করবে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। পুরুষদের চোখের জল শোভা পায় না। মেয়েরা দুর্বল, 'অবলা'। ছেলেরা সংসারের কর্তা হবে (কর্তৃত্ব করবে), স্বামী (প্রভু) হবে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণ সহনশীলতা। নারীত্বের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। পতিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করবে। পতির পরিবারের সকলের সেবা করবে। সন্তানের জন্য ত্যাগ-ই মাকে মহান করে। সাধু-সন্তদের 'মনীষী' বলে। 'ধর্ষিতা' পরিবারের কলঙ্ক ; তাই এমন ঘটনা চেপে যেতে হয়। প্রকাশ হয়ে গেলে ধর্ষণকারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই সঠিক পুনর্বাসন।

এমনই হাজারো লাখো ধারণা, মূল্যবোদ আমাদের মগজে গুঁজে দেয় সমাজের মাথা বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ধর্মগুরু ইত্যাদিরা। এটাকেই বলে 'ব্রেন প্রোগ্রামিং'। 'ব্রেন' বা মগজ হল এক বিশাল প্রাকৃতিক কম্পিউটার। এই কম্পিউটার-ই মানুষকে চালনা করে।

'ব্রেন ওয়াশিং' বা মগজধোলাই :

'ব্রেন ওয়াশিং' বা মগজধোলাই হল পুরোন 'ব্রেন প্রোগ্রামিং'-কে মুছে নতুন ভাবে 'প্রোগ্রামিং' করে দেওয়া।

যেমন ধরুন, যুক্তি দিয়ে এক সময় বোঝানো হয়েছিল,

যারা ঘৃণ্য অপরাধী তারাও কারও মা-বাবা হতে পারে। এমন অপরাধীর সন্তান মা-বাবাকে শ্রদ্ধা না করে অশ্রদ্ধা করলে সমাজটা সুন্দর হবে।

অপরাধী মা-বাবাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিলে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাই প্রমাণিত হবে। একই নিয়মে গুরুজন ও শ্রদ্ধেয় পেশার মানুষদের প্রশ্নাতীতভাবে শ্রদ্ধা জানান ঠিক নয়। শ্রদ্ধেয় পেশা বলতে আমরা বুঝি বিচারক, উপাচার্য, অধ্যাপক, আই এ এস, আই পি এস, আই আর এস ইত্যাদিকে। বিচারক টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তারের আদেশে স্বাক্ষর করছেন, টাকার বিনিময়ে অপরাধীকে মুক্তি দিচ্ছেন—এসবই আমরা খবরে দেখেছি পড়েছি। শাসক দলের জুতোর শুকতলা হয়ে 'উপাচার্য' পদ বাগালে কি তাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ? অধ্যাপকরা যত না পড়াচ্ছেন তারচেয়ে বেশি রাজনীতি করছেন, তারচেয়েও বেশি টিউশনি করেন, কোশ্চেন আউট করেন, নাম্বার বাড়িয়ে রোজগার করেন—এমন সংখ্যাটা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

'ভাই-বোন' শুধু এই সম্পর্কের জোরে কোনও বিবাদে ওদের পক্ষ নেব, প্রয়োজনে ওদের জন্য দাঙ্গা-খুন করে বসব—এটা কখনই সুন্দর সমাজ গড়তে সাহায্য করবে না। বরং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ভ্রাতৃপ্রেম ও ভগ্নীপ্রীতি সমাজকে দূষিত করবে।

সন্তানের প্রতি যে প্রেম অন্ধ, তা কখনই কাম্য নয়। হাজার হাজার বছর ধরে 'ব্রেন প্রোগ্রামিং' করে আমাদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে সম্বন্ধে এমন কতকগুলো ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে এগুলো ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক বা সহজাত প্রভৃতি বলে আমরা ভাবতে শুরু করেছি। এটা যেমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিক চিন্তাভ্যাস, তেমনই নারীতান্ত্রিক সমাজে উল্টো চিন্তাভ্যাস প্রচলিত। ভারতের পার্বত্য এলাকার অনেক জনগোষ্ঠীর নারীরাই রোজগেরে, পুরুষরা ঘরকন্না সামলায়। আবার অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকান। ওখানে ছেলে-মেয়েদের বিভেদ গেছে ঘুচে।

সাধু-সন্ত-ঈশ্বর দেখার দাবিদাররা প্রত্যেকেই হয় প্রতারক, নতুবা মানসিক রোগী। তাদের 'মনীষী' অর্থাৎ বিশাল মাপের জ্ঞানী ভাবনার মধ্যেই রয়েছে বড় রকমের ভুল।

'ধর্ষণ' একটা শারীরিক অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতন চালাবার প্রক্রিয়ার নাম। ধর্ষণে ধর্ষিতা ও তার পরিবারের সম্মানহানি ঘটে—এই প্রচলিত অন্যায় ধারণা পাল্টানো সুন্দর সমাজ গড়ার জন্যই প্রয়োজন। তার জন্য ধর্ষণের ঘটনাকে চাটনি না করে, ধর্ষককে ঘৃণা করতে শিখুন ও শেখান।"

আজ এই ধারণাগুলো বহু মানুষকেই প্রভাবিত করছে। আগেকার মূল্যবোধ মগজ থেকে সরিয়ে দিয়ে এই নতুন বক্তব্যকে স্থান দিতে পেরেছে। একে আমরা বলতে পারি—পুরোন প্রোগ্রামিং মুছে নতুন প্রোগ্রামিং ঢুকিয়ে দেওয়া। নতুন ব্রেন প্রোগ্রামিং-কে আমরা বলতে পারি 'ব্রেন ওয়াশিং'।

নারী-পুরুষের মিলনের ইচ্ছা সহজাত প্রবৃত্তি। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে কয়েক'শ বছর আগেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল আজকের তুলনায় অন্য রকম। পতি-পত্নীর দেহমিলন ছিল একান্তভাবেই শারীরী উত্তেজনা নির্ভর। এই যৌন-উত্তেজনায় ভালোবাসার বোধ জারিত থাকত না। সমস্ত প্রক্রিয়াই ছিল অতিমাত্রায় যান্ত্রিক। আদিম সমাজে সব নারী-পুরুষই ছিল সবার জন্যে। একটা সময় নারীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ নারীরাই সমাজের প্রধান চালিকা শক্তি। পরবর্তীকালে পুরুষতান্ত্রিকতার রমরমার সময় শুরু হল। সমাজে শৃঙ্খলা আনতে সমাজপতিরা বিয়ের প্রচলন করলেন। বিবাহসম্পর্কের বাইরের কারও সঙ্গে যৌনসম্পর্ককে অনৈতিক ঘোষণা করলেন।

তাতেও সহজাত কামপ্রবৃত্তিকে লাগাম পড়ান গেল না। প্রেম বিষয়ে উন্নত মূল্যবোধ এখনও আমাদের আমজনতার মগজে ঢোকেনি। আমরা এখনও প্রেমহীন কামনায় ডুবে আছি। এ দেশে বিয়ে হয় প্রায়শই অপরিচিত নারী-পুরুষদের মধ্যে। "প্রেম করে বিয়ে নয়। সম্বন্ধ করে বিয়ে" এমন দাবি করার মধ্যে পাত্র-পাত্রীর মা-বাবার গর্ব বিচ্ছুরিত হয়। তারপর দুই অপরিচিত নারী-পুরুষ বর-বউ হওয়ার সুবাদে ফুলশয্যার রাতেই হামলে পড়ে সঙ্গমে। এই যান্ত্রিক ক্রিয়ায় উত্তেজনা আছে, কিন্তু প্রেম নেই। 'প্রেম' তাই একটা সুক্ষ্মতর, উন্নততর চিন্তা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে। এগিয়ে থাকা মানুষরা, বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক শিল্পী রাজনীতিক ব্যবসায়ী ধর্মগুরুরা বুঝে নিয়েছেন ধর্ষণের চেয়ে সমর্থন আদায় করে মিলিত হলে তা আরও সুখকর ও রুচিসম্মত হয়। নাম ও ক্ষমতার জোরে আজ তারা নারীকে প্রোমোট করে বা সম্পদের বিনিময়ে তার সমর্থন আদায় করে নিয়েছে। অনেক সময় নারী নিজেই রূপের জালে, কামের ফাঁদে ফেলে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

আবার এই দেশেই ব্যতিক্রমী মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে দেহমিলনের সঙ্গে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নেই, এক্সপ্লয়টেশন নেই। গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্কে জারিত হয়ে সমাধা হয় শরীরবৃত্তীয় কাজটি।

প্রেম থাকলে মিলন অনিবার্য এবং সুন্দর। দুটি সুস্থ শরীর কিন্তু দেহমিলন নেই—এমন 'প্লেটনিক প্রেম' অসুস্থ মানসিকতার লক্ষণ।

প্রেম ও দেহমিলন নিয়ে কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণা আছে, তার ইয়ত্তা নেই। "প্রেম তো রেশনের চাল নয় যে, আরও কয়েক জনের মধ্যে বিলি করলে কমে যাবে।" — কথায় ও কাজে এই নীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীও আছেন।

আবার এমন মানুষ আছেন যাঁরা মিলন মুহূর্তে যদি বোঝেন তাঁর সঙ্গী ও সঙ্গিনী মিলনে আন্তরিকভাবে অংশ নিচ্ছেন না, ওমনি উত্তেজনার পারদে ঠাণ্ডা জল পড়ে। অনেকের প্রেমিক সত্তা অন্য কোনও 'আকর্ষণীয়' সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কোনও প্ররোচনাতেই সামান্যতম উত্তেজিত হন না। বরং বিরক্তই হন। উন্নত চেতনা আমাদের সহজাত যৌন প্রবৃত্তিকে মার্জিত, শোভন, সুন্দর ও সুসংস্কৃতিসম্পন্ন করে তোলে।

এই যে নিজেকে গড়ে তোলা, এই যে উত্তরণ, এর পিছনে রয়েছে ব্রেন প্রোগ্রামিং ও ব্রেন ওয়াশিং। চিন্তার আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে এগিয়ে থাকা মূল্যবোধকে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে প্রোগ্রামিং করে রাখা।

বছর কয়েক আগের ঘটনা। আমার কাছে এক তরুণ এলেন। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে এক দিনের জন্যেও স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তরুণটির লিঙ্গে স্ফীতি বা দৃঢ়তা আসছে না।

এই ধরনের যৌন অক্ষমতা বিভিন্ন কারণেই হতে পারে। এ বিষয়টা ডিটেলে জানা দরকার। যেমন :

(১) সমস্যাটা বিয়ের আগে থেকেই ছিল, না বিয়ের পরে হয়েছে?

(২) স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর মানসিক সম্পর্ক কেমন? স্ত্রীকে পছন্দ করেন কি না?

(৩) স্ত্রীর চেয়ে নিজেকে ছোট মাপের মানুষ মনে করেন কি না?

(৪) যৌনতা বিষয়ে কোনও কারণে ঘৃণা আছে কি না?

(৫) সমকামী ছিলেন কি না?

(৬) ড্রাগ ও মদের প্রতি অতি আসক্তি আছে কি না?

(৭) সঙ্গমে আগ্রহ আছে কি না?

(৮) হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষ বিষয়ে রোগীর ধারণা?

(৯) কিডনীর কোনও অসুখ আছে কি না? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তরুণটির সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা শুরু করলাম। জানালেন, বিয়ের আগে জানতেন না তাঁর লিঙ্গ স্ফীত বা দৃঢ় হয় কি না।

উত্তর শুনে অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি হস্তমৈথুন বা স্বমৈথুন করেননি বিয়ের আগে?"

এরপর যা উত্তর পেলাম, তা আরও বিস্ময়কর। জানালেন, স্কুলের শুরু থেকে একটি মিশনের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো। স্কুল জীবনে শিক্ষকদের কাছ থেকে নাকি শুনেছেন—চল্লিশ দিনে মানুষের দেহে তৈরি হয় এক ফোঁটা রক্ত। আর চল্লিশ ফোঁটা রক্ত সমান এক ফোঁটা বীর্য। বীর্য ক্ষয়ে শরীর-স্বাস্থ্য-স্মৃতি নাকি নষ্ট

হতে বাধ্য। বীর্য রক্ষাই নাকি পুরুষত্বের লক্ষণ। নারীদের নরকের দ্বার বলার কারণ নাকি এই যে—নারী পুরুষের বীর্য ধারণে পুষ্ট হয়, ও পুরুষ নারী-সঙ্গমে বার বার তার শরীর ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে।

মিশনের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে বইপত্তর পড়েও তরুণটি বীর্য সম্পর্কে একই ধরনের কথা জেনেছেন। ওসব বইপত্তর নামী-দামী স্বামীজীদের, আধ্যাত্মিক নেতাদের লেখা। ফলে কোনও দিন স্বমৈথুন বা হস্তমৈথুনের সাহায্যে বীর্যপাত ঘটাবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, নারীদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকতেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে স্বাভাবিক যৌন শরীরবৃত্ত-সম্পর্কে ধারণাই হয়নি।

জিজ্ঞেস করলাম, "নারী-সঙ্গ যখন এতই অপছন্দ তাহলে আপনি বিয়ে করলেন কেন?"

উত্তরে জানালেন, "বাবা-মা'র ইচ্ছেকে ঠেলতে পারিনি। কারণ তাঁরাই তো জীবন্ত দেবতা।"

তরুণটিকে দীর্ঘ সময় ধরে বোঝালাম, স্বামীজীদের বীর্য সম্পর্কে ওইসব বক্তব্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী। হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষ অতিসাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন স্বাভাবিক ঘটনা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা যৌন সম্পর্ক। বীর্যপাতের কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বীর্যভাণ্ড পূর্ণ হয়ে যায়। অতিমাত্রায় হস্তমৈথুন থেকে যৌন বিকার আসতে পারে, কিন্তু পরিমিতি রেখে যৌনমিলন যেমন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রকাশ ও সুস্থতার লক্ষণ, তেমনই স্বমৈথুনও মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনামাত্র।

মেয়েদের মধ্যেও হস্তমৈথুন বা স্বমৈথুন স্বাভাবিক ঘটনা।

দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে বীর্য সম্পর্কে তরুণটির হাজির করা নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্য দিয়ে তরুণটির মন থেকে ভুল ধারণাগুলো তাড়াতে চেষ্টা করি। আলোচনা বা কাউন্সেলিং-এর সাহায্যে তরুণটির বীর্যপাত বিষয়ে ভয় দূর করতে সক্ষম হই। তরুণটি তার স্বাভাবিক জীবনে ফেরে।

তথাকথিত পূজ্য স্বামীজীর মুর্খতার ফসল ওইসব হিজিবিজি বিজ্ঞানবিরোধী বই। স্বামীজীর 'পাণ্ডিত্য' ছেলেটির মগজে যেভাবে প্রোগ্রামিং করেছিল, তারই পরিণতিতে বেচারা তার সহজাত প্রবৃত্তি ভুলেছিল। বীর্য ক্ষয় নিয়ে এমন ভয় মগজে বাসা বেঁধেছিল যে মগজধোলাই ছাড়া উত্তরণের রাস্তা ছিল না।

সমকামিতা কি সহজাত প্রবৃত্তি ?

কেউ কেউ মনে করেন 'সমকামিতা' সহজাত প্রবৃত্তি। এদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞান পেশার মানুষও আছেন। এ বিষয়ে একটু খেটে ওয়েবসাইট ঘাঁটলে এমন বিজ্ঞানবিরোধী কথা তাঁরা নিশ্চয়ই বলতেন না। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় দোষ হল—অহংভাব যতটা বেশি, জানার আগ্রহ ততটাই কম।

মৈথুন ইচ্ছা 'সহজাত', সমকামিতা সহজাত প্রবৃত্তি নয়। বিপরীত লিঙ্গের অভাব

মেটায় সমলিঙ্গেরা। মিলিটারি ব্যারাকে, পুলিশ ব্যারাকে, কলেজ হোস্টেলে, জেল কয়েদিদের মধ্যে ব্যাপকতা পেয়েছে সমকামিতা। ব্যারাকে, হোস্টেলে পর্ণোবই ও ব্লু-ফিল্মের রমরমা যৌন প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়। অনুসঙ্গ হিসেবে রয়েছে মাদক। ওরা যৌন উত্তেজনার উপসম ঘটায় সমকামির সঙ্গে মৈথুন করে।

কট্টর অপরাধীদের মধ্যে মাদক আসক্তি এবং সঙ্গমলিপ্সা অতি তীব্র। বেশ্যালয়ে যাওয়া নিত্যরাতের ঘটনা। জেলে বিপরীত লিঙ্গের কারুকে আনা সাধারণভাবে সম্ভব হয় না বলেই সমকামিতার চল। যেসব মাফিয়া ডন টাকার জোরে, দুর্নীতির তাগতে নিজের জেলখানায় ফাইভ স্টার হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে, স্কচ হুইস্কির ফোয়ারা বওয়াতে পারে, তারা কলগার্ল এনে চুটিয়ে ভোগও করে। তারা কোন্ দুঃখে সমকামি হতে যাবে?

সমকামী সেনা, পুলিশ, হোস্টেলজীবন কাটানো ছেলে ও মেয়েরা পারিবারিক জীবনে এলে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গেই সহবাস পছন্দ করে। এটাই মূল স্রোত।

দেহে পুরুষ, মনে মেয়ে, অথবা শারীরিকভাবে মেয়ে কিন্তু মানসিকভাবে ছেলে এমন কিছু মানুষ আছে। তাদের এই অবস্থার জন্য মা-বাবা আত্মীয় পড়শিদের মানসিকতাই মূলত দায়ী। শিশু বয়সে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বা মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে বার-বার যদি সেই শিশুকে সুন্দর দেখাচ্ছে বলে প্রশংসা করতেই থাকা হয়, তা শিশু মনে গভীর দাগ কাটে। এর ফলে সে নিজেকে অন্য লিঙ্গের মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, ভাবতে শুরু করে।

কাউন্সেলিং করতে গিয়ে দেখেছি, সমকামিতার শিকার কিছু গোঁড়া পরিবারের কিশোর-কিশোরী। বিপরীত লিঙ্গের সমবয়স্কদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার সুযোগ নেই ; খোলামেলা মেলামেশার সুযোগ নেই। কিশোরীদের পাকাবার জন্যে বৌদিরা আছেন। কিশোরদের পাকাবার জন্যে দুপুরের ভিডিও শো-ই যথেষ্ট। স্কুল ফাঁকি দিয়ে ব্লু-ফিল্ম দেখা আজ এই বাংলার লাখো গ্রামের সমস্যা। এইসব কাম-পাগলা-পাগলীদের কাম নিবারণের একমাত্র রাস্তা প্রায়শই সমকামিতা, বিকল্পে অজাচার।

সমকামিতা মগজধোলাই থেকেই এসেছে

'সমকামিতা' প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা চালিত কাম-এর বিকৃত রূপ। 'সমকামিতা' সহজাত প্রবৃত্তি নয়, নয় জিন নির্ধারিত সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনলিপ্সা।

সময়মত কাউন্সেলিং করালে, মনোবিদ্দের সাহায্য নিলে এই মনোরোগকে সারিয়ে তোলা সম্ভব।

সমকামিতাকে উৎসাহিত করতে অতি মাত্রায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছে কিছু প্রাচর-মাধ্যম। তারা যে ভাবে বিষয়টাকে 'প্রমোট' করতে মগজ ধোলাইয়ে নেমেছে, তাকে 'উদ্দেশ্যহীন পাগলামো' বলে ধরে নিলে বোধহয় ভুল হবে।

অধ্যায় : পনেরো

মগজধোলাই-এর প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে

সমাজ ও রাষ্ট্র চরিত্র যতই জটিল হচ্ছে ততই মগজধোলাইয়ের প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে। মগজধোলাইয়ের পদ্ধতিগত জটিলতাও বাড়ছে।

রাষ্ট্র কাকে বলে? এ বিষয়ে দুটি সংজ্ঞা প্রচলিত।

এক : রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকতে হবে। থাকবে জনসমষ্টি। একটি সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। 'সার্বভৌমত্ব' শব্দের অর্থ বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করার স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক নীতি থেকে শিক্ষানীতি সবই অভ্যন্তরীণ নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই চারটির উপস্থিতি থাকলে তবেই তাকে রাষ্ট্র বলা যায়। একটির অনুপস্থিতিই 'রাষ্ট্র' সংজ্ঞা কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

যেমন ধরুন পশ্চিমবঙ্গের কথা। পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে, জনসমষ্টি আছে, সরকারও হাজির। নেই শুধু সার্বভৌমত্ব। তাই পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নয়।

দুই : শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হল রাষ্ট্র বা স্বাধীন দেশ। রাষ্ট্র পরিচালনার রূপ নানা রকমের হতে পারে। যেমন—রাজতন্ত্র, ডিক্টেটরের স্বৈরাচারী শাসন, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র।

'রাজতন্ত্র' ও 'ডিক্টেটরের স্বেচ্ছাচারী শাসন' আমরা প্রত্যেকেই বুঝি। 'বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র' বলতে বুঝি যেখানে সরকার 'জনগণের মধ্য থেকে, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য' গঠিত। কিন্তু বাস্তবে যে সরকার দেশের পুঁজিপতির শ্রেণীর টাকায়, পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য নির্বাচিত।

'সমাজতন্ত্র' কাকে বলে? মার্কসবাদ অনুসারে—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে বলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও শ্রেণী বিভাজন থাকবে না। 'শোষক' ও 'শোষিত' এই দুটি শ্রেণীর বিলোপ ঘটবে। ফলে যে কোনও ধরনের শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটবে। পুঁজিপতি বা শিল্পপতি বলে কোনও গোষ্ঠী থাকবে না। এই মত অনুসারে রাষ্ট্রের মানুষই হবে উৎপাদিত সামগ্রীর ও রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের মালিক। খাদ্য-বস্ত্র-মাথার ছাদ-চিকিৎসা-শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্য-বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রথম মতটি দ্বিতীয় মতের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়। এক নম্বর সংজ্ঞা অনুসারে ভারতকে কি রাষ্ট্র বলা যায়? শতকরা প্রায় একশো ভাগই বলবেন ভারত একটি রাষ্ট্র। 'স্বাধীন রাষ্ট্র' বলার দরকার নেই। কারণ রাষ্ট্র হতে গেলে স্বাধীন হতেই হবে। অর্থাৎ ভারতের শাসক দলই ঠিক করবে দেশের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি।

কিন্তু কেউ যদি বলে বসেন—ভারত 'রাষ্ট্র' নয়। তাকে আমরা নিশ্চয়ই পাগল বলবো। কিন্তু তিনি যদি বুঝিয়ে দেন, প্রমাণ করে দেন, ভারতের বৈদেশিক নীতি থেকে অর্থনৈতিক নীতি ঠিক করে দেয় আমেরিকা—তখন কী বলবেন? বাস্তব সত্যিটা কিন্তু তাই। আমাদের দেশ কার্গিল যুদ্ধের কখন সমাপ্তি ঘটাবে? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফোঁস ছেড়ে কবে গলাগলি করে শান্তির পায়রা ওড়াবে? কৃষি ভর্তুকি কমাবে কিনা? সংস্কৃতিতে ভোগবাদ ও ভাববাদের প্রচার তীব্র থেকে তীব্রতর কখন করতে হবে? কখন বেয়াদপ দরিদ্রগোষ্ঠীকে 'নকশাল' বা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে ঝাড়ে-বংশে শেষ করতে হবে—সবই ঠিক করে দেয় আমাদের দাদা দেশ আমেরিকা। আমাদের ক্রিকেট টিমে কে কে খেলবে, তা ঠিক করে দেয় পেপসি-কোক-হোন্ডার মতো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো। তাদের ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডর কনুই ভেঙে খেলতে না পারলেও খেলাতে হবে। স্পনসরদের কাছে সিলেকশন কমিটি থেকে ক্রিকেট বোর্ড পর্যন্ত সবই নির্ভেজাল নপুংসক।

এত কিছুর পর কোনওভাবেই আমরা বলতে পারি না যে, ভারত সত্যিই একটি 'রাষ্ট্র'।

এ'বার চলুন দ্বিতীয় মতটি নিয়ে আলোচনায় যাই। দ্বিতীয় মত অনুসারে ভারতকে কি রাষ্ট্র বলা যায়? একগুচ্ছের মার্কসবাদী সাংসদ-বিধায়করা চেঁচিয়ে উঠবেন—ভারত অবশ্যই একটি রাষ্ট্র বা স্বাধীন দেশ। রাষ্ট্র পরিচালনার রূপটি হল 'বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র'।

কিন্তু এ দাবি তো সত্যি নয়। আক্ষরিক অর্থেই ভারত স্বাধীন এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। ভারতে যে রাজনৈতিক দল-ই নির্বাচনে জিতে গদিতে বসে, সে শুধুমাত্র ভারতের পুঁজিপতিদের টাকায়, পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার কাজ করে না। গদিতে টিকে থাকার স্বার্থে, দলের ও নিজের শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে দাদা দেশের ইচ্ছেয় চালিত হয়। অতএব, শতকরা ৭০ ভাগ গরীবদের ভুল বোঝাতে মগজধোলাই করতেই হয়।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। পেপসি-কোকে পোকা-মাকড় পাওয়া যাচ্ছে বলে দেশ জুড়ে হৈ-হৈ। পানীয় দুটির বিক্রি পড়ল হুড়মুড়িয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার ও কিছু রাজ্য সরকার পানীয় দুটির কারখানা জনস্বার্থে বন্ধ করে দেবে—জানিয়ে দিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পেপসি-কোকের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পেপসি-

কোকের দোকানে ভাঙচুড় করে সংবাদের শিরোনামে। শেষপর্যন্ত কী হল! আমেরিকা সরকার ভারতকে ছোট্ট করে একটা হুমকি দিল, পেপসি-কোকের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ কর। ওদের ফ্যাক্টরি বন্ধ করলে তোমাদের অ্যাইসা। বাক্যটি শেষ করার আগেই লেজ গুটিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় লাগালো রাজনৈতিক পার্টিগুলো। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ক্লিন চিট দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার থুতু ফেলে সে থুতু চাটলো।

ভারত এখন শুধুমাত্র দেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থ-রক্ষার মহান দায়িত্ব সামলায় না, বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থ-রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ।

এরপর ভারতে রাষ্ট্র পরিচালনার রূপটি 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' বললে, তা হবে হয় অতি সরলীকরণ; নতুবা তোতাপাখির শেখা বুলি কপ্‌চে দেওয়া। সত্যিকে চাপাতে মগজধোলাই করে।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হলো। সংবিধানের মুখবন্ধে (Preamble) ঘোষণা রাখা হলো, ভারত 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

'সার্বভৌম' শব্দের ব্যাখ্যা এবং ভারত কতটা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী—সে বিষয়ে আগেই আমরা আলোচনা সেরেছি। এবার আসি 'গণতান্ত্রিক' ও 'প্রজাতন্ত্র' শব্দ দুটির প্রসঙ্গে।

১৯৪৬-এর ৯ নভেম্বর সংবিধান রচনাকারী সভায় ভারতীয় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন জওহরলাল নেহেরু। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবে শ্রীনেহেরু বলেছিলেন, ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে ঘোষণা রাখা হবে ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ভারত রাষ্ট্র সার্বভৌম। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসমূহ ভারতের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্ধারণ ও পরিচালনা করবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের জনগণের মতানুসারে তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির শাসন পরিচালনা করবে। 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিটি প্রজার লিঙ্গ-জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। প্রত্যেকটি প্রজা রাষ্ট্রের কাছে পাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার।

ভারত যে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' এবিষয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানো পার্টিগুলোর কোনও সন্দেহই নেই। সন্দেহ প্রকাশ করে শুধু বেয়াদপ মানুষগুলো। এদেশে একজন ফুটপাতের ভিখারি আর রাষ্ট্রপতি—সবার সমান অধিকার।

তাই কি? এদেশের আইন অনুসারেই সেনাদের রাখা হয়েছে আইনের উর্ধ্বে। তারা ধর্ষণ করুক, গুণ্ডামী করুক, হত্যা করুক—কিচ্ছুটি করতে পারবে না এদেশের আইন-আদালত। এদেশের কোনও আদালতের ক্ষমতাই নেই অপরাধী সেনাদের বিচার করে শাস্তি দেওয়ার। এ দেশের সেনা-আদালন একজনও অপরাধীকে ধর্ষণ,

হত্যা বা লুটপাটের জন্য শাস্তি দিয়েছে—এমন কোনও দৃষ্টান্ত নেই। সেনা-আদালত আছে অপরাধী সেনাদের নিরপরাধ বলে ঘোষণা করার জন্যে।

এরপর রয়েছে লালু যাদব, পাপ্পু যাদবের মতো হেভিওয়েট রাজনীতিক, সঞ্জয় দত্ত, সলমন খানের মতো সিনেমার নায়করা, কাঞ্চির শংকরাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতীর মতো ধর্মগুরুরা। কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে জেলে ঢুকলেন লালু। লালুর জেলখানা রাতারাতি ফাইভ স্টার হোটেল হয়ে গেল। পাপ্পুর বিরুদ্ধে গাদা-গুচ্ছের খুনের অভিযোগ। জেলখানার মধ্যেই প্রতিদিন বসে পাপ্পুর আমদরবার। দরবারে শ'খানেক করে পাপ্পুর অপরাধ জগতের সঙ্গী-সাথী ও কৃপাপ্রার্থীরা ভিড় জমায়। ভিড় সামাল দেয় পাপ্পুর চাকরবাকর জেলারও জেলকর্মীরা।

আপনার-আমার মত আম-আদমির বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে একে ৪৭-এর মতো শক্তিশালী বেআইনি অস্ত্র ও মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীকে পেলে কী হতো? জীবনে আর সূর্যের আলো দেখতে হতো না।

সঞ্জয় দত্তের ফ্ল্যাট থেকে একে ৪৭ মিললো। সঞ্জয় মেগাস্টার ছিলেন, মেগাস্টার-ই রইলেন। তাঁর স্ট্রেচ করা একটা চুলও কেউ বাঁকা করতে পারলো না। স্টার ফুটবলার ষষ্ঠি দুলের বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালকে। আমাদের এই মহান দেশে মুড়ি-মিছড়ির এক দর হতে নেই। তাই ষষ্ঠি বহাল তবিয়তে ফুটবলে লাথি মেরে, আইনকে লাথি মেরে দিব্বি ভালোই আছেন। সলমান খান সুপারস্টার হিরো। হিরোইনদের নিয়ে মস্তির মেজাজে বিরল প্রজাতির কৃষ্ণসার হরিণ মারলেন। এই অপরাধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তার এবং অপরাধ প্রমাণ হলে সাত বছরের জেল হওয়ার কথা আইনের বইতে লেখা আছে। ওসব লেখা আছে আপনার আমার মতো আম-আদমিদের জন্যে। সলমান! আ-ই-বা-স? সলমান তারপর বিনা লাইসেন্সে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে চাপা দিয়ে মানুষ মারলেন। মানুষের মৃত্যু তো আর সলমানের মতো কিমতি নয়! তাই ওঁর এবারও কি-স-সু হলো না।

১২ ডিসেম্বর ২০০৫, আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে কলঙ্কের দিন। ১১ জন সাংসদ ঘুষ নিতে গিয়ে ক্যামেরা বন্দি হলেন। সংসদে প্রশ্ন তুলতে লাখ খানেক টাকা ঘুষ নিয়ে থাকেন প্রায় সব সাংসদ। এটাই দীর্ঘ বছরের চালু নিয়ম। 'আজতক' নিউজ চ্যানেল বিষয়টা ক্যামেরা বন্দি করে দু'দিন দেখানোয় সংসদে তুমুল তোলপাড় হলো। তদন্তকারী সংসদীয় কমিটি গড়া হলো। কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে ওই সাংসদদের বহিষ্কারের জন্য সুপারিশ করলেন। সব দলই জানেন তাঁদের সাংসাদদের দুর্নীতির হাল হাকিকত। তাই সুপারিশ কার্যকর করতে সাংসদরা টালবাহানা করছেন। তাঁরা চান না ওইসব মিটে উপনির্বাচন লড়তে।

এই সুপারিশ আসার আগেই 'স্টার-নিউজ' দেখাল ৫ সাংসদের দুর্নীতি। সাংসদ তহবিলে প্রতি সাংসদ প্রতি বছর উন্নতির জন্য ২ কোটি টাকা পেয়ে থাকেন।

খরচও করেন। স্টার দেখাল, সাহায্য হাতে হাতে করে দিচ্ছেন সাংসদরা বিনিময়ে নিচ্ছেন ৪০% থেকে ৫০% টাকা। সরকার পক্ষের ও বিরোধী পক্ষের নেতারা আলোচনা করে সহমত হলেন, সাংসদ তহবিল তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু বাদ সাধলো বিদ্রোহী সাংসদরা। এই বিদ্রোহী সাংসদদের সংখ্যা শতকরা ৯৯%। অনেক সাংসদই লোকসভায় মিডিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি কামান দাগলেন। এইসব মিডিয়া লুকোন ক্যামেরা নিয়ে ঘুষের প্রলোভন দেখিয়ে যে সব ছবি তুলেছে ও দেখাচ্ছে তাতে দেশের সম্মান মাটিতে মিশে গেছে। এইসব ফাঁদ পাতা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই বঙ্গের এক সাংসদ জানিয়েছেন, দুর্নীতি যখন সর্বগ্রাসী, দেশ যখন কালো টাকায় ডুবে, তখন কালো টাকার মালিকরা সাংসদদের দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নিতেই পারে। (যেন সাংসদরা বাচ্চা ছেলে, ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুষের লাড্ডু হাতে ধরিয়ে দিয়েছে দুষ্টু লোকেরা)। এই বঙ্গেরই আর এক প্রাক্তন সাংসদ একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে জানালেন, সাংসদদের এমন ঘুষ খাওয়া রোগটা বহু পুরোন। তাঁর সময়ও দেখতেন, অনেক সাংসদই প্রশ্ন তুলতে টাকা নিচ্ছেন। প্রশ্নগুলো অতি সাধারণ। যেমন বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতে কতগুলো শাখা খুলেছে ইত্যাদি।

কিন্তু এইসব ঘুষখোর সাংসদের কেন গ্রেপ্তার করা হলো না? কেন 'লোকপাল বিল' পাশ হওয়া নিয়ে সংসদে এত বছর ধরে টালবাহানা চলছে? আমাদের সচেতন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ-ই পারে সাংসদের ঘাড় ধরে আইনের আওতায় আনতে। আমরা চাই আর সময় নষ্ট না করে দ্রুততার সঙ্গে 'লোকপাল বিল' পাশ করা হোক।

একাধিক বিখ্যাত ও সৎ সাংবাদিক এমন কথাও বলেছেন, সাংসদদের ব্যাপক ঘুষ কাণ্ডকে চাপা দিতেই সব রাজনৈতিক দলই সৌরভ গাঙ্গুলিকে ক্রিকেট দল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে দেশব্যাপী হৈ-চৈ বাঁধিয়ে ছিল দেশবাসীর দৃষ্টি সরাতে। দেশের নীতি-নির্ধারক সর্বোচ্চ পদাধিকারী দেশের সাংসদরা। তাঁদের এমন আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা চেহারা বে-আব্রু হওয়ার পর বলতেই হয়, লড়ির গায়ে লিখে রাখা সেই কথাগুলো বড় বেশি সত্যি —

"মেরা দেশ মহান
শ'মে নিরানব্বই বেইমান।"

আমরাই পারি গ্রামগুলোকে স্বয়ম্ভর করে গড়ে তুলতে। স্বয়ম্ভর গ্রাম মানেই সবার সমান অধিকার, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দুর্ণীতির কবর। শুধু নজরদারির জন্য চাই সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

দ্বিতীয় পর্ব

ধ্যান-যোগ-সমাধি
মেডিটিশন

অধ্যায় : এক

যোগ নিয়ে যোগ বিয়োগ

এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সীমা উকি মেরে বললো, "আমি কিন্তু রেডি।"

ইতিমধ্যে আমরা দু'দফায় চা আর কফি খেয়েছি। বন্ধুটি কাছেই থাকেন। সায়েন্স কলেজে পড়ান। বেশ মুক্ত মনের মানুষ বলে জানি। ওঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালো-ই লাগে। কিন্তু এখন উঠতে-ই হবে। ডাক্তার আর এন মুখার্জির সঙ্গে অ্যাপয়েনমেন্ট করা আছে।

বললাম, "একটু উঠতে হবে। তোমার বউদিকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যাবো।"

—"ওঁর কী হয়েছে।"

—"বাতে কষ্ট পাচ্ছে। সঙ্গে ডায়াবেটিস। কত মোটা হয়ে গেছে দেখেছো? ৮২ কেজি।"

—"এর জন্য ডাক্তার দেখাবার কোনও দরকার নেই। তুমি 'আস্থা' চ্যানেল দেখো না? সকালে 'ইন্ডিয়া' চ্যানেল। আরে, আজকাল প্রচুর চ্যানেলেই দেখতে পাবে স্বামী রামদেবকে। লক্ষ লক্ষ লোক স্রেফ টিভি দেখে যোগ করে রোগ সারিয়ে ফেলছে। পৃথিবীতে যত রোগ আছে, সব-ই সারান যায় যোগে। এই তো আমার কাকার গ্লুকোমা হয়েছিল। 'শংকর নেত্রালয়' থেকে দেখিয়ে এলেন। ওঁরা বললেন, আর বছর দেড়েকের মধ্যে অন্ধ হয়ে যাবেন। কিছু করার নেই ওদের। স্বামী রামদেবের প্রোগ্রাম দেখতাম। খুব ভালো লাগতো। আমি-ই তারপর রামদেবের লেখা 'যোগ সাধনা এবং যোগ চিকিৎসা রহস্য' বইটা কিনলাম। পড়লাম। কাকাকে দিলাম। বিশ্বাস করবে না প্রবীর'দা, শুধুমাত্র দু'মাস হাতের আঙুলে 'প্রাণ' মুদ্রা করে চোখ একদম ঠিক। তুমি বইটা দেখে যদি সীমা বউদিকে দিয়ে আঙুলে 'বায়ু' মুদ্রা করাও। দু'মাসে বাত সারবে-ই। হাই সুগারে চোখের পাওয়ার নিশ্চয়ই বেড়েছে, এমনকী গ্লুকোমা হওয়াও আশ্চর্যের নয়। যে কোনও চোখের অসুখ সারাতে 'প্রাণ' মুদ্রার জবাব নেই।"

—"তা তোমার স্বামী রামদেব নিজের চোখের ব্যামোটা সারাচ্ছেন না কেন?"

—"বাঁ চোখটা ছোট, ডান চোখটা বড়? ওটা তো চোখের রোগ নয়। ওটা থাইরয়েডের জন্যে হয়েছে।"

বললাম, "কিন্তু তোমার বইতে-ই তো রয়েছে, 'শূন্য' মুদ্রা করলে থাইরয়েড সারবে। নিজের অসুখ সারাতে পারছে না। বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে শুধু বুক্‌নি ঝেড়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর যে কোনও রোগকে যোগে সারিয়ে দেবে। রামদেবকে আমাদের চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট্ করতে বলো না। আমরা তিনজন রোগী দেবো। তিনি হরিদ্বারে তাঁর দিব্য যোগ মন্দিরে রেখে যোগ করিয়ে এক বছরে সারিয়ে দিন, দেবো প্রণামী হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা। যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেবো। কোনও অজুহাত না দিয়ে নিজের খরচায় রোগীকে যোগ মন্দিরে রেখে সারাবার চ্যালেঞ্জ নেবেন? কখন-ই নেবেন না। যে নিজের চোখের রোগ সারাতে পারলো না, সে সারাবে সব রোগ? অল বোগাস। এমন কোনও যোগী নেই যে সব রোগ সারাতে পারে।

"হটযোগপ্রদীপিকা' হটযোগের আকরগ্রন্থ। তাতে বলা আছে যোগে জরা রোধ করা যায়। খেচরী মুদ্রায় অমরত্বলাভ করা যায়। গত একশো বছরের মধ্যে সবচেয়ে নামী যোগী ওশো রজনীশ-ও মারা গেলেন। খেচরী মুদ্রা জেনেও মারা গেলেন। জরাকেও আটকাতে পারেননি। তুলনায় রামদেব তো 'দো-দিনকা যোগী'। ওকে স্পনসর করতে এগিয়ে এসেছে বড় বড় কোম্পানী। গড়ে তুলেছে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ও ট্রাস্টি। রামদেবের স্পনসররা গত দু'বছরে রামদেবকে জনপ্রিয় করেছে। এখন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখা যায় রামদেবকে। বিশাল অংকের বিনিয়োগ করে টাইম স্লট নিয়ে রামদেব নিজের মুখ অনবরত দেখিয়ে দেখিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। নতুন কোনও প্রোডাক্ট লঞ্চ করার সময় প্রোডাক্টটার সঙ্গে সম্ভাব্য কাস্টমারদের পরিচয় ঘটাতে যেমন বার-বার এদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখান হয়।

প্রচারের যুগে তরমজের শাম্পু থেকে কুমড়োর বিউটি সোপ সব'ই হৈ-হৈ করে চলে বিজ্ঞাপনে হুলুস্থুল ফেলে দিতে পারলে। একই নিয়মে বিজ্ঞাপনে বাজার মাত করেছে নতুন প্রোডাক্ট 'রামদেবের যোগ'।

অধ্যায় : দুই

যোগ কী? যোগ নিয়ে গুলগপ্পো

'যোগ' ব্যাপারটা নিয়ে আমি ধন্ধে ছিলাম দীর্ঘকাল। যোগ কি আসলে যন্ত্রপাতি ছাড়া আসনের সাহায্যে কিছু ব্যায়াম পদ্ধতি? শরীরকে সুস্থ রাখার কিছু আসন ও মুদ্রার পদ্ধতি মাত্র? নাকি এর বাড়তি কিছু? পতাঞ্জলির যোগের বইতে বা হঠযোগের বইতে যা লেখা আছে—সব-ই সত্য? যোগী হলে কি জলের উপর দিয়ে সত্যিই হেঁটে যাওয়া যায়? আকাশে ওড়া যায়? কয়েক'শো বছর নীরোগ অবস্থায় বেঁচে থাকা যায়? যৌবনকে ধরে রাখা যায় আমরণ? অমর থাকা যায়?

"হ্যাঁ, যায়।" কথাটা জোরের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন 'সিদ্ধ-যোগী' বালক ব্রহ্মচারী। আরও বলেছিলেন, "তোরা যে'সব ঘটনাকে অলৌকিক বলে মনে করিস, সে'সবই করতে পারেন একজন সিদ্ধ-যোগী। জলে হাঁটা কীরে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবন ঘুরে আসতে পারেন তাঁরা।"

"এখনকার যোগ-ব্যায়াম আর ঋষিদের নির্দেশিত 'যোগ' কি একই ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করেছিলাম যোগ-ব্যায়ামের জাতীয় বিচারক ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় সোজা-সাপটা জানালেন, "এ যুগের যোগ আর ঋষিদের আমলের যোগ একই ব্যাপার। যোগ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ সাধন করা যায়। এখন সবারই সময়ের অভাব। তাই শরীরকে সুস্থ রাখার মত কয়েকটা সোজা যোগ আমরা শেখাই। আমার 'যোগ-বিজ্ঞান ও রোগ-মুক্তি' বইতে লিখেছি, পতঞ্জলির আমলের যোগ হল এ'যুগের যোগেরই একটা বিস্তৃত রূপ। যোগ মৃত্যু ও জরাকে জয় করতে পারে। এই যে আমার কোনও অসুখ হয় না, তার কারণ যোগ।"

ডাঃ শান্তিরঞ্জন একবার খুবই অসুস্থ হলেন। ডাক্তার-হাসপাতাল করলেন। শান্তির কথাগুলো আমার কাছে জোলো হয়ে গেল। 'কথার কথা' হয়ে গেল।

কমল ভাণ্ডারী এক সময়ের ভারতের সেরা 'বডি বিল্ডার' ছিলেন। যোগে আকৃষ্ট হলেন। 'যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক হলেন। তাঁর কথায়, "সব শাস্ত্রের সার যোগ শাস্ত্র।"

যোগ নিয়ে কথা বলেছিলাম চিত্ত গড়াই-এর সঙ্গে। তিনি তখন যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নির্বাচিত জাতীয় বিচারক। কথা বলেছি যোগ সাধক ও বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ সৌমেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। দেখলাম

যোগের কয়েকটা বিষয়ে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়, কমল ভাণ্ডারী, চিত্ত গড়াই ও ডাঃ দাস একমত। ওঁরা মনে করেন (১) ভারতীয় মুনি-ঋষিরাই যোগের আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়মের প্রবর্তক। (২) মহাদেব, পশুপতিনাথ বা শিব-ই যোগের আদি দেবতা ও স্রষ্টা। (৩) প্রাচীন মুনি-ঋষিরা মানুষের শরীর বিজ্ঞানের খুঁটি-নাটি সব কিছু জানতেন। বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র, শিরা-উপশিরার কার্যকারিতা জানতেন। (৪) যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র দুই-ই বুঝেছিল, মস্তিষ্ক থেকে সুষুম্মার মধ্যে (মেরুদণ্ডের মধ্যে) অবস্থিত স্নায়ুতন্ত্রের সব কেন্দ্র ও মর্মস্থানে একটি শক্তিনাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে আত্মা থাকে। (৫) মানুষের দেহের ভিতর ছটি চক্র থাকে, যাকে বলে 'ষটচক্র'। এই ছটি চক্র ভেদ করে চিত্তকে মস্তিষ্কে নিয়ে যেতে পারলে মহাশক্তি অর্জন করা যায়, যোগ সিদ্ধ হওয়া যায়।

এইসব শুনে বেশ শঙ্কিত হয়েছিলাম। এই চার বিশিষ্ট যোগবিদ্‌দের দু'জন ডাক্তার। তারপরও তাঁরা বুঝতে চাইছেন না—

যোগ দর্শনটাই দাঁড়িয়ে আছে ভুল 'অ্যানাটমি' জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। এই ভুল শারীর বিদ্যে দিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করলে তার পরিণতি কী হবে ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলাম।

'অবমানব' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিজড়েদের নানা অধিকার নিয়ে কথা-টথা বলেন। একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। একদিন আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির বেলেঘাটার অফিসে এলেন এক 'অবমানব'কে নিয়ে। সেখানে তখন এক ঘর লোকের কথায় কথায় জানালেন, হিজড়েদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ-ই পুরুষ। কিন্তু কেউ পরীক্ষা করতে গেলে ধরতে পারবে না। আমরা একটা গুহ্য যোগাসনের সাহায্যে লিঙ্গকে শরীরের ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে পারি।

হটযোগে এমন একটা আসনের কথা পড়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। হটযোগের ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ পেয়ে বললাম, "করে দেখাও।" দেখাতে পারেননি সোমনাথ।

আসলে যোগের নানা ফল লাভের যে' সব কথা প্রাচীন মুনি-ঋষি অর্থাৎ জাদু-পুরোহিতরা বলে গিয়েছিলেন, তা ঠিক নয়। কিছু কিছু আসন শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকর হতেই পারে। কিন্তু আসন করে অদৃশ্য হওয়া যায়, জরা ও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, এমন আজগুবিতে বিশ্বাস করার মত কিছু বাল্যখিল্য মানুষ এখনও আছেন, দুঃখ ও শঙ্কার কথা এটাই।

"ধুর...ধুর.... এসব কথা ডাহা মিথ্যে। যোগাসনে, বা যোগব্যায়ামে শরীর

সুস্থ-সবল থাকে। শরীর ভালো থাকলে এবং অন্য কোনও সমস্যা না থাকলে মন-ও ভালো থাকে। যে কোনও অসুখ যোগে সারিয়ে দেবো—এমনটা কেউ দাবি করলে বা বললে সে লোকেদের প্রতারিত করছে। হার্ট-প্রবলেম বা চোখের প্রবলেম নিয়ে কেউ যদি আমার কাছে আসেন, তো বলবো, ডাক্তার দেখান। যোগে ও'সব কিছু সারে না।" একথা বলেছিলেন ভারত ও জাপানের কিংবদন্তী যোগ-গুরু বিশ্বনাথ ঘোষ। শুধু জাপানেই তাঁর পরিবার পরিচালিত যোগ-শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ৪২ টি। টোকিওতে-ই ৪টি। ভারতে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের শাখা-প্রশাখা ১৬টি। এ'সব কথা তিনি আমাকে বলেছেন ২০০৬-এর জানুয়ারিতে। আরও শুনলাম কোনও এক যোগী বলেছেন, নখে নখ ঘষলে চুল গজায়? সত্যি-ই বলেছেন? অল ভোগাস।"

বিশ্বনাথ ঘোষের বাবা বিষ্ণু ঘোষ ছিলেন ব্যায়াম ও যোগের এক কিংবদন্তী শিক্ষক। তাঁর বহু ছাত্র মিস্টার ইন্ডিয়া, মিস্টার এশিয়া, এমনকী মিস্টার ইউনিভার্স (মনোতোষ রায়) পর্যন্ত হয়েছেন। ১৯৬৮ সালে বিষ্ণু ঘোষ জাপানে যোগ শিক্ষাকেন্দ্র খুলে প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছিলেন। ১৯৬৬-তে যোগ বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন। "প্রাচীনকালে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে যখন ব্যায়ামচর্চা শুরু হয়নি, তখন শুধুমাত্র শরীরকে সুস্থ-সবল রাখতে যোগচর্চার শুরু। যোগচর্চা নিয়ে অনেক অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রাচীন যোগীদের ছিল। আসলে তখন অ্যানাটামি বিষয়ে প্রায় সব-ই ছিল অজানা। ফলে ভুল ছিল। ভুলকে ঠিক করতে করতে আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি। যোগ নিয়ে যে সব অলৌকিক ক্ষমতার কথা বইতে থাকে, সে সবই মিথ্যে।"

পাশ্চাত্যের স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করেন, শরীরকে সবল ও স্বাস্থ্যবান করে তুলতে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যায়ামের কোনও তুলনা নেই। এতে শরীরে অনেক বেশী শ্রম হয়, এবং যোগাসনে যা আদৌ হয় না। ফলে স্বাস্থ্যের জন্য যোগের চেয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট-ব্যায়াম অনেক বেশি কার্যকর।

যোগ ও তন্ত্র

আমাকে পাকিয়েছিলেন স্কুলের ভৌমিক স্যার। ফর্সা গোলগাল রসগোল্লা-মার্কা চেহারা। একেবারে রসে টইটম্বুর। তিনিই শুনিয়েছিলেন রামী-চণ্ডীদাসের গল্প। বুঝিয়েছিলেন, চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনীর মধ্যে কোনও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ছিল বিশুদ্ধ কামের সম্পর্ক। চণ্ডীদাস শৈব মতে রামীকে বিয়ে করেছিলেন।

অনেক যোগী-তান্ত্রিক রমণের জন্য রমণী রাখতেন। তাকেই শোভন আকার দিতে বলা হত 'শৈব-বিবাহ'। একসময় অনেক বাঙালি জমিদার ও বাবুরা যোগ ও তন্ত্র নিয়ে মেতেছিলেন। তাঁদের সাধনার ভৈরবী ছিল নিচুজাতের মেয়েরা।
এইসব সাধন-সঙ্গিনীদের যোগাড় করে দিত এক শ্রেণির দূত বা দূতি। যোগ ও

তন্ত্র মতে এমন পবিত্র কাজে সাহায্য করার জন্য পুণ্য লাভের কথা বলা হয়েছে। এইসব সাধন সঙ্গিনী নারীদের যোগাড় করা হত সাধারণভাবে ধোপা, গোয়ালা, নাপিত, চণ্ডাল, বেশ্যা—এইসব সম্প্রদায় থেকে।

সাংখ্য যোগ থেকে তন্ত্র, যেখানেই গভীরে ঢুকবেন, দেখবেন ওদের মূল কথা এক-ই—মানুষের দেহ-ই বিশ্বপ্রকৃতির সব রহস্যের আধার। সৃষ্টির মূলে রয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন। প্রকৃতিই হল নারী-শক্তি। নারী-পুরুষের মিলন-ই সাধনা। মিলনের চরম আনন্দ-ই পরম-ব্রহ্ম। মিলনেই সৃষ্টি। যোগ ও তন্ত্রে কামজ আরাধনা ছাড়া সিদ্ধির কোনও উপায় নেই।

দেহের আত্মাই ঈশ্বর। নিজের আত্মাকে সুখী করাই ঈশ্বরকে সুখী করা। মিলনে যে সুখ, তার তুল্য সুখ আর কিছুতে নেই।

যোগ আর তন্ত্র হল 'গুহ্য তত্ত্ব'। মানে, গোপন তত্ত্ব। এ'সব নিয়ে আলোচনা গোপনে করতে হয়। এর সাধনাও গোপনে করতে হয়। এ'নির্দেশ যোগ ও তন্ত্রের।

আমার কলেজে-সহপাঠী ছিল বিমল। পদবি—মনে নেই। একদিন আমাকে ও আর এক সহপাঠী তপনকে শোনালো পরিবারের এক গভীর সমস্যার কথা। পরিবার বলতে—বিমল, মা-বাবা আর এক বোন। বোন ক্লাশ টেনের ছাত্রী। বাবা তান্ত্রিক। সমস্যাটা বাবা আর বোনকে নিয়ে। বাবা ভৈরবতন্ত্র মতে বোনকে ভৈরবী করে সাধনা করেন।

তপন অবাক? বাবা-মেয়েতে তন্ত্র-সাধনা করে, এতে সমস্যা কোথায়?

ভৌমিক স্যারের কল্যাণে আমি আগেই পেকেছি। তাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গা গুলিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে তপন সমস্যার কদর্যতা ও গভীরতা বুঝতে পেরেছে। শুনলাম, বিমল আর ওর মা বাধা দেওয়ার সমস্ত রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ। শেষ ভরসা হিসেবে লজ্জার মাথা খেয়ে পড়শিদের সাহায্য চেয়েছেন। তারপরও পড়শিরা কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। কেচ্ছা শুনতে ওঁদের যতটা উৎসাহ দেখা গেছে, সাহায্য চাইতেই ততটাই কুঁচকে গেছেন। বিমলের কথায়—আসলে বাবার তন্ত্রক্ষমতার ভয়ে ওঁরা কেউ বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেন না। ওঁরা বাবাকে ঘৃণা করেন, আবার ভয়ও করেন।

তন্ত্রের নামে অজাচার চলছে প্রায় প্রকাশ্যে।

* * * * * * * * *

বীরভূম আমাকে টানে। এই টানের অনেকটাই বাউল গান আর বাউলদের জীবনচর্যার কারণে। বীরভূমের মাটির গন্ধ যে সাহিত্যিকের কলমে পেয়েছি, তিনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর জামাতা ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ও আমি গল্প করছিলাম তারাশংকরের পাকপাড়ার বাড়িতে। কথায় কথায় এক সময় এলো আউল-বাউল ও সহজিয়াদের প্রসঙ্গ। তারাশঙ্করবাবুর কাছেই সেদিন প্রথম জানলাম, আউল-বাউল ও সহজিয়া-বৈষ্ণবরা দেহতত্ত্ববাদী। তারা মনে করে—যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে। পরম ব্রহ্মকে, পরম সত্যকে জানার জন্য ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান তাদের কাছে মূল্যহীন। দেহকে জানা, সৃষ্টি তত্ত্বকে জানার জন্যে নারী-পুরুষের মিলন হল স্বাভাবিক উপায়। মিলন থেকেই সৃষ্টি। মিলনেই আনন্দ। মিলনেই পূর্ণ জ্ঞান। আউল-বাউল-সহজিয়াদের উৎপত্তি সহজযানী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। সহজযানী বৌদ্ধরা বজ্রযান বৌদ্ধদের নিয়ম-কানুন-আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে দেহকেই সব সাধনার উৎস, লক্ষ ও মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিল।

বঙ্গদেশে পাল রাজাদের আমলে সহজযান বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল রাজাদের আমলেই অতীশ দীপঙ্কর 'বজ্রযান সাধন' গ্রন্থ লিখেছিলেন। তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকাকার প্রজ্ঞাবর্মনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাল রাজারা। রাজা ধর্মপাল পঞ্চাশটা বৌদ্ধ মঠ তৈরি করে দিয়েছিলেন। রাজা দেবপালও কিছু বৌদ্ধবিহার তৈরি করেছিলেন। পাল রাজারাই বৌদ্ধ ধর্মের একটা সহজ-সরল চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুদের মূর্তি পুজোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মূর্তি পুজোর প্রচলন করেছিলেন। সহজযান ও দেহতত্ত্ববাদ বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে পাল রাজাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেহতত্ত্ববাদীরা শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিক।

আউল-বাউল-সহজিয়া-বৈষ্ণবদের দেখলে আমার কিশোর মনেও কোনও ভয় বা বীভৎস রসের উদয় হত না। বরং বাউলরা সে'দিন থেকে আজও আমার মন টানে সমান ভাবে। আমার মনের মতো অনেক মানুষই আজও বাউল গানের টানে, বাউল মনের টানে কেন্দুলি মেলায় ভিড় জমান।

পরে জেনেছি, রামকৃষ্ণও তন্ত্র-সাধক ছিলেন। তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমেই তাঁর 'সিদ্ধি' লাভ বা 'ব্রহ্ম' লাভ। তন্ত্র-সাধকের ভৈরবী চাই। তন্ত্র-সাধিকার চাই তান্ত্রিক। তন্ত্রে দীক্ষাগুরুর কোনও জাত-বিচার নেই, নারী-পুরুষ ভেদ নেই। রামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরুও যোগ সঙ্গী ভৈরবী ছিলেন যোগেশ্বরী।

এ'সবই লেখা আছে রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' থেকে প্রকাশিত স্বামী প্রজ্ঞানন্দর লেখা 'তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা' বইটিতে।

যোগ ও তন্ত্রের একই অঙ্গে এত রূপ! যতই জেনেছি ও দেখেছি ততই অবাক হয়েছি। হরপ্পা যুগ, বৈদিক যুগ ঘুরে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তন্ত্রের নানা রূপ ছিল ও বহাল তবিয়তে আছে। এখনও যোগ ও তন্ত্রের বই-পত্তর প্রচুর বিক্রি হয়। যাঁরা কেনন, তাঁদের প্রায় সকলেই ওসব বইয়ের ধোঁয়াশায় ভরা কথা পড়তে পড়তে, হোঁচোট খেতে খেতে বুকসেল্ফে সাজিয়ে রেখে বাঁচেন। যাদের কিছু করে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাঁরা তান্ত্রিক-জ্যোতিষী সেজে বসেন। বিজ্ঞাপন দেন। মাস গেলে চার লাখ থেকে চল্লিশ লাখ যা খুশি রোজগার করেন লাইন দেওয়া 'শিক্ষিতদের' পকেট কেটে।

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার-ই ইতিহাস। সাময়িকভাবে বার বার পিছু হাঁটার কুচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিয়ে সমাজ শেষ পর্যন্ত এগিয়েই চলেছে—এটাই ইতিহাস। যোগ ও তন্ত্রের অর্বাচিন ও বিকৃত ধারণা একদিন মানুষ বর্জন করবেই। এটাই মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের পরিণতি।

অধ্যায় : তিন

যোগ

যোগের সংজ্ঞা

'যোগ কাকে বলে? এই নিয়ে হিন্দু উপাসনা ধর্মে নানা মুণির নানা মত। অর্থাৎ 'যোগ' নিয়ে সর্বযোগী-গ্রাহ্য কোনও মত হিন্দু ধর্মে নেই।

পতঞ্জলির মতে, 'যোগ' কথার অর্থ বৃত্তিনিরোধ। সহজাত প্রবৃত্তির নিরোধ। মহর্ষি ব্যাস—এর কথায়, 'যোগ' শব্দের অর্থ সমাধি, ধ্যান। কর্মময় জীবন থেকে কর্মশূন্য হতে পারা, হলো ধ্যান। সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারাটাই হচ্ছে ধ্যান, অর্থাৎ যোগ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সফলতা-বিফলতা, দুঃখ-আনন্দ, অনুকূল-প্রতিকূল, জয়-পরাজয় ইত্যাদি প্রতিটি পরিস্থিতিতেই চিত্তকে শান্ত রাখাই যোগ। কুলকুন্ডলিনী-তে বিশ্বাসীরা মনে করেন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করে আত্মার সঙ্গে পরামাত্মার মিলন-ই যোগ। এই তত্ত্বে তান্ত্রিকরা বিশ্বাসী। জৈন মতে মোক্ষ বা সিদ্ধি-ই যোগ।

এই পাঁচটি সংজ্ঞার কোন্‌টি ঠিক, আর কোন্ চারটি বে-ঠিক, কে পথ দেখাবেন? বিভ্রান্ত যোগীরা? ঝোলে-ঝালে-অম্বলে থাকা যোগীরা?

কোন্ যুক্তিতে একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করা হবে এবং বাকি চারটিকে কোন্ যুক্তিতে বাতিল করা হবে?

যোগের নানা বিভাজন

যোগ দর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পতঞ্জলি নামের এক জাদু পুরোহিত। তিনি ১৯৪টি সূত্রে যোগধারাকে সংগ্রহ করে তুলে ধরেছিলেন। পতঞ্জলি তাঁর রচনার বহু পরিভাষিক শব্দার্থ বৌদ্ধতন্ত্র থেকে নিয়েছিলেন। যোগ দর্শনের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যোগ দর্শনকে 'সাংখ্য-পরিশিষ্ট' বলা হয়। যোগ দর্শনের স্রষ্টা ও টীকাকাররা মনে করেন, যোগ দর্শনই সাংখ্য দর্শনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবাল্ক্য যোগের আটটি অঙ্গের কথা বলেছেন, যা 'যোগাঙ্গ' নামে খ্যাত। এগুলো হল (১) 'যম' অর্থাৎ কতকগুলো নিষেধ, (২) 'নিয়ম' অর্থাৎ পালনীয় বিধান, (৩) 'আসন' অর্থাৎ কিছু দৈহিক ব্যায়াম পদ্ধতি, (৪) 'প্রাণায়াম' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, (৫) 'প্রত্যাহার' বিষয় চিন্তা থেকে ইন্দ্রিয়কে তুলে নেওয়া, (৬) 'ধারণা' অর্থে একাগ্রতা, (৭) 'ধ্যান' বা কোনও একটি বিষয়ে চিন্তাকে গভীরভাবে স্থাপন করা, (৮) 'সমাধি' বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যান।

যোগ বিশ্বাস করে, যোগাঙ্গের আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। আর অষ্টাঙ্গ সিদ্ধ হলে তো কথাই নেই।

যোগ সিদ্ধ হলে কী কী হয় বলার চেয়ে বলা ভালো, কী না হয়?

'খেচরী মুদ্রা' একটি যোগাসন পদ্ধতি। বলা হয়েছে খেচরী সাধনের দ্বারা ব্যাধি, জরা, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণাকে জয় করা যায়। মৃত্যুকে জয় করে অমর হওয়া যায়। 'যায়' তো দৃষ্টান্ত কোথায়? না, কোথাও নেই।

'খেচরী মুদ্রা' শেখানো হয়েছে যোগের আকর গ্রন্থগুলোতে। জিভকে ভিতর দিক দিয়ে ঠেলে দুই ভ্রু'র ভিতরে দিকে দু'দণ্ড রাখতে পারলেই সিদ্ধি লাভ। না, সঙ্গে কোনও মন্ত্র মনে মনেও আওড়াতে হবে না।

মহামুদ্রা সাধনে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের বিনাশ হয়। শীতল কুম্ভক আসন করলে প্লীহা ও উদররোগ, জ্বর, পিত্তবিকার বিনাশ হয়। এই আসনের বাড়তি গুণ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে না। বিষাক্ত সাপ শরীরে বিষ ঢাললেও তা কাজ করে না। কোনও যোগী রাজি হবেন নাকি এমন একটা পরীক্ষা দিতে? বাবা রামদেব কী বলেন? আসলে এইসব যোগীরা যা বলেন, তাতে নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। তাই পরীক্ষা দেবার মত একজন যোগীও এগিয়ে আসবেন না, জানি। শীতল কুম্ভক অবশ্য খুবই সোজা আসন। জিভকে দু'ঠোঁটের মাঝে রেখে ঠোঁট ও জিভ পাখির ঠোঁটের মত করতে হবে। এবার জিভের ফাঁক দিয়ে বায়ু টানতে হবে। বায়ু ছাড়তে হবে নাক দিয়ে ধীরে ধীরে।

কামদেব তুল্য রূপলাবণ্য লাভের উপায়ও আছে যোগের আকরগ্রন্থে। আসনটার নাম 'সীৎকারী কুম্ভক'। সব কিছুই শীতল কুম্ভকের মতো। শুধু বায়ু টানার সময় 'সীৎ' ধরনের শব্দ করতে হবে। সীৎকারী কুম্ভকের বাড়তি গুণ—আলস্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে না। ভারতের কিছু যোগী যে ভাবে যোগ শেখাতে উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে ভারতের খাদ্য ও পানীয় সমস্যা মিটলো বলে।

অষ্টাঙ্গ সিদ্ধ হলে ত্রিলোক ভ্রমণ করা যায়। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, বাবা রামদেব যে ভাবে অষ্টাঙ্গ যোগ গাদা-গুচ্ছের টিভি চ্যানেলে শেখাচ্ছেন, তাতে প্লেন কোম্পানীগুলো লালবাতি জ্বাললো বলে।

মহাদেবের নির্দেশিত দশটি মুদ্রা আয়ত্ত করলে পারলে ইচ্ছে মতো শরীরকে পরমাণুর মতো সূক্ষ্ম আকারে নিয়ে যাওয়া যায়। আকাশে ভ্রমণ করা যায়। ইচ্ছে

মতো যে কোনও ক্ষমতা লাভ করা যায়। উ...ফ্.... ভাবা যায় না!

শিব বা আদিনাথ অর্থাৎ মহাদেব চুরাশি রকমের আসনের কথা বলেছেন। তার মধ্যে চারটি আসন 'সারস্বরূপ' অর্থাৎ প্রধান। আসনগুলো হল—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন ও ভদ্রাসন।

মুদ্রার মধ্যে খেচরী ও শব্দ উৎপাদনের মধ্যে 'নাদ' বা নাভী থেকে তুলে আনা শব্দকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

নাসনং সিদ্ধসদৃশ্যং কুম্ভ কেবলোপমঃ।
না খেচরীসমা মুদ্রা না নাদসদৃশো তনয়ঃ॥ ৪০

নাদধ্বনি নিয়ে একটি প্রচলিত ধারণা শিকড় গেড়ে রয়েছে বিশেষ করে নায়ক, অভিনেতা ও হিন্দু উপাসনা-ধর্মের 'পণ্ডিত'দের মধ্যে। নাদধ্বনি অর্থাৎ নাভি থেকে ধ্বনিকে তুলে আনতে পারলে তা গভীর ও লা-জবাব হয়। 'ওঁ' ধ্বনিকে নাভি থেকে তুলে এনে উচ্চারণ করলে ব্রহ্ম লাভ হয়। শব্দ থেকে ব্রহ্ম লাভ হয় বলেই 'শব্দ পরম ব্রহ্ম' বলা হয়।

নাদধ্বনি নিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা চালু রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে গোড়ার গলদ। আসলে নাভি বা পেটে যে বায়ু থাকে, তাকে কখনই স্বর-নালিতে আনা যায় না। পেটের বায়ু পায়ু দিয়েই বের হতে পারে, যাকে আমরা বলি 'পাদ'। আর বের হতে পারে উদ্গার হয়ে।

এটাই শরীর বিজ্ঞানের কথা। আমরা কথা বলার সময় স্বরযন্ত্র দিয়ে যে বায়ু বের হয়, তা আসে ফুসফুস থেকে। উদ্গার উঠে আসে কণ্ঠনালি দিয়ে। স্বরনালি ও কণ্ঠনালি এক নয়। নাদধ্বনির মিথ্যে কতদিন যে সত্যিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের মাথায় চেপে থাকবে কে জানে? আমরা কবে যে 'সবজান্তা'র ভণ্ডামী ছেড়ে সত্যি জানতে আগ্রহী হবো, কে জানে?

শুক্র বা বীর্য সম্পর্কে যোগ

"চিত্তায়ত্তং নৃণাঃ শুক্র শুক্রায়ত্তং চ জীবিতম্।
তস্মাচ্ছুক্রং মনশ্চৈব রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ॥"

অর্থাৎ, "মানুষের জীবন শুক্রের অধীন। শুক্র ক্ষয় হলেই জীবন ক্ষয়। অতএব সাধক যত্ন সহকারে শুক্র রক্ষা করবে।" শুক্র সম্পর্কে এমন যোগ-শিক্ষা বিজ্ঞান বিরোধী এবং অবশ্যই অশিক্ষা।

এইসব ভুল শিক্ষা থেকে বহু পুরুষ বিয়ের পর মিলনের সময় অনুভব করে সে পুরুষত্বহীন। দুটি জীবন অশান্তিময় হয়ে ওঠে প্রথম রাত থেকে-ই। আসলে স্বামীজীদের ব্রহ্মচর্য পালন নিয়ে বই-পত্তর পরে জেনেছে—বীর্যক্ষয়ে শরীর-স্বাস্থ্য-শক্তি-স্মৃতি নষ্ট হয়। বীর্য সঞ্চয় ও ব্রহ্মচর্য পালনই মনুষ্য জীবনের আদর্শ ও লক্ষ হওয়া উচিত।

এইসব হিজিবিজি বিজ্ঞান-বিরোধী বইপত্তর পড়ার ফলে-ই অবচেতন মন নববিবাহিত ছেলেটির বীর্যপাতের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সাময়িকভাবে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি স্ফুরিত হতে দেয়নি যোগের কুশিক্ষা।

যোগ ও কুলকুণ্ডলিনী

'যোগ' হল তন্ত্র সাধনার এক রহস্যময় পথ। যোগী পতঞ্জলি যোগের প্রণেতা। ঋষি বেদব্যাস এই যোগের ভাষ্যকার। এইসব যোগীরা অনাদিনাথ বা শিবকেই যোগ বিদ্যায় উপদেশ দানকারী বলে উল্লেখ করেছেন। শিবই চুরাশি রকমের আসনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান যোগসাধনের গুণগান গেয়েছেন। গীতায় যোগ মাহাত্ম আছে। অতএব, হিন্দু-'উপাসনা' ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে প্রশ্নাতীত পরম সত্য হল 'যোগ'।

মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগের উপায়ের নাম যোগ। এইজন্য কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার কথা বলা হয়েছে যোগে।

যোগ মতে 'কুণ্ডলিনী' শক্তিকে জাগ্রত করতে যোগীকে 'ষটচক্র' ভেদ করতে হয়। যোগ বা তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বাস করে, প্রতিটি মানব দেহে ছটি চক্র আছে। চক্র ছটির অবস্থান গুহ্যে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে। ছ'টি চক্রের নাম গুহ্যে মূলাধারচক্র থেকে পর্যায়ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও জ্ঞানচক্র। মস্তিষ্কে আছে সহস্রদল পদ্ম। যোগের বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মূলাধারচক্র কে একের পর এক ছটি চক্র ভেদ করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মস্তিষ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাথার খুলির নীচে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম কুঁড়ি। কুঁড়ির ওপর ফণা মেলে থাকে সাপ। যার লেজ রয়েছে গুহ্যে। যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে, বা বলতে পারি তন্ত্র প্রক্রিয়ার সাহায্যে ফণাটি সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেই মস্তিষ্কে হাজারটা রঙিন পাপড়ি মেলে ফুটে উঠবে পদ্ম। এই যে সাপ বা মহাশঙ্খিনীশক্তি, ইনিই মহামায়া, মহাশক্তি। পদ্মের কর্ণিকা বা বীজকোষে রয়েছেন ব্রহ্মস্বরূপ শিব।

ষট্‌চক্র ভেদ করে সাপের ফণা সরিয়ে মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই নাকি ঘটবে ব্রহ্মদর্শন, মিলবে চির আনন্দ, মিলবে মোক্ষ।

প্রাক্-আর্য বা প্রাক্-বৈদিক যুগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছিল, তা বোঝা যায়।

বৈদিক যুগে প্রথম দিকে যোগের প্রতি বিরূপতা থাকলেও পরবর্তীকালে যোগসাধনা বা যোগদর্শন বৈদিক শাস্ত্রে গৃহীত হয়। পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' ষড়দর্শনের অন্যতম দর্শন হিসেবে গণ্য হয়। পতঞ্জলি তাঁর সূত্রে যোগ শক্তির

মহিমা কীর্তন করেছেন। পতঞ্জলির মতে, যোগ সিদ্ধিতে বা যোগ বিভূতিতে নাকি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ভাষা-জ্ঞান লাভ হয়, নিজেকে অদৃশ্য করা যায়, খিদে ও তৃষ্ণা নিবারণ করা, আকাশে ভ্রমণ করা যায়, অন্যের দেহে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, ইষ্ট-দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। পতঞ্জলির যোগে বৌদ্ধতন্ত্রের যে প্রভাব দেখা যায়, সে কথা আগেই বলেছি। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রই হোক, হিন্দু যোগশাস্ত্রই হোক অথবা বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রই হোক—এরা প্রত্যেকেই যোগ সাধনায় মানবদেহের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

'যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'

হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র, বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র ও যোগশস্ত্র মনে করতো যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। এবং তাই নিয়েই এই দেহভাণ্ড। দেহরহস্যের মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড রহস্যের মূল সূত্র। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেলো পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনকে। পুরুষ ও নারীর মিলনের মধ্যে ওঁরা পেলেন সৃষ্টি রহস্যের মূল সূত্র। ফলে 'দেহ' ও 'মৈথুন' তন্ত্র-শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেলো।

একটা সময় মানুষের কাছে মানুষের দেহ ছিল এক পরম-বিস্ময়। এক অজানা বিস্ময়। শুরুতে বৈদিক যুগের মানুষ শব দেহকে অপবিত্র, অস্পৃশ্য মনে করতো। শব কবর দিত। পরবর্তী কালে শব দাহ করার পর বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। শবদেহের সংস্পর্শে আসা মানব শরীরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করার নানা পদ্ধতি,

প্রকরণ, সংস্কার ছিল। এখনও যার তলানি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে বহমান। সে সময় শবদেহ দাহ করত অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষ। শব ব্যবচ্ছেদ করে মানব শরীরের গঠনতন্ত্র বা anatomy জানার কথা মানুষ কল্পনাতেই আনতে পারত না। মানবদেহের 'অ্যানাটমি' বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঋষি ও যোগীরা। তাঁরা নাকি যোগবলে মানব শরীরের ভিতরে ঢুকে 'অ্যানাটমি' দেখে এসে, শরীরে ছটি চক্রের অবস্থান ও সেই চক্রগুলির মধ্যে নানা দেব-দেবীদের অবস্থান, মাথার খুলির নীচে হাজার পাপড়ির পদ্মফুল এবং একটা সাপের অবস্থান বর্ণনা করেছিলেন। কেউ এই 'অ্যানাটমি' বর্ণনার মধ্যে রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা করলে তাকে আমরা অবশ্যই যোগের অ-আ-ক-খ না জানা মূর্খ বলে চিহ্নিত করে করুণা প্রদর্শন করতে পারি মাত্র। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রের যে কোনও বই গভীরভাবে পড়লেই দেখা যাবে মানব শরীরে অ্যানাটমি বলে তাঁরা যা বলে গেছেন সেগুলো সত্যি বলেই বিশ্বাস করতেন এর মধ্যে রূপক সৃষ্টির কোনও চেষ্টা আদৌ ছিল না। তাঁদের এই বিশ্বাস এসেছিল অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা অজ্ঞতা থেকে। তাঁরা হয়তো বা কোনওভাবে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা ঘিলু দেখেছিলুম এবং ঘিলু দেখে হাজার পাপড়ির পদ্মের 'অস্তিত্ব' খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো মৃত মানুষের অন্ত্র নিয়ে কুকুর বা শিয়ালের টানাটানি দেখেছিলেন। অন্ত্রের সঙ্গে সাপের চেহারাগত মিল থাকায় মানব দেহে সাপের অবস্থান আছে—এমনটাই বিশ্বাস করেছিলেন।

'যোগ' দর্শনটাই দাঁড়িয়ে আছে মানবদেহের সম্পূর্ণ ভুল গঠনতন্ত্র বা 'অ্যানাটামি' জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। নারী-পুরুষের দীর্ঘ দেহ মিলনের মধ্য দিয়ে মোক্ষ বা সাধনসিদ্ধি ঘটার কল্পনা মানুষকে চূড়ান্ত যৌনভোগের নেশা ধরাতে পারে, কিন্তু কোনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে না।

যোগদর্শনে নারী পুরুষের দীর্ঘ মিলনের নানা উদ্ভট তত্ত্ব দেওয়া আছে। বলা আছে—

"পুংসো বিন্দুং সমাকুঞ্চ্য সম্যগভ্যাসপাটবৎ।
যদি নারী রজো রক্ষেদ্ বজ্রোল্যা সাপি যোগিনী॥'

('নারীনাং, রজাসাধনফলম্', হটযোগ)

অর্থাৎ কোনও নারী যদি ঠিকঠাক পটুতার সঙ্গে বজ্রোলীর (বিশেষ একটি মুদ্রা বা আসন) সাহায্যে পুরুষের বিন্দুকে (বীর্যকে) টেনে নিয়ে নিজের রজঃ রক্ষা করতে পারেন, তবে তিনি যোগিনী (বলে গণ্যা) হন।

সেই বৈদিক যুগে মনে করা হত শুক্রের সঙ্গে রজঃ মিলিত হলে সন্তান হয়।

শুক্রকীটের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলন থেকে জন্ম—এই বিজ্ঞান ছিল অজানা।

ওই সূত্রের পরবর্তীতে আছে—

"স বিন্দুস্তদ্রজশ্চৈব একীভূয় স্বদেহগৌ।
বজ্রোল্যভাসযোগেন সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছতঃ॥"

অর্থাৎ বিন্দু ও রজঃ এক হয়ে সর্বপ্রকার সিদ্ধি দান করে।

পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়ে পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘ-মিলন দ্বারা পুরুষের বীর্য ধারণ করে একজন যোগিনী যে কোনও মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ দর্শনমাত্র জানতে পারেন।

কুণ্ডলিনী আয়ত্ত করার আরও একটি পদ্ধতির উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। সেখানে বলা হয়েছে—

"কুণ্ডলিনীপ্রবোধাৎ জীবপ্রকৃত্যোঃ সঙ্গমঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীম্।
বলাৎকারেণ গৃহ্নীয়াত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং বদম্॥
ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা দনী।
ইরাপিঙ্গলয়োর্মধ্যে বালরণ্ডাং চ কুণ্ডলী॥

(হটযোগ-প্রদীপিকা, পৃষ্ঠা ১৩১)

অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যে এক কুমারী রয়েছেন। তিনি কুমারী স্বভাবসুলভ সঙ্কোচবশত পুরুষ সহবাসে কুণ্ঠিতা। সঙ্গম প্রয়াসী হয়ে তাকে বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করলে কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হবে। শেষ দুটি লাইনে বলা হয়েছে ইড়-ই ভগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা-ই যমুনা। এই দুয়ের সংযোগস্থলে (মূলধারস্থ সুষুম্নাদ্বারে) রয়েছেন সেই কুমারী, যাকে ধর্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ সোজা বাংলায় লিঙ্গ মূলে কুমারী কল্পনা করে, ধর্ষণ করতে হবে। যাকে বলে, ধর্ষণ কল্পনায় হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন করার কথা অবশ্য সোজাসুজি ভাবে তন্ত্রে আছে। নারীকে পাওয়া না গেলে বিকল্প হিসেবে নারীকে সঙ্গম করছে কল্পনা করে হস্তমৈথুনের কথা বলা হয়েছে।

উ-ফ! কী ভয়ংকর! ধর্মে ধর্ষণ-সমর্থন? এ'জন্যেই এদেশে এত ধর্ষণ হয়।

উপনিষদ মতে যোগের চারটি বিভাগ

উপনিষদ যোগকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) লয়যোগ, (২) রাজযোগ, (৩) হঠযোগ (৪) মন্ত্রযোগ।

লয়যোগ

ব্যাসদেব লয়যোগের প্রথম সাধক। লয়যোগীরা মনে করেন মাথার খুলির নীচে রয়েছে সহস্রদলপদ্ম। এই সহস্রদলপদ্মে চিত্তের লয় বা মিলন ঘটিয়ে মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মলাভ হয়। অর্থাৎ, মনে মনে নারীর সঙ্গে মিলন কল্পনা করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। 'ব্যাস' বেদ বিভাগকর্তা। পুরাণে বলা হয়েছে, পুরাণসকল "ব্যাসাদিমুনিভিঃ

রচিতম্"। অর্থাৎ পুরাণ সকল ব্যাসমুণিগণের দ্বারা রচিত। পুরাণে আঠাশ জন ব্যাস-এর পরিচয় পাই। তাতে মনে হয় আঠাশজন মুনি ও ঋষি 'ব্যাস' উপাধি পেয়েছিলেন। এবং এই ব্যাসগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলে পরিচিত।

রাজযোগ

ভগবান পতঞ্জলি, মহর্ষি দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীরা রাজযোগের প্রথম সাধক। এঁরা নানা আসন ও মুদ্রার সাহায্যে বায়ু গ্রহণ না করে থাকতে পারতেন। এই যোগসিদ্ধরা ইচ্ছেমতো আকাশে উড়তে পারতেন, অদৃশ্য হতে পারতেন, যে কোনও পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। যে কোনও অলৌকিক ঘটনা ছিল করায়ত্ত। রাজযোগ করলে নাকি এইসব অলৌকিক এইসব অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করা যায়।

হটযোগ

গোরক্ষ মুনি, মার্কণ্ডেয় মুনি হটযোগের সাহায্যে যে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন। গোরক্ষ মুনির মতে যোগাঙ্গ ছয় প্রকারের। (১) আসন, (২) প্রাণায়ম, (৩) প্রত্যাহার, (৪) ধারণা, (৫) ধ্যান, (৬) সমাধি।

মার্কণ্ডেয় মুনির মতে যোগাঙ্গ অষ্টবিধ। যোগী যাজ্ঞবাল্ক্য মুনি অষ্টাঙ্গ যোগবিধির কথা বলেছেন। ছয়টি যোগাঙ্গের সঙ্গে আরও দুটি যোগবিধি তাঁরা যুক্ত করেছিলেন। বিধি দুটি হলো (১) যম, (২) নিয়ম।

মন্ত্রযোগ

মন্ত্রযোগের প্রণেতা ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, মহাত্যাগী, প্রবর, দধীচি, জমদগ্নি ইত্যাদি ঋষিরা প্রধান। এরা যোগ ও মুদ্রার সঙ্গে মন্ত্র-প্রয়োগের কথা বলেছেন। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞে যোগমুদ্রার পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করা হত। দু'য়ের ফলে শত্রু-দমন, মারণ-উচ্চাটন, রোগ নিবারণ ইত্যাদি অনেক কিছুই করা যেত বলে মনে করা হত।

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—পাপী, তাপী, বিলাসী, সন্ন্যাসী, ভোগী, ত্যাগী, সকলেই যোগের অধিকারী।

গীতা—মতে যোগের চারটি ভাগ

উপনিষদের যোগ-বিভাজনের সঙ্গে গীতা-র যোগ-বিভাজনের সামান্যতম মিল নেই। গীতাতে যোগের চারটি বিভাগের কথা বলা হলেও সেগুলো উপনিষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

গীতার যোগ-বিভাজন এই ধরণের :—(১) ধ্যানযোগ (২) সংখ্যাযোগ (৩) কর্মযোগ (৪) সন্ন্যাসযোগ।

পতঞ্জলি মতে যোগ আট রকমের

পতঞ্জলির মত অনুসারে যোগ আট রকমের। (১) যম (২) নিয়ম (৩) আসন (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার (৬) ধারণা (৭) ধ্যান (৮) সমাধি।

(১) **'যম'** হল নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাঁচটি উপায়। যথা:—অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য পালন ও বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে বাকি সময় ঈশ্বর আরাধণা।

(২) **'নিয়ম'** পাঁচটি। যথা:—দেহ ও আত্মাকে শুদ্ধ রাখা, যা পেয়েছ তাতেই যন্তুষ্ট থাকা, নিজের কর্তব্য পালনে যে কোনও কষ্টকে সহ্য করা, প্রণব ওঁ-কার এর জব করা, নিজের সমস্ত কাজকে পরমাত্মার কাছে সমর্পণ করা।

(৩) **'আসন'** পদ্মাসন, ভদ্রাসন, সুখাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি আসনে বসাকে বলা হয় 'আসন'। সাধক বা যোগী আসনে বসে জপ বা উপাসনা করেন।

(৪) **'প্রাণায়াম'** হল শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। প্রাণায়মের আবার চারটি ভাস আছে। বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি, স্তম্ভবৃত্তি এবং বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী।

(৫) **'প্রত্যাহার'** হল বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করা।

(৬) **'ধারণা'** হল একাগ্র মনঃসংযোগ। নাভিচক্রে। ভ্রুমধ্যে, নাকের জগায় ইত্যাদি কোনও শরীরের অংশে একগ্র মনঃসংযোগ করাকে ধারণা বলে।

(৭) **'ধ্যান'** হল মন কে চিন্তাশূন্য স্তরে নিয়ে যাওয়া।

(৮) **'সমাধি'**-তে সঠিক পরমব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে যান।

ছেলেবেলায় পথের পাঁচালীতে দেখেছি, অপু শূন্যে ওড়ার ক্ষমতা পেতে শকুনের ডিম, পারদ আর কীসব হিজিবিজি যোগাড় করেছিল অনেক কষ্ট করে। আমার বালক মনও অপুর সঙ্গী হয়েছিল। ভাবতাম যদি অদৃশ্য হওয়ার বা ওড়ার ক্ষমতা এমনি করে আমিও পেয়ে যাই...। ও সব ছেলেমানুষী ভাবনা আজ আর আমাকে রোমাঞ্চিত করে না, বরং এমন শিশুসুলভ ভাবনার কথা ভাবলে হাসি পায়। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানসিকভাবে নাবালক রয়েছেন, যাঁরা এখনও ছোট্ট অপুর বিশ্বাসকে 'পরম সত্য' বলে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। বিশ্বাস করেন যোগের হিজিবিজি পাগলামিতে।

যোগে যে সব অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার গপ্পো আছে; সেগুলো গপ্পোই, যোগ বলে অমর হওয়া যায় না, বয়সকে আটকে রাখা যায় না, ওড়ার ক্ষমতা লাভ করা যায় না, অদৃশ্যও হওয়া যায় না। সব রোগ সারিয়ে দেওয়ার দাবি একটা ধাপ্পা। তারপরও যে সব 'যোগী'রা এমন সব এমন সব অদ্ভুত দাবি করে, তারা নিসন্দেহে পাক্কা প্রতারক।

অধ্যায় : চার

যোগের সে'কাল এ'কাল

প্রাচীন-পন্থীরা যাঁরা আজও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলতে প্রাচীন গ্রন্থকেই বোঝেন, তাঁরা 'যোগ' বলতে বোঝেন—ঈশ্বরে চিত্ত-সংযোগ-ই যোগ। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যোগসাধনা অসম্ভব।

যোগের এই ব্যাখ্যা শ্রীভগবান্ গীতায় স্বয়ং শ্রীমুখে বলে গেছেন। আর 'সমাধি' কাকে বলে? যোগী শরীর থেকে মনকে আলাদা করে যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন, তখন সেই অবস্থাকে বলে সমাধি।

এই সময়ের মেগাস্টার যোগীরা অবশ্য নিজের নিজের ইচ্ছে মতো 'যোগ', 'সমাধি', 'সহজযোগ', 'আর্ট অফ লিভিং'-এর ব্যাখ্যা হাজির করে চলেছেন। নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে একটা ন্যূনতম মান পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। ফলে নানা যোগীর নানা মত চালু রয়েছে। ওঁদের ঈর্ষা, অন্যকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা, প্রচার পাওয়ার লালসা কখন-ই এককাট্টা হয়ে যোগ নিয়ে ব্যবসা করতে দেয়নি। ওঁরা সব্বাই স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে উদগ্রীব। সুযোগ পেলেই বুঝিয়ে দেন, অন্যরা সব ফালতু। সবাই এক একটি 'ভগবান' বা 'মাতাজী' হয়ে বসেছেন। এইসব ইন্দ্রিয়পরায়নরা-ই ইন্দ্রিয়জয়ী সেজে বসলে দুষ্টু লোকরা তো বলবে-ই,

মেরা দেশ মহান
শ'মে শ' যোগী বেইমান॥

এইসব যোগীদের মধ্যে একটা বিষয়ে খুব মিল আছে। মানবদেহের 'অ্যানাটামি' বা গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সব্বাই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁরা প্রাচীন যোগ শাস্ত্রের কথাগুলোকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরে আছেন। ওঁরা মনে করেন, আমাদের মেরুদণ্ডের শেষ ত্রিকোণাকার অস্থিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে কুণ্ডলিনী শক্তি। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলেই পরম-ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়।

এইসব সর্বজ্ঞ যোগী মহাত্মারা আজও পুরোন ও ভুল ধারণাকে ধরে বসে আছেন যে, পৃথিবীতে মৌল পদার্থ পাঁচটি। যথা ঃ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। এবং মানুষের দেহ এই পাঁচটি মৌল পদার্থ দিয়ে তৈরি। মৃত্যুর পর দেহ 'পঞ্চভূত' বা পাঁচটি মৌল পদার্থে বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু এই ধারণাতো সত্যি নয়। প্রকৃতিতে অথবা স্বাভাবিকভাবে যে মৌল

পদার্থ পাওয়া যায় তার সংখ্যা '৯২। মৌল পদার্থ তাকেই বলে, যে পদার্থকে সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহজে ভাঙা যায় না। মৌল হলো মূল উপাদান, যার থেকে রাসায়নিক সংযোগের সাহায্যে আর সব কিছু-ই সৃষ্টি করা যায়। মানুষ পারমানবিক চুল্লির সাহায্যে বা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৭টি মৌল পদার্থ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে। মানুষের তৈরি এই মৌলগুলো খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

যাক। এ'বার আমরা ঢুকবো যোগী ভগবান, বাবাজী ও মাতাজীরা কী বলছেন জানতে।

অধ্যায় : পাঁচ

‘রজনীশ’ এক শিক্ষিত যোগী, বিতর্কিত নাম

একটা বর্ণময় নাম ‘ওশো’ (রজনীশ) পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন তুলেছিলেন। অত্যন্ত বিতর্কিত ছিলেন ভগবান ‘ওশো’ হ্যাঁ, নামের আগে ‘ভগবান’ শব্দটা জুড়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং ওশো।

‘ওশো মানে-ই অবাধ যৌনতা’—এমন একটা প্রচার আছে। ফলে এই বঙ্গে ওশো ততটা প্রচার পাননি। কিন্তু হিন্দিভাষী অঞ্চলে ওশো’র ‘আর্ট অফ লিভিং’ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সত্য সাঁই দক্ষিণ ভারতে ভগবান। আমাদের

এখানে এলে-বেলে। এই বঙ্গে দেখতে পাবেন তন্ত্রের রমরমা। 'তন্ত্র' মানে-ই অবাধ যৌনতা। বামাক্ষ্যাপা থেকে রামকৃষ্ণ ইত্যাদি তান্ত্রিকদের কথা উঠলে আমরা যতটা ভক্তিগদগদ হই, আদৌ ততটা আদিখ্যেতা দেখান না অন্য প্রদেশবাসীরা।

আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালি মেধায় দরিদ্র। বড়জোর মধ্যমেধা পর্যন্ত দৌড়। সবজান্তা ভান করাটা মজ্জায় ঢুকে গেছে।

আমরা জানি-ই না—তন্ত্রে পরমব্রহ্ম পাওয়া যায় চূড়ান্ত দেহ-মিলনে। তন্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য তান্ত্রিককে যে কোনও নারীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। মা-বোন-মেয়ে সবার সঙ্গে-ই দেহ মিলন চলবে

(তন্ত্র নিয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ৫ম খণ্ড)।

আমার এই কথা লেখার অর্থ এই নয় সে ওশো'র 'আর্ট অফ লিভিং'-এ আস্থা রাখছি। সমর্থন বা অসমর্থন না করে খোলা মনে, নিরপেক্ষতার সঙ্গে আলোচনায় ঢুকবো এবার।

ওশো রজনীশ

সালটা ১৯৭৭। শরতের শেষ। এখন সকাল। পুণের বুদ্ধ হলে প্রচুর ভক্তের ভিড়। অত্যন্ত ধনী ও বিদেশী ভক্তদের সংখ্যাই বেশি। প্রত্যেকের পরণে কমলা থেকে গোলাপী রঙের আলখাল্লার মত সিল্কের পোশাক। গলায় ঝুলছে রজনীশের লকেট। খালি পা। একদিনের মেডিটেশন ফি ২৫০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত। দু'মাসের কোর্স ফি ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা।

ভগবান রজনীশ এলেন তাঁর আবাস লাওৎ-সে ভবন থেকে সাদা মার্সিডিজ গাড়িতে। ভবন থেকে বুদ্ধ হল ১০০ গজের বেশি হবে না, রজনীশের পরণে রেশমের দুধ সাদা আলখাল্লা। কাঁধে একটা সাদা তোয়ালে। মাথায় টাক, মুখে দাড়ি-গোঁফ, ঘন কালো ধনুকের মত ভুরু। সুন্দর স্বাস্থ্য, মসৃণ চামড়া। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো চোখ দু'টি, দেখলে যে কেউ প্রথম দর্শনেই আকর্ষিত হবেন।

এখন উনি প্রবচন শোনাবেন। বিশাল হলের মেঝে শ্বেতপাথরের। মেঝেতে বসে ভক্তরা। সামনে ডায়স। ডায়াসে একটা রিভলভিং চেয়ার। ভগবান এলেন। বসলেন। ডায়াসে চেয়ারের পাশে-ই দাঁড়িয়ে মা যোগলক্ষ্মী।

ভগবান প্রবচন শোনাচ্ছেন। তাঁর বাণী ক্যাসেট বন্দি করে রাখা হচ্ছে। প্রবচন শেষে রজনীশ ধ্যানমগ্ন হলেন। একটু পরে একাধিক শিষ্যার কাঁধে ভর করে প্রবচন-গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যায় আবারও আসবেন। দর্শন ও দীক্ষা দেবেন। দীক্ষা দেবার সময় ভক্তের

গলায় একটা হার পরিয়ে দেন। হারে ওশোর ছবিওয়ালা লকেট ঝুলছে। নতুন নামও দেন একটা। সঙ্গে উপহার হিসেবে হাতে তুলে দেন একটা বাক্স। বাক্সে থাকে রজনীশের একটা দাড়ির চুল বা পায়ের নখ।

এই ভণ্ডামি সহ্য করতে হয়। অনেক কিছু দেখতে চাইলে, জানতে চাইলে মুখ বন্ধ রাখতেই হবে।

চুম্বকে রজনীশ

- রজনীশের জন্ম ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে। জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের কুচওয়ারা গ্রামে। এই গ্রামে রজনীশের মামার বাড়ি। বাবার বাড়ি মধ্যপ্রদেশের-ই গরদোয়ারায়।
- জন্মগত উপাসনা ধর্ম—জৈন।
- রজনীশের দাবি, ২১ মার্চ ১৯৫৩ সালে সত্যের সন্ধান পান।
- ১৯৫৭ সালে সাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম এ করেন। পরীক্ষায় ১ম হয়েছিলেন।
- ১৯৫৭ সালে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হল। পরিচিত হল 'আচার্য রজনীশ' নামে।
- ১৯৬৬-তে অধ্যাপকের পদ ছাড়লেন। হলেন ধর্মগুরু। নাম নিলেন 'ওশো' যার উৎপত্তি 'ওশনিক' অর্থাৎ 'মহাসমুদ্রের মত বিশাল' শব্দ থেকে।
- ১৯৭০ সালে মুম্বাইতে চলে আসেন ও থাকতে শুরু করেন। ভক্তদের সামনে প্রথম জানান—ধ্যান-ই জীবনে আনন্দ আনতে পারে। জীবনকে পূর্ণ করতে পারে।
- ১৯৭০ সালে 'আচার্য রজনীশ' থেকে 'ভগবান শ্রীরজনীশ' নামে নিজেকে পরিচিত করেন।
- ১৯৭৪ সালে শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে পুণে চলে আসেন এবং পুণেতে 'শ্রী রজনীশ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন সকালে মানুষের চেতনার পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রবচন দেওয়া শুরু করেন।
- ভগবান রজনীশ তাঁর আবাস থেকে দিনে দু'বার মাত্র বাইরে আসতেন। সকালে প্রবচন দিতে। সন্ধ্যায় দর্শন ও দীক্ষা দিতে।
- ১৯৮১ সালে আমেরিকায় যান। সেখানে ওরেগান স্টেটে ৬৪ হাজার একর জমি কিনে 'রজনিশপুরম' নামের শহর গড়ে তোলেন।
- ১৯৮৫-তে আমেরিকা সরকার রজনীশের বিরুদ্ধে ৩৫টি অপরাধের অভিযোগ আনে এবং গ্রেপ্তার করে।
- ১৯৮৬-তে আমেরিকান সরকার ওশোকে 'অবাঞ্ছিত' হিসেবে দেশ থেকে বহিষ্কার করে এবং ৩ লক্ষ ডলার জরিমানা করে।
- ভারতে ফিরে ১৯৮৭-তে পুণের আশ্রমে আসেন।
- ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে মৃত্যু।

রজনীশের প্রবচন থেকে কিছু নির্যাস

- সব ধর্ম-ই মুখে প্রেমের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে প্রেমকে জোর করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখায়।
- ধর্মগুরুরা-ই মনকে বিষময় করেছে। প্রেমকে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে উৎসারিত হওয়াকে কীভাবে বাঁধ দিয়ে আটকাতে হয়, তা শিখিয়েছে।
- মানুষ যতই সভ্য, সুসংস্কৃতি-সম্পন্ন হচ্ছে, তত-ই তথাকথিত ধর্মের প্রভাবে মন্দিরে মসজিদে-গীর্জায় প্রার্থনা করে চলেছে, এবং তত-ই মানুষের জীবন প্রেম-শূন্য হয়ে পড়ছে।
- যে ধর্ম ব্রহ্মচর্য পালনকে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে শেখায়, সে ধর্ম প্রেমের শত্রু।
- প্রেমের সঙ্গে কাম মিলে-মিশে থাকে। কামকে বাদ দিয়ে প্রেম হয় না। আর, প্রেমহীন কাম লাম্পট্য হতে পারে, প্রেম নয়। সব ধর্মগুরু ও মহাত্মারা কাম'কে পাপ, অধর্ম, বিষ বলে ঘোষণা করেছেন।
- কাম'কে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার সর্বপ্রথম চেষ্টা তান্ত্রিকরা-ই করেন। তাঁরা-ই প্রথম বলেছিলেন, কাম তৃপ্তিতে যে আনন্দ তা-ই ব্রহ্ম, তা-ই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তথাকথিত হিন্দু ধর্মগুরুরা কি তন্ত্রের এই সার কথা-কে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবেন?
- পরমাত্মা কাম শক্তিকে-ই সৃষ্টির মূল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের জন্ম-ই কামনা থেকে। পরমাত্মা যাকে 'পাপ' বলে মনে করেন না, মহাত্মা, ধর্মগুরুরা তাকে 'পাপ' বলে থাকেন। এরপর বলতে-ই হয়, যে ধর্মগুরুরা পরমাত্মার বিধান উল্টে দিতে চায়, তাদের চেয়ে পাপী এ'জগতে আর কেউ নেই।
- মনে রাখা দরকার, ব্রহ্মচর্য পালন করা সংযমীরা খুব বিপজ্জনক লোক। তাদের ভিতরে রয়েছে কামনার আগুন, বাইরে সংযমের মুখোশ। তাই শত-শত বছর ধরে এইসব মুখোশধারী ধর্মগুরুদের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা চলে আসছে এবং আসবে।
- সমাধি বা ধ্যান হলো মনের একাগ্রতা, যাতে অন্য চেতনা রহিত হয়। সম্ভোগে অর্থাৎ নারী-পুরুষের প্রেমের মিলনে-ই মন একাগ্র হয়, চেতনা রহিত হয়। ধ্যানের বা সমাধির প্রথম অনুভব হয়েছে সম্ভোগের মুহূর্তেই। অন্য কোনও সময়ে নয়।
- সমস্ত ধর্ম-ই মৃত্যুবাদী, জীবনমুখী নয়। ধর্মের দৃষ্টিতে—মৃত্যুর পর যা কিছু তা-ই মহত্বপূর্ণ। জীবিত অবস্থার কোনও কিছুই মহত্বপূর্ণ নয়।
- ধর্ম হলো মানুষকে বিকশিত করার শিল্পকলা, 'আর্ট অফ লিভিং' আজকালকার ধর্মে মানুষকে বিকশিত করার কোনও প্রচেষ্টাই দেখা যায় না।

- পৃথিবীতে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, পূজারী, পুরোহিত, পীর, প্রিস্ট সব-ই বেড়েছে, তারপরও পৃথিবীতে সৎ মানুষের বড় অভাব। কেন না এইসব ধর্মের আধারেই রয়েছে ভুল।
- পৃথিবীর একশো জন পাগলের মধ্যে আটানব্বই জন হয়েছে কাম দমনের জন্যে। পৃথিবীর এক হাজার হিস্টিরিক রোগী নারীর মধ্যে নিরানব্বই জনের মুর্ছা রোগের কারণ অবদমিত যৌনতা।
- অন্তর্মুখী চেতনায় পৌঁছবার দুটি মাত্র পথ। একটি সম্ভোগ অর্থাৎ যৌন মিলনের, আর অন্যটি হল 'মেডিটেশন' বা ধ্যানের পথ।
- বালক-বালিকাদের যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত নগ্ন থাকতে দেওয়া হয়, তবে একে অপরের শরীরকে জানতে অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করবে না।
- বাচ্চারা যখন দেখে মা-বাবারা যৌনতাকে নোংরা বলছেন মুখে এবং সুযোগ পেলেই সেই যৌনতায় মেতে উঠছেন, তখন তারা মা-বাবাকে প্রতারক, ভণ্ড, নোংরা ইত্যাদি মনে করে। শ্রদ্ধা যায় শেষ হয়ে।
- যারা জীবনে প্রেম করার সঙ্গী পায়নি, তারা-ই কামুক। টাকা খরচা করে কাম মেটায়।
- যে স্বামী বা স্ত্রী সবাইকে ভালোবাসতে পারে না, সে স্ত্রী বা স্বামীকে ভালোবাসকে কীভাবে?
- ভালোবাসা এক স্বভাব, 'রিলেসন্‌শিপ' বা সম্পর্ক নয়।
- প্রেম + ধ্যান = পরমাত্মা।
- তোমার যদি পূর্বজন্মে যৌন মিলনের অর্থাৎ সম্ভোগের গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তুমি এ'জন্মে যৌনতৃষ্ণাহীন ভাবে জন্মাবে। ব্রহ্মচর্য পালনজাতীয় কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে না। স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গেই সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির উর্ধে থাকবে চেতনা।
- মনে মনে যৌনক্রিয়া বা স্বমৈথুন বিকৃত মনের লক্ষণ। সম্ভোগ করুন শারীরিকভাবে। এই সম্ভোগ কখন-ই ধর্ষণ হবে না। হবে নারী-পুরুষের মিলিত ইচ্ছায়।
- যে দেশে প্রেম ছাড়া বিয়ে হয়, সেই দেশে যৌনতা শরীরের স্তরে-ই থেকে যায়। তার বেশি উঠতে পারে না।
- যে ধরণের ভালোবাসার বিয়েতে পণ্ডিত, জ্যোতিষ, জাত, ধর্ম, অর্থের বিচার প্রাধান্য পায় না, সেখানে ভালোবাসা-ই প্রাধান্য পায়।
- বিয়ে কখনই দুটি নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ার ব্যবস্থা হতে পারে না। কেন না, মন চঞ্চল, রুচি পরিবর্তনশীল। তাই পতি-পত্নীর শারীরিক মিলন কখন-ই চিরস্থায়ীভাবে গভীর হতে পারে না।

- প্রেম ছাড়া সামাজিক যে সব বিয়ে হয়, তাতে পতিনির্ভর পত্নীর অবস্থা বেশ্যার মতো। তফাৎ খুব-ই সামান্য। বেশ্যাকে একদিনের জন্যে কেনেন। পত্নীকে সারা জীবনের জন্যে।
- স্ত্রী মা না হলে জীবনে পূর্ণতা পায় না। স্ত্রী মা হওয়ার পর তার যৌন চাহিদা কমে যায়।
- প্রায় দশ হাজার বছর ধরে অনেক পয়গম্বর, বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর, ঈশ্বরপুত্র অবতাররা মানবজাতিকে বুঝিয়েছেন যে, ঝগড়া কোরো না, ঈর্ষা কোরো না। এইসব মহাপুরুষদের প্রচারের ফলে তথাকথিত ধর্মে বিশ্বাসীদের ভিড় বেড়েছে, সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ওরা কেউ-ই উপদেশগুলো মান্য করেনি।

ওশোর এইসব মতামতগুলো বিকৃতি না ঘটিয়ে তুলে দিলাম। ওর এইসব বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের কোনও লেনা-দেনা নেই। ওশোর জন্মান্তরে বিশ্বাস স্পষ্টতই বিজ্ঞান-বিরোধী। ওশো মনে করেন—মা হওয়াতেই নারীজীবন পূর্ণতা পায়। এগিয়ে থাকা মূলবোধের নারীরা, শিক্ষিত–স্বনির্ভর নারীরা এমন বোকা-বোকা ধারণার সঙ্গে কখনই একমত হবেন না। এমনি আরও অনেক ভুল ধারণা, অবাস্তব চিন্তা, অসামাজিক ধারণা তাঁর 'দর্শনে' ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রগতিশীল চিন্তা-ও।

এ'বার আবার আমরা দেখবো, ওশো যোগ-ধ্যান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কী বলছেন?

ধ্যান কাকে বলে?

স্ব-বোধে থাকার নাম ধ্যান। যখন তুমি কিছুই করো না, কোনও কাজে নেই, চিন্তা-ভাবনায় নেই, যুক্তি-তর্ক-বিচারে নেই, তখন তুমি স্ব-বোধে আছো।

(স্ব-বোধে থাকা—মানে নিজের বোধে, বিচার-বুদ্ধিতে-যুক্তি-তর্কে থাকা। আর ওশো বলছেন—'স্ব-বোধ' মানে বোধহীন, বিচার-বুদ্ধিহীন? এমন অদ্ভুতুড়ে ব্যাখ্যা মানতে গেলে বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিতে হয়।)

ওশো (রজনীশ)-এর লেখা 'ধ্যান-যোগ' গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠায় আবার বলছেন, "যদি ক্ষণিকের জন্যও তুমি এই সমস্ত থেকে কর্মশূন্য হতে পারো—সেটাই হচ্ছে ধ্যান। নিজের অন্তরে অবস্থিত পরিপূর্ণ বিশ্রমে আসতে পারাটাই হচ্ছে ধ্যান।"

এই গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় আবার বলছেন, "মনে রাখবে যে ধ্যান, হচ্ছে সচেতন হওয়া, সজাগ থাকা। তুমি সজাগ হয়ে যা কিছুই করো তাই ধ্যান।

(বুঝলুম না বাপু। ১ পৃষ্ঠায় ওশো বললেন, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সমস্ত রকম ভাবে কর্মশূন্য হতে সারা-ই 'ধ্যান'। ৩ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে সমস্ত রকম ভাবে সজাগ থাকা-ই ধ্যান।)

ধ্যানের সময়

ধ্যানে বসার আগে টেলিফোনের কানেকশন কাটাতে হবে, নতুবা তুলে রেখে 'এনগেজড' করে দিন। কলিংবেলের আলাদা একটা সুইচ রাখবেন, যাতে সুইচের 'অফ' 'অন'-এ বন্ধ করতে ও খুলতে পারেন। কলিংবেল বন্ধ করুন। যে ঘরে ধ্যান করবেন, সে ঘরে ঢোকার আগে জুতো বা চটি খুলে রাখুন। কারণ ধ্যান-কক্ষ অতি পবিত্র স্থান। দরজা বন্ধ করুন। বন্ধ দরজার বাইরে ঝুলিয়ে দিন, "ধ্যান করছি। বিরক্ত করবেন না।" ঘরে ঢোকার সময় জুতোর মতো সমস্ত চিন্তাকে বাইরে ছেড়ে আসুন।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টা ধ্যানের জন্য আলাদা করে রাখুন। ধ্যানের জন্য একটা ঘর আলাদা করে রাখতে পারলে খুব-ই ভালো হয়।

আলাদা ঘর কেন? কারণ প্রত্যেক কাজ নিজের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তুমি যখন ধ্যানমগ্ন হও, তখন ধ্যান-কক্ষ তোমার ধ্যানের তরঙ্গকে পান করে নেয়। পরের দিন যখন ধ্যানে বসবে তখন ধ্যান-কক্ষ তোমাকে সেই তরঙ্গকে ফিরিয়ে দেবে।

(*এমন তরঙ্গ তত্ত্ব উদ্ভট্ এবং বিজ্ঞান-বিরোধী।*)

ধ্যানে বা যোগে কীভাবে বসবে?

অনেকেই তোমাকে পদ্মাসন থেকে শুরু করে নানা আসনে বসে ধ্যান বা যোগ সাধনা করতে বলবে। ওইসব আসন যদি তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে নিজের মনকে স্ব-বশে আনবে কী করে?

ধ্যানে বা যোগে বসতে প্রথম ও শেষ কথা হলো আরাম করে বসো। চেয়ারে বসবে অথবা মেঝেতে—এটা কোনও প্রশ্ন-ই নয়। আরামে বসলে, শরীরের কষ্ট বা অস্বস্তি নিয়ে মন ব্যস্ত থাকবে না।

মুখোশ ছেড়ে আরম্ভ কর

আমি চাই, তুমি যখন একা, তখন সভ্যতার মুখোশ খুলে রেখে ধ্যান-কক্ষে নিজের ইচ্ছে মত নেচে-পাগলামি করে যোগ বা ধ্যানের কাজটা শুরু করো।

আমি শুরুতে শিষ্য-শিষ্যাদের ইচ্ছে মতো নাচতে, কাঁদতে, পাগলামো করতে দিই। এতে তুমি যখন আনন্দ পেতে শুরু করবে, অফুরন্ত আনন্দ উপভোগের পর মন শান্ত হবে, মৌন হবে। প্রথমেই সোজা হয়ে বিশেষ মুদ্রায় বসতে বললে, 'ঠিক বসতে পারছি না, বসতে কিছু শারীরিক অসুবিধে হচ্ছে'—ইত্যাদি ভেবে মন বিক্ষিপ্ত হতো।

ধ্যানের আগের মনকে মুক্ত করো 'অনিবার্য' নির্দেশ মেনে

ধ্যান করলে হলে তিনটি 'নির্দেশ' মানতে-ই হবে। এই তিনটি নির্দেশকে বলে 'অনিবার্য নির্দেশ' অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নির্দেশ।

এক : ধ্যানে মনকে নিয়ে যেতে হবে 'বিশ্রামপূর্ণ' অবস্থায়। মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মনের সঙ্গে লড়াই নয়। একাগ্রতা আনার চেষ্টা নয়। **দুই** : যা চলছে তাতে কোনও হস্তক্ষেপ নয়। শুধু মনকে শান্ত ও সজাগ রাখা। **তিন** : কোনও মূল্যায়নের চেষ্টা নয়। যা করছি, তা কতটা ঠিক করছি, এ'সব মূল্যায়ন করতে নামলে তা ধ্যানের বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

সক্রিয় ধ্যান করার নির্দেশ বা বিধি

এক : দশ মিনিট নাক দিয়ে জোরে প্রশ্বাস ভিতরে নেবে এবং বাইরে ছাড়বে। এই সময় কাঁধ ও গলা শিথিল রাখবে।

দুই : সম্পূর্ণ পাগলের মতো হয়ে যাও। হাসো, কাঁদো, নাচো, গান করো, চিৎকার করো, লাফাও, হাত পা ছোড়ো, কোমর পেট-বুক কম্পিত করে। শরীরকে সবদিকে গতিময় হতে দাও।

তিন : কাঁধ ও গলাকে শিথিল করে হাত দুটোকে মাথার উপর তুলে রাখ। কনুই নমনীয় থাকবে। এ'বার সোজা হয়ে লাফাতে শুরু করো। মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করবে—হু... হু... হু... এই মন্ত্র জোরে উচ্চারণ করবে। এই তীব্র হু...ধ্বনী প্রতিবার উচ্চারণের সঙ্গে তা কামকেন্দ্র গভীরভাবে আঘাত করবে। মনে রাখতে হবে, এই হু...ধ্বনী সৃষ্টি করতে হবে নাভিকুণ্ড থেকে, একে বলে নাদধ্বনি।

(পেট বা নাভি থেকে কখন-ই কোনও ধ্বনী স্বরনালী দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে না। আমাদের ফুসফুসের হাওয়া বের করার সময় স্বরযন্ত্রের সাহায্যে আমরা শব্দ সৃষ্টি করি, পেট থেকে শুধুমাত্র উৎগার বা ঢেকুর হয়ে এবং পাদ হয়ে বায়ু নিঃসরণ ঘটিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব।)

চার : থামো। যেখানে যেমন আছ, তেমন ভাবে-ই থেমে যাও। তোমার ভিতরে কী হচ্ছে, অনুভব করো, সঙ্গী থেকে যাও।

পাঁচ : চারটি পর্যায়ের পদক্ষেপে তোমার শরীরে নতুন শক্তি জন্ম নিল। শরীরে শক্তির 'চার্জ' হলো। এবার অন্তরের পরমাত্মাকে নিবেদন করো, উৎসব করো। সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে উৎসব পালন করো।

(ওশো রজনীশের এই ধ্যান পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বিধি পালন করে ধ্যান করেন।)

কুণ্ডলিনী ধ্যান

কুণ্ডলিনী জাগ্রত করে পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মকে অনুভব করা যায় না। অনুভব করা যায় শুধুমাত্র সম্ভোগে, শারীরিক মিলনে। একথা প্রাচ্যের মুনি-ঋষিরা আগেই লিখে গেছেন।

এখানে কুণ্ডলিনী ধ্যান শেখান হচ্ছে। কারণ এই ধ্যান সক্রিয় ধ্যানের অতি প্রিয় সহযোগী। কুণ্ডলিনী ধ্যান করতে হয় পনেরো মিনিট করে চারটি পর্যায়ে।

এক : প্রথম পর্যায়ে শরীরকে শিথিল করে নাও এবং পুরো শরীরকে কাঁপতে দাও। গভীর ভাবে ভাবতে থাকো—পুরো শরীর কাঁপছে। দেখবে কাঁপতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করে কাঁপিও না।

দুই : নাচো, যেমন ইচ্ছে নাচো। শরীরকে ইচ্ছে মতো গতি আনতে দাও।

তিন : চোখ বন্ধ করে নাও। ইচ্ছে মতো বসো অথবা দাঁড়িয়ে থাকো।

চার : চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকো। মরার মতো নিশ্চল থাকো।

এই কুণ্ডলিনী ধ্যানের মধ্য দিয়ে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়।

নটরাজ ধ্যান

'নটরাজ ধ্যান' একটি সম্পূর্ণ ধ্যান। এতে ৬৫ মিনিট তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এই নৃত্য হবে অন্তর থেকে উৎসারিত। এটা কোনও সিরিয়াস কাজ নয়। জীবন-শক্তির সঙ্গে খেলা।

মনে রাখতে হবে—পরমাত্মা গম্ভীরভাবে কোনও সৃষ্টি করেননি। তুমি, আমি, প্রকৃতি—সব-ই তাঁর খেলা, তাঁর লীলা।

(সব সৃষ্টির ক্ষেত্রে-ই প্রকৃতির নিয়মের বদলে কাল্পনিক পরপাত্মাকে টেনে আনা ওশোর অজ্ঞতাই উন্মোচিত করে।)

সুফি ধ্যান

সুফি দরবেশরা ধ্যানের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে, আল্লার সঙ্গে একাত্ত হয়ে যান। তাঁদের এই ধ্যান পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। সুফিরা তাঁদের ধ্যান শুরু করার আগে জুতো খুলে নেন। তারপর গোলকারে ঘুরতে থাকেন। এই ঘোরা হয় ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে, অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। ডান হাত ওপরে তুলে করতল আকাশের দিকে মেলে দেওয়া হয়। বাঁ হাত থেকে নীচের দিকে নামানো। করতল থাকে মাটির দিকে মেলা।

প্রথম পনেরো মিনিট ঘোরার গতি থাকবে মাঝারি। পরের তিরিশ মিনিটে ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে যেতে হবে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে শরীর নিজেই পড়ে যাবে।

এবার ধ্যানের দ্বিতীয় ধাপ। পড়া মাত্র পেটের দিক মাটি স্পর্শ করে হয়ে থাকতে হবে। নিজের শরীরকে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে দাও।

হাস্য ধ্যান

হাসি মুখ বুদ্ধ দেখেছো। তাঁর সমস্ত উপদেশের সার হলো হাসি। হাসি যদি আন্তরিক হয় তবে মন আনন্দে বিলীন হয়। সম্ভোগ যেমন মনকে চূড়ান্ত আনন্দের জগতে নিয়ে যায়, হাসি ও তোমাকে আনন্দের মধ্যে নিয়ে যাবে। চূড়ান্ত না হলেও এক অসাধারণ আনন্দের জগতে নিয়ে যাবে।

হাসির ধ্যানের জন্য যা করবে

সকালে ঘুম ভাঙার পর, চোখ খোলার আগে ঘুম থেকে ওঠা বেড়ালের মতো আড়মোড়া ভাঙবে। এর তিন চার মিনিট পরে চোখ বন্ধ রেখে-ই হাসতে আরম্ভ করবে। পাঁচ মিনিট শুধু হাসবে।

প্রথম প্রথম হাসা অভ্যেস করতে হবে। তারপর দেখবে হাসি অন্তর থেকে আপনা-আপনি উৎসারিত হচ্ছে।

বিপাশ্যনা ধ্যান বা যোগ

বিপাশ্যনা ধ্যান বা যোগ পদ্ধতির সাহায্যে সবচেয়ে বেশি লোক বুদ্ধত্ব লাভ করেছে। বিপশ্যনা তিনভাবে করা যেতে পারে। তোমার যেটা পছন্দ সেই একটি পদ্ধতিকে বেছে নিতে পারো।

প্রথম পদ্ধতি : নিজের প্রতিটি কাজ করবে অত্যন্ত সজাগ ভাবে। তুমি ঘরে ঢুকেছো, কলিং বেল বাজলো, একই সময়ে ফোনটা বাজলো। হাতের জরুরি কাগজটা নামিয়ে রেখে ফোনটা ধরে বললে, এক মিনিট, কেউ এসেছে। দেখে আসছি। দরজা খুলে আগতকে বসতে বললে। ফোনের কথা সেরে প্রয়োজনীয় কাগজটার কথা মনে পড়লো। ফাইলে রাখতে হবে। আর তখনই খেয়াল হলো, কোথায় রেখেছো মনে পড়ছে না। তন্নতন্ন খুঁজে-ও কাগজটা পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজটা সজাগভাবে রাখা হয়নি বলে-ই পাওয়া যাচ্ছে না।

হারাতো না, যদি কাগজটা সচেতন ভাবে রাখা হতো। একসঙ্গে তিনটে কাজ এসে পড়লো, ওমনি কাজে ভুল হলো। বে-খেয়ালে রাখার দরুন জরুরি একটা বিষয় ভুলে গেলে। প্রতিটি কাজ সজাগ ভাবে করাটাও ধ্যান। ছটফট না করে টেনশনে না ভুগে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর মনকে সজাগ রাখার দুটি বিধি আছে। প্রথম বিধি অনুসারে প্রশ্বাস নিতে হবে পেট ভরে, পেট ফুলিয়ে। শ্বাস ছাড়তে হবে পেট যতটা সম্ভব পিঠের দিকে টেনে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সজাগ ভাবে অর্থাৎ একাগ্রভাবে পেটকে ভিতরে যতটা সম্ভব ঢুকিয়ে নেওয়া ও ফুলিয়ে তোলা-ই ধ্যান।

তৃতীয় পদ্ধতি : **সজাগ ভাবে প্রশ্বাস নাও ফুসফুস ভরে, বুক ফুলিয়ে। শ্বাস ছাড় ফুসফুস থেকে বুক নামিয়ে। এটাও ধ্যান।**

সজাগ ভাবে যখন-ই তুমি কিছু করছো, তখন তুমি দ্রষ্টা। প্রশ্বাস নেওয়া ও শ্বাস ছাড়ার মাঝখানে সামান্য সময়ের জন্যে হলেও শ্বাস থেমে যায়। তখন তোমার মৃত্যু হয়। নতুন প্রশ্বাস যখন নাও তখন নতুন জন্ম হয়।

(শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ করলেই মৃত্যু হয়—জানা ছিল না। ডাক্তাররা যখন শরীর পরীক্ষা করতে দম বন্ধ করে থাকতে বলেন, তখন আমরা ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে, ডাক্তারের কথা ও বাইরের কথা শুনতে-শুনতে আসলে মরে থাকি—সত্যি বলছি জানতাম না।)

শান্তি আনতে যোগ

পতঞ্জলি বলেছেন, শ্বাসকে বের করে দেওয়ার বিধির সাহায্যে মনকে শান্ত করা যায়।

যতটা সম্ভব শ্বাসকে বাইরে ছাড়বে। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনের অশান্তিও বাইরে চলে যায়। এই শ্বাস ছাড়ার আবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পেট ভিতরের দিকে টেনে নাও। তিন সেকেণ্ডের জন্য থামো। এই পদ্ধতিতে শ্বাস ছাড়লে অশান্তি দূর হয়, মনে শান্তি আনে।

(গরিব, বেকার, অসুস্থ, অপুষ্টিতে ভোগা, মাথা গোঁজার ঠাঁইহীন অশান্ত মানুষদের মনে শান্তি আনতে সরকার ওশো'র এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন।)

নাদব্রহ্ম ধ্যান বা নাদব্রহ্ম যোগ

এই ধ্যান বা যোগ সকালে খালি পেটে করতে হয়। এই ধ্যান বা যোগ বিধি এক ঘন্টায় তিনটি ধাপে করতে হবে।

প্রথম ধাপ : তিরিশ মিনিট। বিশ্রাম নেবার মত করে ইচ্ছে মতো বসো। মুখ দিয়ে ভ্রমরের মত গুঞ্জনধ্বনি করো। গুঞ্জনধ্বনির কম্পন গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় ধাপ : পনেরো মিনিট। প্রথম সাড়ে সাত মিনিট দুটি হাতের তালুকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে চক্রাকারে ঘোরাতে থাক। গতি হবে অতি মন্থর। সাড়ে সাত মিনিট শেষে হাতের তালু দুটো নাভির সামনে নিয়ে আসবে।

এবার হাত দুটোর তালু মেঝেতে ঠেকাও। তারপর উল্টো ভাবে চক্রাকারে হাত দুটি ঘোরাও। গতি হবে এক-ই রকম মন্থর। সাড়ে সাত মিনিট শেষে হাত দুটো নাভির সামনে আনবে।

তৃতীয় ধাপ : পনের মিনিট। শান্ত ও স্থির হয়ে বসে থাক বা শুয়ে পড়ে।

নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাদব্রহ্ম ধ্যান করতে পারলে খুব-ই ভাল ফল পাওয়া যায়। নারী-পুরুষের পরনে কোনও কাপড় না থাকলে সবচেয়ে ভালো। ঘরের আলো হবে ছোট-ছোট চারটে মোমবাতির আলোর সমান।

চোখ বন্ধ করে তিরিশ মিনিট দু'জনে দুজনকে ধরে গুঞ্জনধ্বনি করো এবং নিজেদের শরীরকে কল্পনা করতে থাক।

এই বিশেষ ধ্যানের জন্যে বিশেষ যন্ত্রধ্বনির ক্যাসেট আছে। দুজনের শক্তি মিলিত হতে থাকবে, একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে থাকবে, দু'জনে এক হয়ে যাবে।

সম্ভোগ ধ্যান

শিব যোগের স্রষ্টা। এবং তিনি লিঙ্গেশ্বর। শিবের উপদেশ, নারী-পুরুষের মিলন বা সম্ভোগ-ই ধ্যান। সম্ভোগের সময় তোমার প্রতিটি দেহকোষ উত্তেজনায় কম্পিত হতে থাকে। নাড়ির গতি দ্রুত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। প্রতিটি কোষ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। চোখে বিস্ফারিত হয়। যৌনাঙ্গ রসসিক্ত হয়। সম্ভোগে দুটি শরীর শুধু মিলিত হয় না। চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে পরম আনন্দ, পরমেশ্বরকে অনুভব করা যায়।

যখন তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে, তখন দুটি যৌন কোষের মিলন হয়েছিল। ওই দুটি কাম কোষই বিভক্ত হতে হতে, সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে তোমার শরীর তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র সম্ভোগের সময়-ই তোমার শরীর প্রতিটি কোষ কাঁপতে থাকে। মনে রাখবে—তোমার শরীরের প্রতিটি কোষ বিপরীত কোষের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এই কম্পন যদি পাশবিক মনে হয়, তাতেও এটায় কোনও দোষ নেই। কারণ মানুষ এক হিসেবে পশু।

আমরা বিশেষতঃ মেয়েদের বেলায় মিলনের সময় গতি ও কম্পনাকে নিষেধ করি। তারা মরদেহের মত পরে থাকে। নিষ্ক্রিয় অংশীদার। এটা কেন হচ্ছে? কারণ পুরুষরা মেয়েদের অধীনে রাখতে চায়। পুরুষরা জানে, মেয়েরা পরপর তিন তিনবার চূড়ান্ত উত্তেজনার শিখরে উঠতে পারে। আর পুরুষ পারে কেবলমাত্র একবার। পুরুষ যখন সম্ভোগে চূড়ান্ত উত্তেজনায় বিস্ফোরিত হয়। নারী তখন আরও একাধিকবার চূড়ান্ত উত্তেজনায় বিস্ফোরিত হতে চায়। পুরুষ ভয় পায় সামলাবে কী করে?

আমি বলি, দু'জনেই কম্পিত হও। দু'জনেই সক্রিয় হও। দু'জনেই দু'জনের উপর নাচো। দু'জনের চূড়ান্ত আনন্দ আসে দুজনে সক্রিয় মিলনে। নারী মৃতের মত পড়ে থাকলে তার চূড়ান্ত উত্তেজক বিস্ফোরণ হবে কোথা থেকে? সে অতৃপ্ত থাকলে অন্যকে কামনা করবে, এটাই স্বাভাবিক।

অতএব বলি, দু'জনেই দু'জনের শরীরে প্রবেশ করো।
এই মিলন বৌদ্ধিক নয়। এই মিলন জৈবিক।
এটাই অদ্বৈত। এই অদ্বৈতকে অনুভব
করতে না পারলে সমস্ত
দর্শনশাস্ত্র ব্যর্থ।

রজনীশকে যেমন দেখেছি

রজনীশ ভালো সংগঠক ছিলেন। পৃথিবী ব্যাপী ৩০০ 'রজনীশ মেডিটেশন সেন্টার' (Rajneesh Meditation Centre) তৈরি করেছিলেন। প্রতিটি সেন্টার পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন একজন করে সুঠাম চেহারার সুন্দরীকে।

রজনীশকে ঘিরে সব সময়-ই থাকতেন সুন্দরী দেশী-বিদেশী রমনীরা। রজনীশের সম্ভোগ সেশনে নর-নারীরা পোশাক-টোশাক ছিঁড়ে মৈথুনে মত্ত হতো। তবে মৈথুনের আগে পুরুষদের কণ্ডোম ব্যবহার ছিল বাধ্যতামূলক। সম্ভোগ সেশনে পার্টনার পাল্টান নিত্যকার ঘটনা। সোজা কথায় উৎশৃঙ্খল যৌনাচার ছিল রজনীশ মেডিটেশন সেন্টারগুলোর মূল কাজকর্ম। নানা ধরনের গ্রুপ ধ্যান চলতো পুণে আশ্রমে। সবই আসলে আবাধ যৌনাচার। সম্ভোগ, প্রবচন, ধ্যান ও যোগ নিয়ে যে সব কথা রজনীশ বলতেন, তা সব-ই শেষপর্যন্ত ছিল কথার কথা। আসল কথাটা ছিল তন্ত্রের যথেচ্ছ যৌনাচারের-ই রকম ফের।

শেষপর্যন্ত যা দেখেছি, রজনীশ তন্ত্রের-ই প্রচার করেছেন। এক অতি আধুনিক স্টাইলে ভণ্ডামী বাদ দিয়ে যথেচ্ছ সম্ভোগের প্রচার-ই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যে 'সম্ভোগ ধ্যান' ও 'তন্ত্র'কে জনপ্রিয় করেছে। আর তাতেই কি 'পাবলিক নুইসেন্সে'-এর দায়ে আমেরিকা ওকে বিতাড়িত করল? 'প্রেম' বা 'কাম' যা-ই হোক—ব্যাপারটা যে ব্যক্তিগত এবং একান্ত, তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। খোলা-মেলা নগ্ন নাচ-গান-মিলন অবশ্যই এক যৌন-পাগলামি। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

রজনীশ নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ভালো-ভালো কথা বলেছেন। আর কাজের বেলায় সেই সম্পর্কগুলোকে নিয়ে অত্যন্ত নোংরা খেলায় মেতেছেন। এইসব নোংরা খেলার ক্রীড়াভূমি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা তিনশো 'রজনীশ মেডিটেশন সেন্টার'। এরপর কেউ যদি রজনীশকে একজন বিকৃত মনের প্রতারক বলে ধরে নেন, তাতে আদৌ আপত্তি করার মত কিছু থাকে কি?

অধ্যায় : ছয়

স্বামী রামদেব : সন্ন্যাসী, সর্বযোগসিদ্ধ যোগী, যোগচিকিৎসক!

কে সবচেয়ে বড় যোগী? উত্তর সোজা—যার প্রচার সবচেয়ে বেশি। তুমুল প্রচার যে কোনও প্রোডাক্টকে-ই বিশাল জনপ্রিয়তা দিতে পারে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে শুধুমাত্র ভাল জিনিস তৈরির উপর নির্ভর করলে লাক্স থেকে ক্যাডবেরি, স্যামসুং থেকে মারুতি—সবার-ই বিক্রি পড়বে।
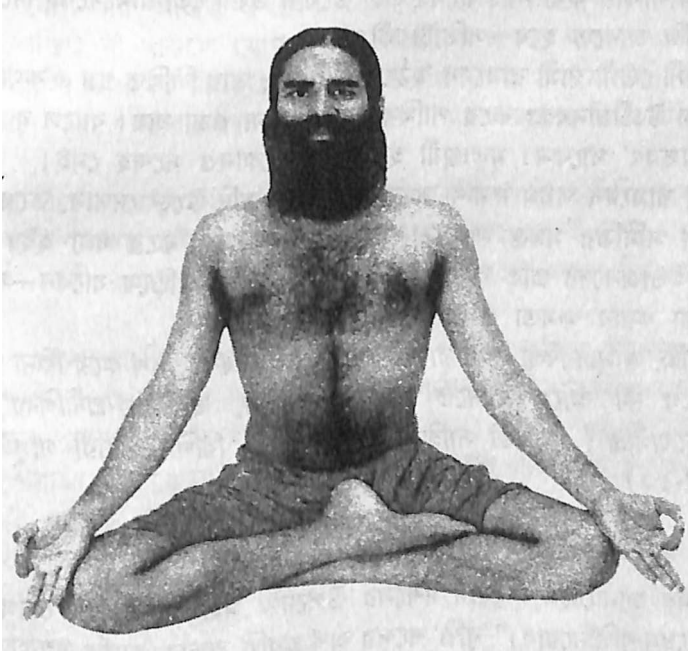
'বিজ্ঞাপন'-এর শক্তি বিষয়ে খুব ভাল বোঝেন সন্ন্যাসী যোগী রামদেব। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির আধার, জাগতিক বিষয়-আসায় থেকে দূরের মানুষ (যেহেতু সন্ন্যাসী)। আবার এক-ই সঙ্গে তুখোড় ব্যাবসায়িক বুদ্ধির অধিকারী। মাত্র কয়েক বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্ট' ভারতের আঙুলে গোনা ধনী ট্রাস্টগুলোর অন্যতম। আজকাল জ্যোতিষীরা পর্যন্ত ট্রাস্ট তৈরি শুরু করেছে। ট্রাস্টের মালিকানা আঙুলে গোনা আপনজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে টাকা আঙুলে গোনাদের হাতের মুঠোয় রইলো, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদির বলাই নেই।

শুধুমাত্র ফলাহারী এই যোগী সন্ন্যাসী সর্বযোগ সিদ্ধ। অতএব স্বামী রামদেব অবশ্যই কোনও দিন-ই মারা যাবেন না। কারণ প্রাচীন যোগশাস্ত্রগুলোতে বলা আছে— খেচরী মুদ্রা যোগসাধনে পারদর্শী হলে তাঁর মৃত্যু নেই।

রামদেবের মৃত্যু হলে এটাই প্রমানিত হবে—হয় রামদেবের দাবি মিথ্যে, নতুবা যোগের কার্যকারীতার কথা মিথ্যে। কিন্তু আরও একটা অপ্রিয় প্রশ্ন থেকে-ই যায়, **স্বামী রামদেব ফল আহার করেন কেন? খেচরী মুদ্রা আয়ত্বে থাকলে তাঁর তো ক্ষিদে, তেষ্টা পাওয়ার কথা নয়। তিনি কি জল পান করেন? যদি করেন, তবে প্রশ্নটা উঠে আসেই—খেচরী মুদ্রা জানা যোগীর তো খাওয়া ও পান করার প্রয়োজন থাকার কথা নয়! তবে?** এই 'তবে'র উত্তর তো রামদেবেই দিতে হবে। সোজাসুজি জানতে হবে—সত্যিটা কী?

সন্ন্যাসী যোগী **স্বামী রামদেব 'হঠযোগ' সিদ্ধ**; তার লিখিত গ্রন্থ এ'কথাই বলে। **হঠযোগে উড্ডীয়ানবন্ধঃ করে পাখির মতো শূন্যে ওড়া যায়।** বয়সে বৃদ্ধ হলেও 'তরুণবয়স্কবৎ' থাকেন। মৃত্যুঞ্জয়ী হন—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

স্বামী রামদেব পরম করুণা করে আমাদের যদি উড়ে দেখান, তবে আমরা যুক্তিবাদী সমিতির সমস্ত সদস্যরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হই। স্বামীজী কি এই অভাজনদের প্রতি কৃপা করবেন? নাকি তিনি এড়িয়ে যাবেন—কারণ যা বলেন তা করার ক্ষমতা নেই বলে?

স্বামীজি, আমরা কিন্তু লক্ষ্য রাখছি, আপনাকে বার্ধক্য স্পর্শ করে কিনা দেখবো। (হঠাযোগে কী আছে জানতে পড়তে পারেন, 'হঠযোগ-প্রদীপিকা', শ্রীমৎ স্বাত্মারামযোগীন্দ্র ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট। কলকাতা-১২)

যোগের সংজ্ঞা কী দিলেন রামদেব?

রামদেব জানাচ্ছেন, "যোগ দর্শনের উপদেষ্টা মহর্ষি পতঞ্জলী যোগ শব্দের অর্থ করেছেন বৃত্তিনিরোধ।" 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ প্রবৃত্তি, স্বভাব। অর্থাৎ সহজাত-প্রবৃত্তি (instinct) নিরোধ।

কিন্তু গোলমালটা পাকালেন রামদেব। তিনি লিখলেন, 'পতাঞ্জলী'র মতে ('পতঞ্জলী' বানানটাই রামদেব লেখেন) বৃত্তি বা প্রবৃত্তি পাঁচটি—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। বৈরাগ্যাদি সাধনা দ্বারা যখন এই পাঁচ প্রবৃত্তি মনে লয় প্রাপ্ত হয় তখন যোগ হয়।

অর্থাৎ রামদেবের কথা মতো, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অবদমিত করে রাখাই 'যোগ'। মনোবিদ্যা বলে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অবদমিত করে

রাখলে মানসিক রোগী হওয়া কে আটকায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অবদমন থেকে-ই তৈরি হয় 'সাইকো-সোমাটিক ডিসঅর্ডার' বা মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ।

সুন্দরী নারী ও সুন্দর পুরুষ দেখে বহু পুরুষ ও নারী স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তির কারণে উত্তেজিত হতে পারে। যারা ওই উত্তেজনা রুচিবোধ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের বলে কামুক। আবার অনেকেই আছেন, যাঁরা চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে গুণের সৌন্দর্যে, মনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন বেশি। এও রুচিবোধ ও মূল্যবোধের ব্যাপার। কিন্তু যারা স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমনের উপদেশ দেন, তাঁরা অবশ্যই একটা সামাজিক অপরাধ করে চলেছেন।

স্বামী রামদেবের কথা অনুসারে মহর্ষি ব্যাস 'যোগ' বলতে সমাধিকে বুঝিয়েছিলেন। সংযমের সঙ্গে সাধনা করে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধির আনন্দে ডুবে যাওয়াই হলো যোগ।

অর্থাৎ 'যোগ'-এর অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর বা পরমাত্মার অস্তিত্ব না থাকলে যোগও নেই। ঈশ্বরীক ক্ষমতা থাকার অর্থ ঈশ্বর আছেন। সন্ন্যাসী রামদেব কি প্রেসকনফারেন্সে আমাদের সামনে তাঁর ঈশ্বরীক ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারবেন? জানি, পারবেন না। অজুহাত দিয়ে এড়াবেন।

গীতাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অনুকূলতা—প্রতিকূলতা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সফলতা-বিফলতা, জয়-পরাজয়...এই সমস্ত অবস্থাকে আত্মস্থ করে এক-ই রকম থাকাকেই যোগ বলে। স্বামী রামদেব-ই তাঁর 'যোগ সাধনা...' গ্রন্থে একথা লিখেছেন।

রামদেব আমাদের তিনটি যোগ সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (এক) সহজাত প্রবৃত্তিকে লয় করাকে পতঞ্জলী যোগ বলেছেন। (দুই) মহর্ষি ব্যাসের মতে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যুক্ত হওয়া-ই যোগ। (তিন) জয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত না হওয়া, পরাজয়ে ভেঙে না পরা, প্রতিকূল ও অনুকূল পরিস্থিতিতে একই রকম স্থির থাকাই যোগ। এটা শ্রীকৃষ্ণের মত।

তিন মত তিন রকম। আমরা কোনটি গ্রহণ করবো? রামদেব এবিষয়ে একদম চুপ।

যোগ কয় প্রকার

স্বামী রামদেব যখন তাঁর গ্রন্থে লিখছেন—'যোগের প্রকার', এখানেও শুধুই দ্বিধা। গ্রন্থে তিনটি পরস্পর বিরোধী মতামত তুলে দিয়েছেন। (১) যোগরাজ উপনিষদে বলা হয়েছে, যোগ চার প্রকার। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ। (২) গীতায় তিন প্রকারের যোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ। আবার গীতায় পঞ্চম খণ্ডে আরও একটি যোগের কথা বলা হয়েছে। সন্ন্যাসযোগ। (৩) মহর্ষি পতঞ্জলী অষ্টাঙ্গ যোগ বা আট প্রকার যোগ

নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যেমন : যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

তার মানে—উষনিষদে, গীতায় ও পতঞ্জলীর কথায় যোগের প্রকার ভেদ নিয়ে রয়েছে বিস্তর ফারাক, আমরা কোন্ দুটি মতকে ভুল বলে বর্জন করবো, এবং কোন্‌টিকে ঠিক বলে গ্রহণ করবো? রামদেব কী বলেন?

না, কিছুই বলেন না। নানা মুণির নানা মত তুলে দিয়েই খালাস।

শরীরে যোগের প্রভাব এবং জীবনযাপনের কিছু বিধি

'যোগ সাধনা এবং চিকিৎসা রহস্য' গ্রন্থ থেকে সন্ন্যাসী স্বামী রামদেবের কিছু অমৃতবানীর সারসংক্ষেপ তুলে দিচ্ছি।

- জৈন মতে আত্মার সিদ্ধি ও মোক্ষ প্রাপ্তি হচ্ছে যোগ। আবার একইসঙ্গে জৈন মতে মন, বাণী এবং শরীরের বৃত্তিগুলোকে-ই বলে কর্মযোগ। (পৃষ্ঠা ১)
- সকালের খাবার গ্রহণের আদর্শ সময়, আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। খাদ্য হিসেবে ফল ও হালকা পানীয় গ্রহণ ভালো। (পৃষ্ঠা ৫)
- পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সের লোকদের সকালে না খাওয়া-ই ভালো।
- মধ্যাহ্ন ভোজের উত্তম সময় এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত সময় মধ্যম। তারপর নিকৃষ্ট সময়।
- রাতের খাবার গ্রহণের উত্তম সময় সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত। আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত মধ্যম সময়। তারপর নিকৃষ্ট সময়।

(গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয়দের গড় আয়ু যেখানে ছিল ৫০ বছরের কাছাকাছি, আজকে তা পৌঁচেছে ৭০ বছরের কাছাকাছি। চিকিৎসা-বিজ্ঞান এগিয়েছে, লাইফ-স্টাইল পাল্টেছে, স্বাস্থ্য-রক্ষার পদ্ধতি পাল্টেছে, এখন বহু রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ৭০ বছর, ৮০ বছর অতিক্রম করেও সক্ষম চিন্তাশীল। এবং তাঁরা ব্রেক ফাস্ট নিচ্ছেন। তারপরও তাঁদের প্রবল উপস্থিতি প্রমাণ করে—সকালের খাবার খাওয়াটা আদৌ খারাপ নয়।

দুপুরের ও রাতের খাবার খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে কোনও শারীর-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করলে ভুল হবে। গ্রামীন সভ্যতার যুগে, প্রদীপ ও লম্প ছিল রাতের অন্ধকার কাটাবার বলতে গেলে একমাত্র সম্বল। অতএব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পরাই ছিল প্রথা। এখন মানুষের জীবন প্রচণ্ড-গতিশীল। দিন-রাতের পার্থক্য প্রায় ঘুঁচতে বসেছে। খাওয়া ও ঘুমের অভ্যেস গেছে পাল্টে। রাতের পর রাত স্যুটিং, বেলা পর্যন্ত ঘুম, জিম, সুষম খাওয়া। তারপরও দারুণ চেহারা নিয়ে বলিউডের নায়করা রামদেবের যোগতত্ত্বের 'মু-তোড়' জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশ্চাত্বের মানুষরা অনেকেই সকালে হেভি

ব্রেকফাস্ট নেন। তারপরও তাঁদের শরীর স্বাস্থ্য গড় ভারতীয় তুলনায় অনেক বেশি ভালো, অনেক নীরোগ। এরপরও কি রামদেব কুয়োর ব্যাঙ হয়ে তাঁর কথাগুলোকেই আঁকড়ে থাকবেন?)

■ খাওয়ার সময় মৌন থেকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। (পৃষ্ঠা ২২)

(বড় রাজনৈতিক নেতারা বা বড়-বড় শিল্পপতিরা' ডিনারে আমন্ত্রণ জানান অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যেও। সৌজন্য-মূলক ডিনারেও ডাকা হয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। সেখানে খাওয়ার চেয়ে আলোচনা অনেক সময় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। রামদেব বোধহয় মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্য এমন সব প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমেধার মানুষরা সকলে মিলে রামদেবের উপদেশ মেনে ভগবান ভরসা করে চলতে গেলে পৃথিবী স্থবির হবে, তারপর পিছোতে থাকবে। ভগবান ভরসায় শিল্প-বাণিজ্য থেকে শিল্প-কলা কোনও কিছুই এক পা'ও এগোবে না।)

■ এক গ্রাস খাবারকে কম করে কুড়ি বার চিবোন উচিত। ভাল করে চিবিয়ে খেলে মন থেকে হিংসার ভাব নিবৃত্ত হয়।

(হিংসা যে চিবিয়ে খেয়ে শেষ করা যায়, এটা কোনও মনোবিজ্ঞানীরা জানা ছিল না। অবশ্যই নতুন তথ্য জানলেন যোগী সন্ন্যাসীর কৃপায়।)

■ ভোজনের শুরুতে 'ওম্'-য়ের স্মরণ বা গায়ত্রী মন্ত্র জপের সাথে তিনবার আচমন করা উচিত। কেন? জানাননি রামদেব।

(পরমেশ্বর খাবারটা জুটিয়ে দিলেন, যাঁর কৃপাতে খাচ্ছি, তাঁকে স্মরণ ও নিবেদন করে খাবার গ্রহণ করা উচিত—এমন ভাবনা থেকে ধর্মগুরুরা এমন শেখান। তাঁরা মনে করেন, 'পরমেশ্বর-ই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটা পাতা পর্যন্ত পড়ে না। যে মানুষ মনে করে, তার প্রয়াস কোনও কিছু ঘটছে, সে মূর্খ। মানুষ যন্ত্র, পরমেশ্বর যন্ত্রী। তিনি যেমন বাজান, আমরা তেমন বাজি।

'মানুষের প্রয়াসের কোনও দাম নেই'—এমন বোকা-বোকা ভাবনার কথা যে সাধু-সন্ন্যাসীরা মানুষের মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করে, তারা নিজেরা কিন্তু আখের গোছাবার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যায়।)

■ মাংস খেলে দয়া, করুণা, প্রেম ইত্যাদি গুণ ধ্বংস হয়। **মানব তখন দানব হয়ে ওঠে।** (পৃষ্ঠা ৫)

(গুজরাট দাঙ্গায় নিরামিষাশী মানবরা কী করে দানব হয়ে উঠে মুসলিম ধর্মের মানুষদের জ্যান্ত পোরালো, ধর্ষণ করলো, লুঠ করলো? নিরামিষ বা আমিষ খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে মানবিকগুণের বিকাশ নির্ভর করে না। সুস্থ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদি একজন মানুষকে মানবিকগুণে সমৃদ্ধ করে। রামদেবজী ভুল শিখিয়েছেন, একথা আমাদের বলতে-ই হবে।)

■ পেঁচা আর বাদুড় ছাড়া সব পাখিরা ব্রহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে পরমেশ্বরকে স্মরণ করে নিজের নিজের কাজে লেগে পড়ে। পাখিরা ভোরে ভগবানের স্তব গান গায়।

(এবার রামদেব বড়-ই কাঁচা কাজ করে ফেললেন। গল্পের গরুকে গাছে তোলার চেয়েও বড় মাপের গপ্পো ফেঁদেছেন। জীববিজ্ঞানী বা পক্ষিবিষারদরা এ গপ্পো শুনলে রামদেবের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে-ই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে 'ধর্ম-ব্যবসায়ী' বিবেচনায় পাত্তা না দিয়ে নীরব থাকতে পারেন।)

■ রোগীকে বাদ দিয়ে ঠাণ্ডাজলে স্নান করা উচিত। গরম জলে স্নান করলে ক্ষুধামন্দ, দৃষ্টি-দুর্বলতা দেখা দেয়, চুল পড়ে, অকালে চুল পাকে, বীর্য-কমে যায়।

(শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীরা ঈষৎ গরম জলে স্নান করেন। তাঁরা সবাই ক্ষুধামন্দে ভোগেন, দৃষ্টি-দুর্বল, টোকো এবং বীর্য কম—এমন ভাবলে 'পাগল' বা মূর্খ বলতে-ই হয়। পাশ্চাত্বের অধিবাসীরা শুধু নন, প্রাচীন সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গড়ে ওঠা দেশের অধিবাসীরা, চিন, জাপান, কোরিয়ার মত শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা ঈষৎ গরম জলে স্নান করেও গড় ভারতীয় তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান, ক্ষুধামন্দে ভোগেন না, দৃষ্টিশক্তি ভালো এবং অবশ্যই অনেক বেশি বীর্যবান। অতএব রামদেবের এই গরমজলে স্নানের অপকারিতার তত্ত্ব সম্পূর্ণ বাজে কথা।)

■ শরীর খাদির তোয়ালে দিয়ে মোছা উচিত। এতে কান্তি বাড়ে। (পৃষ্ঠা-৭)

(সৌন্দর্য বৃদ্ধির এমন প্রেসক্রিপসন নিয়ে বলার কিছু নেই।)

যোগ নিয়ে আরও কিছু...

■ যোগ পথকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। (পৃষ্ঠা-৩)

■ বিনা ব্রহ্মচর্য-পালনে কেউ যোগী হতে পারে না। (পৃষ্ঠা-১৭)

■ কমনা-বাসনাকে উত্তেজিত করে তোলে এমন কিছু দেখবে না, শুনবে না, খাবে না, শৃঙ্গার করবে না। সর্বদা বীর্য রক্ষা করবে।

*(আর টিভি দেখা নয়। টিভিতে নাচ-গান-সিনেমা তো নয়-ই, এমনকী খেলা দেখতে দেখতে নিজের প্রিয় দলের জয় কামনা করাও চলবে না। বীর্য রক্ষাকে যারা ব্রত করতে চায়, তাদের বিয়ে করে আর একটা জীবন নষ্ট করার কোনও অধিকার নেই। **রামদেবের মতো এমন জ্ঞানীদের দেওয়া জ্ঞানের চোটেই ভারতে মানসিক কারণে পুরুষত্বহীনের সংখ্যা প্রচুর।**)*

■ ব্রহ্মচারী হতে গেলে আটটি বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়। যথা ঃ—খোলাধূলা, একান্তে খাওয়া, বিষয়-আশায় নিয়ে কথা বলা, ভাষণ, মৈথুন-বাসনার দৃষ্টিতে দেখা, স্পর্শ করা এবং মৈথুন করা। এগুলোকে আট প্রকার

মৈথুন বলে বর্ণনা করেছেন রামদেব।

(সব্বাই পরমাত্মা পেতে খেলাধূলো ছেড়ে ব্রহ্মচর্য পালন করলে পৃথিবীর খেলার জগতের কী হবে—ভাবতেই শিউড়ে উঠছি। পৃথিবী তো মানব শূণ্য হলো বলে!)

■ কাম ও ক্রোধ অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের শরীরকে শক্তিহীন এবং কান্তিহীন করে দেয়।

(ঠিক কথা। এইজন্যেই সিনেমাস্টার ও মডেল পেশার ছেলে-মেয়েদের অমন বিশ্রী দেখতে, অমন কান্তিহীন! আর বক্সার থেকে রেসলার, প্রতেকেই ক্রোধের কারণে কী ভয়ংকর রকমের শক্তিহীন, ল্যাগব্যাগে প্যাকাটি, তা তো টিভির কল্যানে কোলের শিশুটি পর্যন্ত জেনে গেছে।)

■ জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধণা।

(রবীন্দ্রনাথ থেকে আইনস্টাইন, প্রত্যেক স্রষ্টাই সৃষ্টিকে সধনার অঙ্গ করে ভুল করেছিলেন, বুঝলাম।)

■ মিথ্যা কখন বলবে, তার একটা সুনির্দিষ্ট নীতি আছে। কোনও ব্রাহ্মণ এবং গরু ইত্যাদি রক্ষার জন্য এ মিথ্যা বলবে। এটা হলো 'জাতি পরক' মিথ্যা। হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থে বা গুরুকুলে, মঠে বা মন্দিরে, গুরুদ্বারে, মসজিদে এবং গীর্জায় সত্য বলবে। ব্যবসায়ী কাজে এবং আদালতের কাজে অসত্যও বলবে। (পৃষ্ঠা-১২)

(গুরু, তোমার নীতিবোধ—'লা-জবাব!')

■ মন, বুদ্ধি এবং আত্মার শুদ্ধির জন্য ঋষিদের বলা উপদেশ গ্রহণ করতেই হবে।

("গ্রহণ করতেই হবে" অর্থে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে হবে। স্বামী রামদেবের উপদেশবালী বা কথিত বাণীকেও যে মনের, বুদ্ধির ও আত্মার শুদ্ধির জন্য বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে হবে—সে কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন রামদেব।)

■ ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের প্রয়োজনের বেশি-ই রূপ, যৌবন, ধন, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত বৈভব প্রদান করেন। (পৃষ্ঠা ১৩)

(ভারতের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি লোক গরীব। শতকরা ৩০ ভাগের বেশি আছেন দরিদ্রসীমার নীচে। এঁদের না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, পানীয় জল, পরনের কাপড়, চিকিৎসার সুযোগ, শিক্ষালাভের সুযোগ এবং দু-বেলা ভাত-রুটির সংস্থান। অপুষ্টিতে ভোগা রুগ্ন, রুক্ষ্ম মানুষগুলোকে ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনের বেশি-ই দিয়েছেন যাঁরা বলেন, তাঁরা অবশ্যই সমাজের শত্রু।)

তপ বা তপস্যা

নিজের সৎ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতে যে কষ্ট, বাধা, প্রতিকূলতা আসবে, তাকে সহজ ও অবিচল ভাবে গ্রহণ করাই 'তপ' বা 'তপস্যা'। এই সংজ্ঞা দিয়েছেন মহর্ষি ব্যাস।

মহাভারতেও 'তপ' বা 'তপস্যা'র সংজ্ঞা দেওয়া আছে। যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তপ' কী? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে সহ্য করে স্বধর্ম পালন-ই তপ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঠাণ্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান,

স্তুতি-নিন্দা, জয়-পরাজয় ইত্যাদিকে যে সহজভাবে গ্রহণ করে নিরন্তন স্বধর্ম পালন করে, সেই প্রকৃত তপস্বী। এক পায়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকা বা শরীরকে কষ্ট দেওয়া তপস্যা নয়।

যোগীর সান্নিধ্যে সাপ, বাঘও হিংসা ভোলে

যোগী পুরুষ কখনই কারও প্রতি হিংসাভাব বা শত্রু ভাব বজায় রাখে না। সে সমস্ত প্রাণীর প্রতি-ই প্রেমময়। যোগী পুরুষের সান্নিধ্যে এলে শুধু মানুষ নয়, বিছে, সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীরাও হিংসা ত্যাগ করে।

সত্যাচরণ করা যোগী বাকসিদ্ধ হন

সত্যাচরণ করা যোগী বাকসিদ্ধ হন। যে ব্যক্তি সত্য বলে, সত্য আচরণ করে, তাঁর কথা অমোঘ হয়ে ওঠে। সত্যবাদী যোগীদের মধ্যে বিরাট বড় শক্তি হল এই যে, যা বলেন তা-ই ফলে, সত্যি হয়ে যায়।

প্রাণায়াম

আসনে সিদ্ধ হয়ে উঠলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রাণায়ম বলে। প্রাণয়ম চার প্রকার। (১) বাহ্যবৃত্তি, (২) আভ্যন্তরবৃদ্ধি (৩) স্তম্ভবৃত্তি (৪) বাহ্যভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী।

বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম

আসনে বসে শ্বাস বের করে শ্বাসকে যথাশক্তি বাইরে আটকে রাখুন। প্রশ্বাস ভিতরে নিয়ে সেটাকে আটকে না রেখে বের করে দিন এবং আবার শ্বাসকে বাইরে আটকে রাখুন।

এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন। এতে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। পেট ভাল থাকে। ক্ষিদে ভাল হয়। বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও তীব্র হয়।

আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম

আসনে বসে শ্বাসকে বাইরে বের করে আবার যতটা পারেন প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু টেনে নিন। বুক ফুলে উঠবে এবং পেট ভেতরের দিকে সঙ্কুচিত থাকবে। যতক্ষণ সম্ভব বায়ুকে ভেতরে আটকে রাখুন। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন।

এতে ফুসফুসের সব রোগের আরোগ্য হয়। হাঁফানি ভালো হয়। শরীরের শক্তি, তেজ ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

স্তম্ভবৃত্তি

শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তারপর বের করে দিন। এভাবে কয়েকবার করুন।

এই প্রাণায়াম কী ফল লাভ করা যাবে, লেখেননি রামদেব।

বাহ্যভ্যন্তর বিষয়ক্ষেপী

যখন শ্বাস ভিতর থেকে বাইরে আসবে, তখন একটু একটু করে আটকে আটকে ছাড়ুন। আবার বায়ু যখন ভিতরে টানবেন, তখনও একটু একটু করে আটকে আটকে টানুন।

এতে বীর্যবৃদ্ধি হয়, পরাক্রমী ও জিতেন্দ্রিয় হয়। শাস্ত্র খুব কম সময়ের ভিতর বুঝতে পারে।

প্রাণায়ামের 'শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ' : বিরাট ধাপ্পা

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রিত করাকে 'প্রাণায়াম' বলে—এটা রামদেব থেকে সব যোগীদেবদের-ই কথা। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি হিসেবে রামদেব থেকে ব্যারামদেব প্রায় প্রত্যেকেই এক-ই পদ্ধতি শেখান। একটি নাসারন্ধ্র বা 'ন্যাসেল প্যাসেস' আঙুল চেপে বন্ধ করে খোলা নাসারন্ধ নিয়ে প্রশ্বাস নিন ও নিশ্বাস ছাড়ুন। এমন কিছুক্ষণ করার পর (মিনিট পাঁচেক) অন্য নাসারন্ধ্র আঙুল চেপে বন্ধ করুন এবং খোলা নাসারন্ধ দিয়ে প্রশ্বাস নিন, নিশ্বাস ছাড়ুন। এমনি চালান মিনিট পাঁচেক।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের এই নিয়ন্ত্রণ বা 'প্রাণায়াম' হলো 'সোনার পাথরবাটি'। কেন 'সোনার পাথরবাটি'? বুঝতে আমাদের 'অ্যানাটামি' বা মানবদেহের গঠনতন্ত্রকে বুঝতে হবে।

নাসিকা-পথ বা 'ন্যাসেল প্যাসেস' দিয়ে প্রশ্বাস শেষ পর্যন্ত শ্বাসনালী বা 'ল্যারিংক্স্'-এ যায়। শ্বাসনালী দিয়ে প্রশ্বাস যায় ফুসফুসে। এবং ফুসফুস থেকে 'ল্যারিংক্স্' হয়ে নিশ্বাস নাসিকাপথ দিয়ে বের হয়।

নাকের ফুটো বন্ধ করে শ্বাসনালী দিয়ে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন চিন্তা চূড়ান্ত মূর্খতা। কারণ দুটি নাসিকা-পথ এসে মিশেছে শ্বাসনালীতে। শ্বাসনালী একটা; দুটো নয়। সুতরাং কোনও নাসারন্ধ্র টিপে বন্ধ করে একদিকের শ্বাসনালী বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তার মধ্যে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু-ই নেই।

শেষ পর্যন্ত প্রাণায়ামের 'শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ' এক বিরাট ধাপ্পা, যা বোকাদের বাজারে ভালো-ই বিকোচ্ছে।

ধ্যান

নাভিচক্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃদয়ে ইত্যাদিতে প্রত্যয়ের সঙ্গে পরমেশ্বরকে ধারণা করাই 'ধ্যান'।

ধ্যানের আগে প্রাণায়াম অতি অবশ্যই করুন। কারণ প্রাণায়াম মনকে অকাগ্র ও শান্ত করে।

প্রাণায়াম নিয়মমত করলে মূলাধার চক্রে ব্রহ্মের দিব্যশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে, উর্ধগামী হয়, সমস্ত চক্র ও নাড়ির শোধন হয়। আজ্ঞাচক্রে মন অবস্থিত হতে থাকে।

ধ্যানের সময় শুভ কাজ গুরু সেবা এবং গরু সেবাতেও মন দেবেন না। ধ্যানের সময় মন দেবেন শুধু ঈশ্বর চিন্তায়।

ধ্যানের আগে মনে মনে এমন ভাবুন যে, ধন, ঐশ্বর্য, সম্পত্তি, ভার্যা, পুত্র, আত্মীয় ইত্যাদির রূপ নেই। আমার শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিত হয়েছে।

সাধকের মনে থাকবে বৈরাগ্য। শুভ কাজকে ভগবানের সেবা মনে করবে। ফলের প্রত্যাশা করবে না।

বাহ্য-সুখ হলো দুঃখরূপ। যতক্ষণ সংসার সুখে মগ্ন থাকবে, ততক্ষণ সমাধিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

সাধককে ঘুমোবার সময় ধ্যান করে ঘুমনো উচিত। এমন করলে নিদ্রাও যোগময় হয়ে ওঠে ; যাকে বলে যোগনিদ্রা।

প্রত্যেক সাধকের প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘন্টা জপ, ধ্যান এবং উপাসনা অবশ্যই করা উচিত।

সমাধি

পরমেশ্বরের ধ্যান করতে করতে সাধক ওম্‌কার ব্রহ্ম পরমেশ্বরের সঙ্গে তন্ময় হয়ে যান। ভুলে যান নিজের অস্তিত্ব। ডুবে যান দিব্য আনন্দের অনুভবে। এটাই স্বরূপ শূন্যতা। এটাই সমাধি।

প্রাচীন শবাসন + স্বসম্মোহন দ্বারা রিল্যাকসেশন = রামদেবের শবাসন।

যোগের আকর গ্রন্থগুলোতে 'শবাসনম্' বলতে যা বোঝায় তা এখানে তুলেদিলামঃ

"উত্তানং শববদ্ ভূমৌ শয়নং তচ্ছবাসনম্।

শবাসনং শ্রান্তিহরং চিত্তবিশ্রান্তিকারকম্॥" (শ্লোক ৩৫)॥

বঙ্গার্থ। উর্দ্ধমুখ (চিৎ) হইয়া শবের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিলেই শবাসন হয়। এই শবাসন দৈহিক যোগশ্রম হরণ করে এবং চিত্তের বিশ্রামসুখ জন্মায়॥ ৩৫॥

(হটযোগ-প্রদীপিকা)

এখানে বঙ্গার্থ যা তুলে দেওয়া আছে, তা 'হটযোগ-প্রদীপিকা' থেকে অর্থ স্পষ্ট। তাই 'শবাসন'-এর অংশটিকে টেনে বাড়াতে ভাবসম্প্রসারণে নামার একটুও ইচ্ছে হলো না।

কেউ কেউ যোগের 'শবাসন' শেখাতে গিয়ে তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের 'রিল্যাকসেশন' বা 'মেডিটেশন' পদ্ধতি জুড়ে দিতে চাইছেন। তবে ভুল ভাবে। এই যেমন বাবা রামদেব? তাঁর শেখান 'শবাসন' পদ্ধতি না প্রাচীন যোগের শবাসন পদ্ধতি না প্রাচীন যোগের শবাসন, না আধুনিক 'রিল্যাকসেশন'। দু'য়ে মিলে এক হাঁসজারু।

স্বামী রামদেবের যোগের বইটিতে প্রচুর বিচ্ছুতি আছে। 'চাপা ও ছাপা' মুন্সিয়ানায় হলদে সাংবাদিকতা মত বদ্-গন্ধ আছে। তবু আসুন দেখি রামদেব শবাসন বলতে কী বলেছেন।

রামদেবের শবাসন পদ্ধতি

মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। দু'পায়ের পাতার মাঝে এক ফুট ফাঁক রাখুন। হাত দুটো শরীরের সঙ্গে ছুঁইয়ে না রেখে একটু দূরে রাখুন। হাতের পাতা রাখবেন উপরের দিকে খুলে। চোখ বন্ধ করুন। ঘাড় সোজা রাখুন। গোটা শরীর শিথিল অবস্থায় থাকবে। এবার ধীরে-ধীরে লম্বা-লম্বা প্রশ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন।

মনে মনে চিন্তা করতে থাকুন আপনার দু'পায়ের বুড়ো আঙুলের কথা। ভাবতে থাকুন বুড়ো আঙুল দুটো শিথিল অবস্থায় পড়ে আছে। এরপর ভাবতে থাকুন পায়ের পাতা ও গোড়ালির কথা। অনুভব করতে থাকুন, পায়ের পাতা ও গোড়ালি দুটো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। একই ভাবে শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে পরপর ভাবতে থাকুন পায়ের ডিম, পায়ের হাঁটু, উরু, কোমর, পেট, পিঠ, হৃদয়, ফুসফুস, বহু, কনুই, কব্জি, দু'হাতের আঙুল। এবার ভাবুন নিজের মুখ নিয়ে। ভাবুন, আমার মুখে কোনও টেনশন নেই, নিরাশা নেই। মুখে ছড়িয়ে পড়েছে প্রসন্নতা ও আনন্দের ভাব। আমি শুদ্ধ নির্মল, আনন্দময়, আমি অমৃত-পুত্র আত্মা। আমার আত্মা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছে।

এবার চিন্তা করুন, আপনার আত্মা শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর শরীরটা শব হয়ে শুয়ে আছে। "**এজন্য এই স্থিতিকে শবাসন বলে।**"

আবার ভাবতে শুরু করুন, আত্মা শরীরে প্রবেশ করছে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

শবাসনে লাভ

১. মানসিক টেনশন, উচ্চ রক্তচাপ দুর হয়। অনিদ্রা দূর করতে সেরা আসন। হৃদরোগীদের পক্ষে ভালো।

২. ক্লান্তি ও স্নায়ু-দুর্বলতা দূর হয়।
৩. শরীর মন, মস্তিষ্ক, আত্মা পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে।

যোগ সাধনায় 'মুদ্রা' ও রোগমুক্তি

শাস্ত্রে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে মুদ্রার সমান সফলতা প্রদানকারী আর কোনও কর্ম নেই।
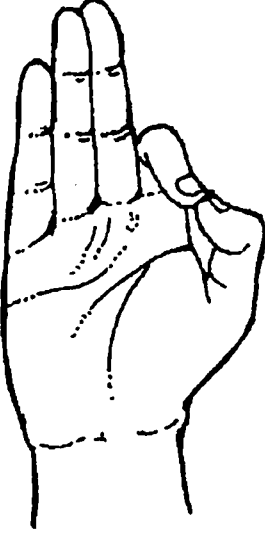
১। জ্ঞান মুদ্রা বা ধ্যান মুদ্রা

এই মুদ্রায় একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে। মস্তিষ্কের স্নায়ু মজবুত হয়। অনিদ্রা ও টেনশন দূর হয়। ক্রোধের নাশ ঘটে।

২। বায়ু মুদ্রা

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে গেঁটে বাত, সন্ধিবাত, আর্থারাইটিস, সাইটিকা, হাঁটুর যন্ত্রণা, পক্ষঘাত, ঘাড় এবং মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা দূর হয়।
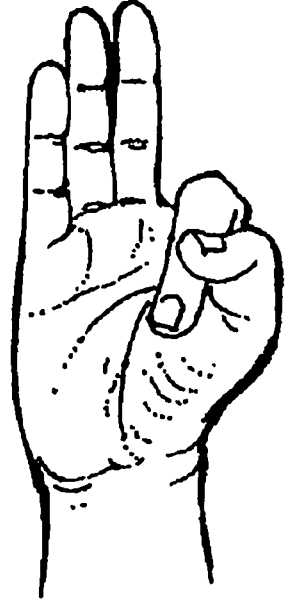
৩। শূন্য মুদ্রা

এই মুদ্রার কমপক্ষে এক বছর এক ঘন্টা করে করলে কানে কালা, কম শোনা, কানে যন্ত্রণা ইত্যাদি দূর হয়। অস্থিরতা, দুর্বলতা এবং হৃদয় রোগ ঠিক হয়। মাড়ি গলা ও থাইরয়েড রোগে উপকার পাওয়া যায়।
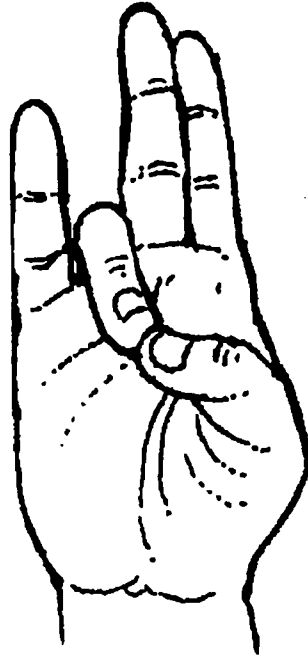
৪। পৃথ্বী মুদ্রা

এই মুদ্রার অভ্যাসে মেদবাহুল্য কমে, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।
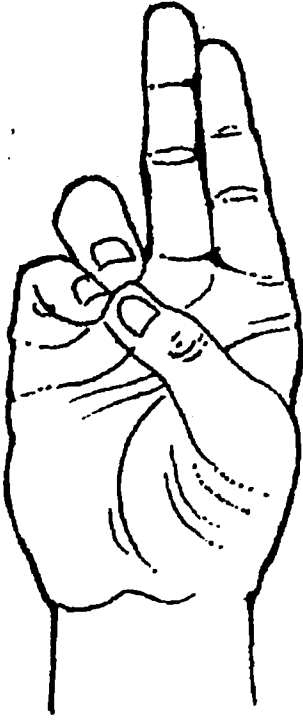
৫। প্রাণ মুদ্রা

এই মুদ্রা দ্বারা চোখের রোগ ভালো হয়। নেত্র-জ্যোতি বাড়ায়।

৬। আপনি মুদ্রা

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিজ, কিডনির রোগ, অর্শ, দন্ত রোগ ভালো হয়।
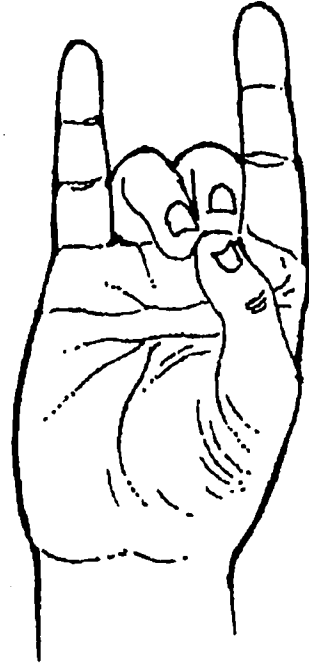
৭। আপনি বায়ু মুদ্রা

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রা করলে আরাম পাওয়া যায়। হার্টের রোগ, বাত রোগ, পেটে গ্যাস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, মাথা ব্যথা আরোগ্য করে।
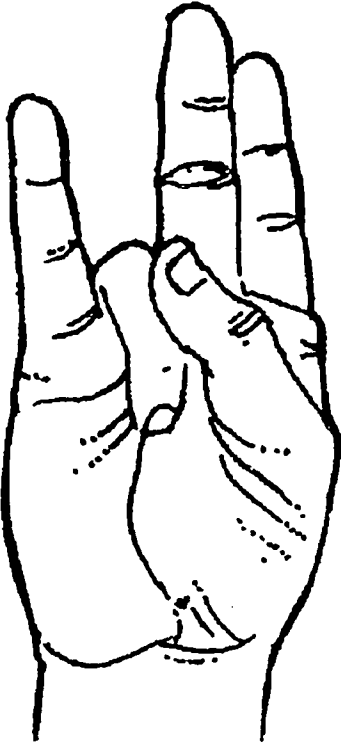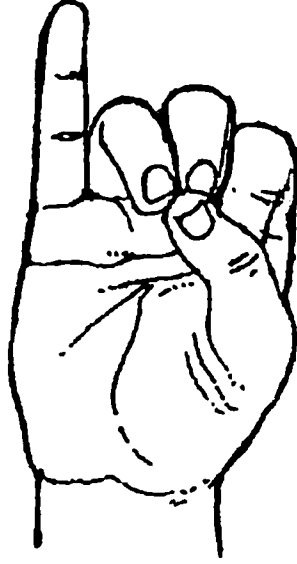
৮। সূর্য মুদ্রা

এতে টেনশন কমে, ওজন কমে, শরীরে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৯। বরুণ মুদ্রা

এই মুদ্রায় ত্বকের রুক্ষতা দূর হয়, চর্ম রোগ ভালো হয়।
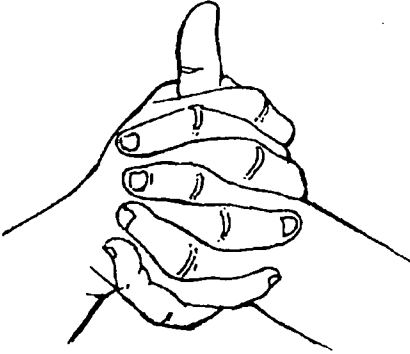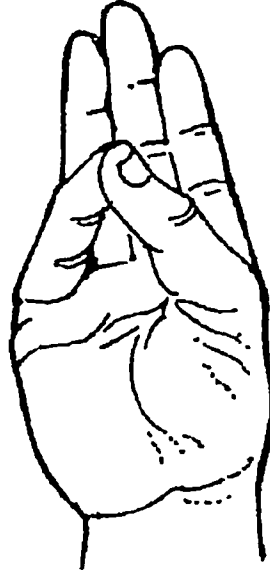
১০। লিঙ্গ মুদ্রা

এই মুদ্রা অভ্যাসে সর্দি, কাশি, সাইনাস, হাঁপানি, নিম্ন রক্তচাপ ও পক্ষাঘাত দূর হয়।

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে জল, ফলের রস, দুধ, ঘি বেশি করে খেতে হয়।

১১। ধারণা শক্তি মুদ্রা

রক্ত ও শরীর বেশি পরিমাণে শক্তি পায়।
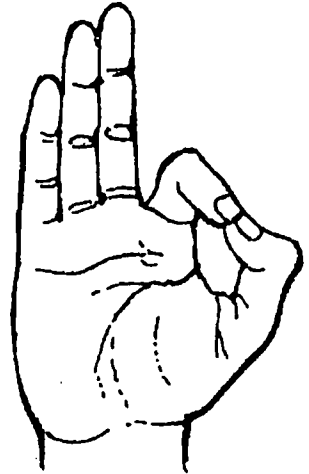
স্বামী রামদেব কি সত্যি-ই যোগ-সমাধি-মুদ্রা ইত্যাদির কার্যকারিতায় বিশ্বাস করেন? তিনি নিজে যদি 'প্রাণ মুদ্রা' করে নিজের বাঁ চোখের অসুখ সারিয়ে তুলতেন, তবে তাঁর অন্ধভক্তরা স্বস্তি পেতেন।

দুষ্টু পাবলিকের তো অভাব নেই। তাঁরা বলছেন, যে সবার সব রোগ যোগে-মুদ্রায় সারিয়ে দেবে বলে দাবি করে, আর নিজেই রোগে ভোগে, তার কথায় কে বিশ্বাস করবে?

হাতের তালু, পায়ের তালু টিপে যে কোনও রোগ সারান

হ্যাঁ শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এমনটা-ই বলেছেন স্বামী রামদেব। তাঁর বইয়ে লেখা আছে, হাতের এবং পায়ের বিভিন্ন অংশ আসলে শরীরের ভিতরের লিভার,
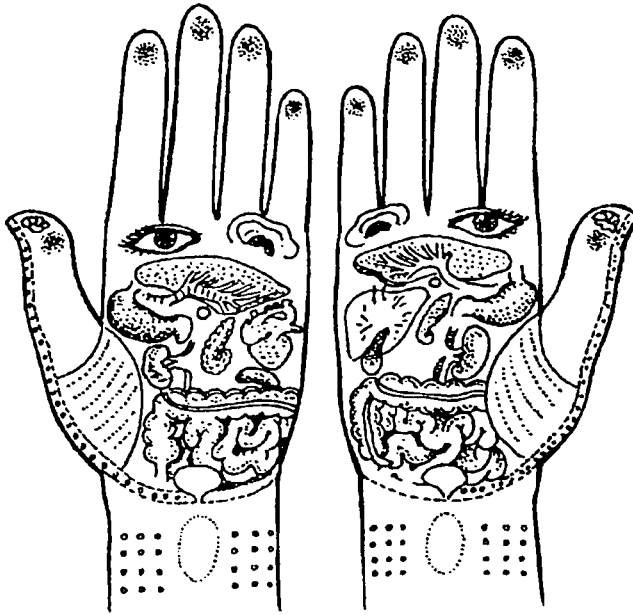
হার্ট, কিডনি, লাং, স্টমাক, নাক, কান, গলা, ঘাড়, চোখ, মস্তিষ্ক ইত্যাদির প্রতিনিধিত্ব করছে। রোগীর চোখ, কিডনি বা মস্তিকে ইত্যাদি যে অংশে রোগ বিস্তার করেছে, সেই অংশের প্রতিনিধি বিন্দুগুলোতে ৩০ সেকেণ্ড থেকে ২ মিনিট পর্যন্ত চাপ দিতে হবে। চাপ এমনভাবে দিতে হবে যাতে রোগী চাপ অনুভব করবে, কিন্তু ব্যথা অনুভব করবে না।

এতো দেখি—'পায়ে মারলো লাথি, চোখ হল কানা' গল্পের মতো ব্যাপার।
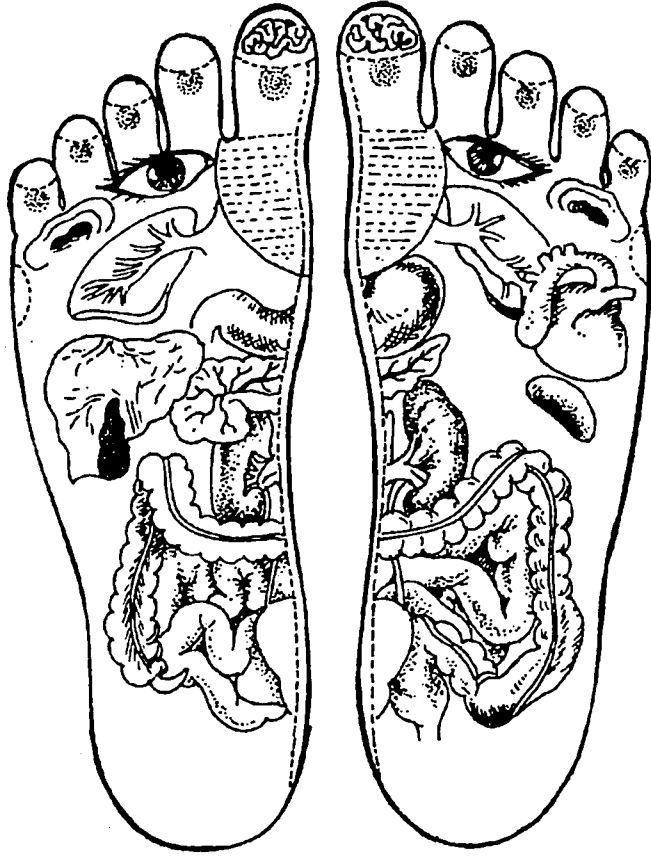
NDTV ইন্ডিয়া-র 'মুকাবলা' অনুষ্ঠানে রামদেব ও আমি

৭ জানুয়ারি ২০০৬, রাত ১০ টা থেকে ১১-৩০ পর্যন্ত পাক্কা দেড় ঘন্টা চললো 'মুকাবলা'। চ্যানেলের নাম— 'NDTV ইন্ডিয়া'। মুখ্য চরিত্রের বাবা রামদেব এবং আমি। আমাকে কয়েক ঘন্টার নোটিশে প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল NDTV ইন্ডিয়া। অনুষ্ঠানের আগের দিন সকাল থেকে অনুষ্ঠানের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত টিভি স্ক্রিনের তলায় বিজ্ঞাপন চলেছে 'মুকাবলা'র।

অনুষ্ঠানে শ'খানেক দর্শক। সঞ্চালক ছিলেন দেবাং। চার রাউন্ডের অনুষ্ঠান। আলোচক আমরা দু'জন ছাড়াও ছিলেন আরও ছ'জন। সঞ্চালক ছাড়া সব্বাই রামদেবের পক্ষে। আমার পক্ষে একজনকে পেলাম। তাও শুধু প্রথম রাউন্ডে। তিনি হলেন সুহেল শেঠ।

আমার আক্রমণ বা বক্তব্য ছিল যোগ'কে কেন্দ্র করে। রামদেবের লেখা বই 'যোগ সাধনা...' দেখিয়ে বলেছি, এটা আপনার লেখা, প্রকাশকও আপনি। এই

বইতে বিভিন্ন আঙুলের মুদ্রার ছবি দেখিয়ে জানিয়েছেন, এইসব মুদ্রায় কী কী অসুখ সারে।

আপনি জানিয়েছিল, প্রাণ মুদ্রায় চোখের অসুখ সারে। আপনার বাঁ চোখের অসুখ কেন 'প্রাণ মুদ্রা' করে সারাচ্ছেন না?
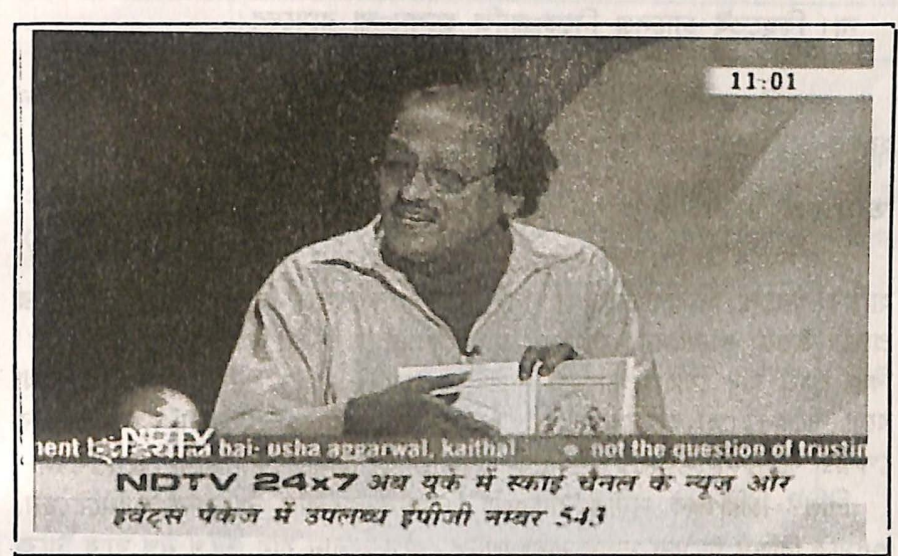
হলের শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়লেন। আর রাগে ফেটে পড়লেন রামদেব। আমাকে চোখা-চোখা ভাষায় গাল-মন্দ-অপমান শুরু করলেন।

আমি বললাম, রামদেবজী, আপনি আপনার বইতেই লিখেছেন, সেই যোগী যে জয়-পরাজয়, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সফলতা-বিফলতা, আনন্দ-শোকে অচঞ্চল থাকে। আপনি যে ভাবে রেগে গেলেন, তাতে প্রমাণ হল, আপনি যোগী নন।

আলোচনা আর টেনে লম্বা করবো না। শুধু বইটি থেকে দুটি হাত আর পায়ের ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, এটা কখনও হতে পারে যে, হার্টের অসুখে বা হার্ট স্ট্রোকে রোগীর পায়ের আঙুলের গোড়া টিপলে রোগী ভাল হয়ে যাবে?

রামদেব বললেন, তাঁর কাছে নাকি দশ হাজার রোগীর তালিকা আছে, যাদের যোগে রোগ মুক্ত করেছেন। নখে নখ ঘষে টাকে চুল গজান যায়—ইত্যাদি।

এরপর একটা সোজাসাপটা চ্যালেঞ্জ রাখি। একজন রোগী দেবো, যে মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে ভুগছে না। তাঁকে রামদেব নিজের আশ্রমে রেখে যোগে সারিয়ে দিন। আর দিল্লির একজন টেকো মানুষ ওঁর কাছে তুলে দেবো। ওর টাকে চুল গজিয়ে দিন গ্রাফটিং না করে।

সঞ্চালক দেবাং বার বার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে আনলেন আমার চ্যালেঞ্জ। বললেন, প্রবীরজী আপনার দেওয়া সংখ্যাতত্ত্বে সন্তুষ্ট নন। উনি বলছেন,

তান্ত্রিক থেকে জ্যোতিষীরাও এমন হাজার হাজার রোগী সারাবার দাবি করেন। কথা না বাড়িয়ে বলুন, আপনি কি প্রবীরজীর দেওয়া একজন রোগীকে আপনার আশ্রমে রেখে সারিয়ে তুলবেন? একজন টেকো লোকের মাথায় চুল গজিয়ে দেবেন?

না। কিছুতেই চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি হলেন না রামদেব।

পরের দিনও দুপুর ২-৩০ থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত 'মুকাবলা' আবার দেখান হয়।

'আজতক' নিউজ চ্যানেলে আবার চ্যালেঞ্জ

৯ জানুয়ারি ২০০৬। 'আজতক' নিউজ চ্যানেল এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটালো। হাজির করলো আমার চ্যালেঞ্জ। বিশিষ্ট্য যোগবিশেষজ্ঞ হিমাদ্রি সমাদ্দার আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, যোগাসন বা যোগব্যায়ামে শরীর সুস্থ থাকে; এই পর্যন্ত। কিন্তু কেউ যদি যোগে গ্যারান্টি দিয়ে যে কোনও রোগ সারিয়ে দেওয়ার কথা বলে থাকেন, তো বলবো ঠিক কথা বলেননি। তারপর শুধু 'নৌলি' বা পেটের পেশীর যা সঞ্চালন করে দেখালেন হিমাদ্রি তা রামদেবের পক্ষে অসম্ভব।

বিশিষ্ট চিকিৎসক সুনীল ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম, রামদেব জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বিভিন্ন হাতের মুদ্রায় নানা জটিল রোগ সারান যায়, নখে নখ ঘষে টাকে চুল গজান যায়, হাতের বা পায়ের তালুর বিভিন্ন অংশ টিপে যে কোনও রোগ সারান যায়। আপনি কী বলেন?

ডাক্তার ঠাকুর রামদেবের এমন দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। আমার দেওয়া একজন রোগী একজন টেকোকে ঠিক করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল 'আজতক'। রামদেব একদম চুপ!

১০ জানুয়ারি খড়গপুর বইমেলায় যেতে-যেতেই শুনলাম, এই শহরে প্রায় সবাই নাকি রামদেবের যোগ দেখেন টিভি খুলে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দর্শকদের বেশির ভাগই চাইলেন 'রামদেব কিস্‌সা' শুনতে।

মজা করে বলছিলাম। দেখলাম কী বিপুল ভাবে উল্লাস প্রকাশ করে আমাকে সমর্থন জানাচ্ছেন হাজার হাজার দর্শক।

বুঝলাম, এখনও মানুষ যুক্তির দিকেই ঝোঁকেন। আশার আলো দেখলাম, এখনও পাল্টা প্রোগ্রামিং করা যায় মানুষের মস্তিষ্কে।

অধ্যায় : সাত

শ্রীমাতাজী নির্মলা দেবীর সহজযোগ

শ্রীমতাজী নির্মলা দেবীর'র সেই রমরমা আর নেই। মাতাজী তাঁর গৌরব হারিয়েছেন। দীর্ঘ বছর ধরে লক্ষ্য করে আসছি যে, জ্যোতিষীদের মতো-ই যোগীদের উত্থান-পতন পুরোপুরি প্রচার নির্ভর। গত শতকের সাতের দশকের

মাঝামাঝি থেকে ছিল রজনীশের উত্থানের যুগ। ন'য়ের দশক পর্যন্ত তাঁর রমরমা ছিল অপ্রতিরোধ্য। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও তিনি ছিলেন, যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর টার্গেট কনজিউমাররা ছিলেন বেশির ভাগই কোটিপতি।

'আস্থা' চ্যানেল রাজারে নামলো। স্যাটেলাইট চ্যানেল। তাতে রজনীশকে নিয়ে মার্কেটিংয়ে নামলো 'ওশো কমিউন ইন্টারন্যাশনাল'। পুরোপুরো প্রফেশনাল মেজাজে প্রচারে নামলেও রজনীশের জীবনকালে টিভি-র ফটোগ্রাফি থেকে এডিটিং কোনওটাই এখনকার মতো উন্নত পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। তবু ওশো'র কথনভঙ্গী, চেহারা ও চোখ দর্শকদের মনে একটা অদ্ভুত আবেশ বা ভাবাবেগ তৈরি করেছিল। তাঁর যোগের নাম দিয়েছিলেন, 'আর্ট অফ লিভিং'।

মাত্র বছর তিন-চার হলো প্রচারে এলেন স্বামী রামদেব। তিনি ওশোর মতো হাই-ফাই ভক্ত বা কনজিউমারদের দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা না করে, চেষ্টা করলেন ১১০ কোটি ভারতীয়দের মধ্যে ১০কোটি ভারতীয়কে ধরতে। তাঁর টার্গেট কনজিউমার হলো গোবলয়ের মানুষ ও বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ যাঁরা টিভি দেখেন, আবেগ প্রবণ, ঈশ্বর-ঐশ্বরীক ক্ষমতা-যোগের ক্ষমতায় বিশ্বাসী প্রশ্ন তুলতে জানেন। না, নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে নির্বিকারভাবে গুল মারেন। পাপ-পূণ্যে বিশ্বাস করেন। পাপবোধে ভোগেন। তাঁদের গেঁথে তুলতে ওশোর মত সফিস্টিকেটেড ব্যাপার-স্যাপার অচল। লাল রঙের কাপড় মালকোচা মেড়ে পরে আর গলায় একটা স্বল্প দৈর্ঘ্যের লাল কাপড় ঝুলিয়ে ঘোষণা করলেন, যোগে সব রোগ ঠিক করতে পারেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের মধ্যবিত্ত মানুষ অবাক হলো তাঁর হেভি চেল্লামেল্লিতে। তিন-চার বছরে বড় মার্কেট ধরে ফেললেন। এইসব দেখে স্বল্পশিক্ষিত, পাপবোধে কাতর বেওসায়ীরাও ভিড় জমালেন। তিরুপতির মন্দিরের মতো মন্দিরগুলোতে যাঁরা ব্ল্যাকে-সাদায় লক্ষ-কোটি টাকা ভেট চড়াতো পাপমুক্তির জন্যে, বিপদ মুক্তির জন্যে, রোগ মুক্তির জন্যে, তাঁদেরও অনেকে ভিড়ে গেলেন রামদেবের প্রচারে। এখন বহু চ্যানেল খুললেই দেখবেন রামদেবের বিজ্ঞাপন।

ওশো আর রামদেবের মাঝখানের সময়টা জমজমাট করে ভরিয়ে রেখেছিলেন শ্রীমাতাজী নির্মলা দেবী। তিনি সারা দেশে ঘুরে ঘুরে বিশাল বিশাল অনুষ্ঠান করেছেন সহজযোগ নিয়ে। লেখক, বুদ্ধিজীবী, সংগীতশিল্পীরা পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন।

মাতাজী নির্মলা দেবী প্রাচীন যোগে অনেকটাই বিশ্বাসী। মনে করেন আমাদের মেরুদণ্ডের নীচের শেষ অংশের অস্থিতে এই শক্তি সাড়ে তিন পাকে কুণ্ডল পাকিয়ে থাকে, তাই এর নাম 'কুণ্ডলিনী'। কুণ্ডলিনী যখন ছটি শক্তিকেন্দ্রকে ভেদ করে ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন আমরা ব্রহ্মচৈতন্যকে অনুভব করি।

সহজযোগ শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর এক অভিনব আবিষ্কার। 'সহজ' অর্থাৎ 'সহ' + 'জ'। 'সহ' কথার অর্থ 'সাথে' এবং 'জ' অর্থাৎ 'জাত' (জন্ম)। 'যোগ' শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বরের সর্বব্যাপী প্রেমশক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন। তাই এই যোগ ঘটে স্বাভাবিক ভাবেই। সচেতনার এক উচ্চ স্তরে একে উপলব্ধি ও প্রমাণ

করা যায়। মাটিতে বীজ পুঁতলে জলের সাহায্য পেলে যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর ও গাছ জাগরিত হয়, তেমনই স্বতঃস্ফুর্তভাবে সহজযোগের মাধ্যমে কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। এই জাগরণ শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ ও স্বাভাবিক।

চক্র (শক্তিকেন্দ্র)

১। মূলাধান চক্র ঃ আমাদের দেহের ত্রিকোণাকার অস্থির নীচে মেরুদণ্ডের সামান্য বাইরে অবস্থিত। ত্রিকোণাকার অস্থিতে অবস্থিত মূলাধার। মূলাধারে কূণ্ডলিনী মাতার বাসস্থান।
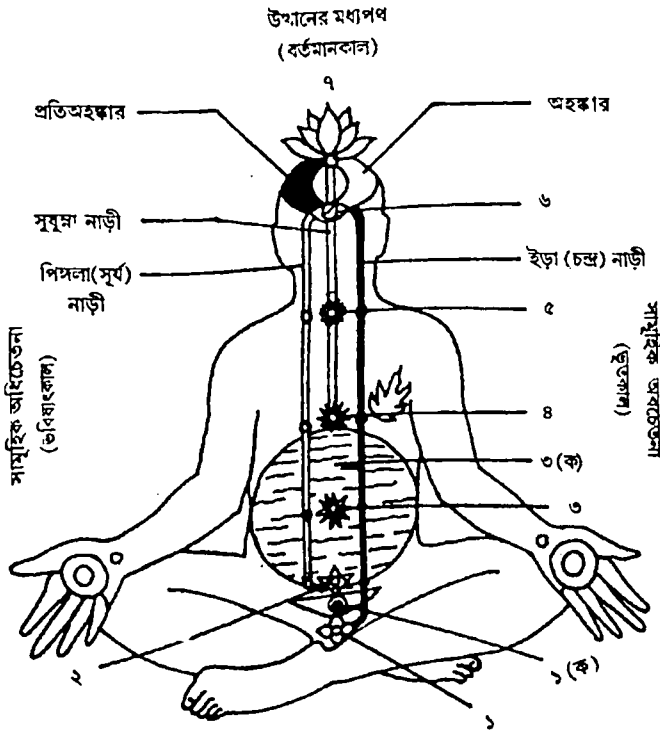
২। স্বাধিকার চক্র ঃ নাভির নীচে এই দ্বিতীয় চক্রটি অবস্থিত। এই চক্র পেটের চর্বিকে ভেঙে মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধন করে।

৩। মনিপুর চক্র ঃ দেহের এই তৃতীয় চক্রটি নাভির পিছনে অবস্থিত।

৩। (ক) ভবসাগর ঃ স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রকে বেষ্টন করে যে শূন্যগর্ভটি

আমাদের দেহে অবস্থান করে, তাকে 'ভবসাগর' বলে।

৪। **অনাহত চক্র বা হৃদয় চক্র** ঃ নির্মল প্রেমের দেবতা এই চক্রে অবস্থান করেন।

৫। **বিশুদ্ধ চক্র** ঃ বিশুদ্ধ চক্র আমাদের দেহে ছাকনির কাজ করে। বাইরের সব দূষিত পদার্থ ও জীবাণু দেহে প্রবেশ করা থেকে বাঁচায়।

৬। **আজ্ঞা চক্র** ঃ মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আজ্ঞা চক্র। একে তৃতীয় নয়ন বলেও অবিহিত করা হয়।

৭। **সহস্রাব (শীর্ষস্থ) চক্র** ঃ আমাদের দেহের সব চক্র-ই সহস্রাবে এসে মিলেছে। এখানে প্রত্যেক চক্রের-ই নির্দিষ্ট স্থান আছে।

* * * * * * * * * *

কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে মানুষের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটে। এই মিলন-ই মানুষের জীবনের লক্ষ্য, পরম প্রাপ্তি।

ধ্যান

কুণ্ডলিনীকে উত্তরণের জন্য ঘরে বসে ধ্যান করুন। ধ্যান করুন মাতাজী নির্মলা দেবীর আবিষ্কৃত 'সহজ যোগ'-এর পথে।

শ্রীমাতাজীর একটা আলোকচিত্র সংগ্রহ করুন। কাঠের ফ্রেমে ছবিটি বাঁধান। তবে দেখবেন, ফ্রেমটি যেন কালো রঙের না হয়। একটা পরিষ্কার উঁচু জায়গায় ছবিটিকে রাখুন। এটি আপনার ধ্যানের ঘর। এ'ঘরে ধ্যানে বসার আগে ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসুন। ঘড়ি ও চশমা খুলে রাখুন। পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করে দিন। ছবির সামনে বসুন। ছবির সামনে প্রদীপ বা মোমবাতি এবং ধূপ জ্বালিয়ে দিন। ফুল নিবেদন করুন। গাঁদা ফুল দেবীকে দেবেন না।

বসুন মেঝেতে বা চেয়ারে। ছবি থাকবে আপনার 'আই লেভেলে'। টেবিলের উপর রাখলে ভাল-ই হয়। প্রদীপ বা মোমবাতি এবং ফুল টেবিলে রাখুন। দেখবেন, চেয়ারে বসলেও যেন পা মেঝে স্পর্শ করে।

বসবেন মেরুদণ্ড সোজা করে। হাত দুটো হাঁটুর উপর এমন ভাবে স্পর্শ করে রাখুন যাতে হাতের তালু থেকে আঙুল মাতাজীর ছবির দিকে প্রসারিত থাকে।

এবার মাতাজীর কাছে প্রার্থনা করুন, "মা কৃপা করে আপনার প্রেমশক্তি আমার মধ্যে প্রবাহিত করুন।"

আপনি অনুভব করতে থাকবেন, হাতের তালু থেকে মাথায় শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এই অবস্থায় চোখ বন্ধ করে ১০-১৫ মিনিট ধ্যানের শান্তিকে উপভোগ করুন।

একই নিয়মে সকাল ও সন্ধ্যায় ধ্যানে বসুন। ধ্যান করতে করতে-ই এক দিন অনুভবে পৌঁছবেন ব্রহ্মতালু দপ্‌দপ্‌ করছে। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে।

রাতে শোবার আগে ধ্যান করতে একটা কাজ করুন। এক গামলা জলে ৪-৫
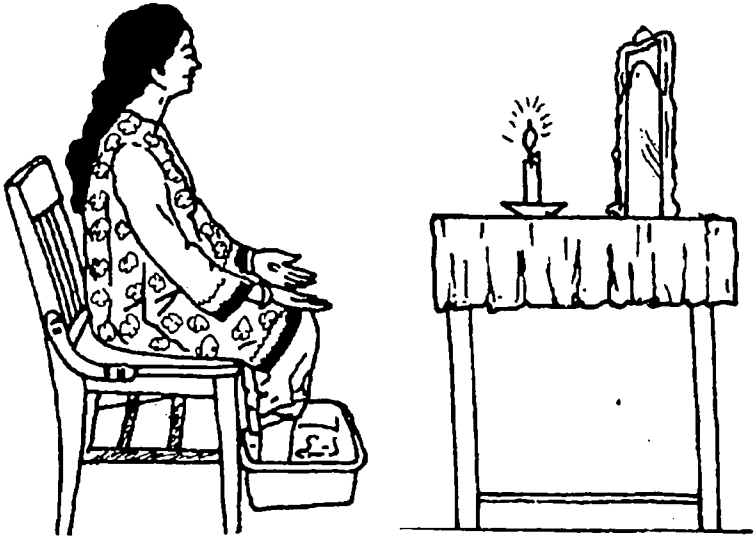
চামচ নুন দিন। জল এমন দেবেন যেন, গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত ডুবে যায়। মাতাজীর ছবির সামনে আগের নিয়মে বসুন। পা গামলার জলে ডুবিয়ে রাখুন। এভাবে অন্তত ১০ মিনিট বসুন।

(আবার যোগে দূরারোগ্য রোগ সারাবার গপ্পো শুরু হলো)

সহজযোগের ফল

প্রতিদিন সহজযোগ অভ্যাস করলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়। যে কোনও ধরনের দূরারোগ্য ব্যাধিও দূর হয়।

গুরু নির্বাচনের আগে প্রশ্ন করুন

মাতাজী বলছেন, কোনও গুরু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে দীক্ষা নেওয়ার আগে এগুলো জেনে নেওয়া জরুরি :

১। কখনও কি আপনি এদের টাকা দিয়েছেন? 'সত্য' এমন-ই যার কেনা-বেচা চলে না। তাকে নিজ সম্পত্তি করে নেওয়ার অধিকার কারও নেই।

২। আপনার নির্বাচিত আধ্যাত্মিক গুরু কি কখনও দোকানদার বা ফেরীওয়ালার

মতো কোন বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করেছে? তাদের প্রদর্শিত পথের যথার্থ মূল্যায়ন করুন আপনার আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে—কটা বই পড়েছেন কটা ক্লাসে হাজির থেকেছেন কিংবা কতগুলি নীতিবাক্য পাঠ করেছেন তার দ্বারা নয়।

৩। তাদের কাজের ধারা ও কৌশলের কোন ফল অনুভব করেছেন কি?

৪। আপনার নির্বাচিত গুরু ও তার সম্প্রদায়, ভবিষ্যতে আপনাকে কখনও তাদের অভ্যন্তরের বিশিষ্ট সদস্য করবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে কি?

৫। সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, এমন কোনও পরিচ্ছদ আপনাকে পরতে হয় নি? আপনাকে অদ্ভুত কোন বিশেষ ভঙ্গিতে কি বসতে হয় বা অর্থহীন কোন মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়? 'সত্যলাভ' এমন কোন বিষয় না, যা কঠোর পরিশ্রম করে লাভ করতে হয়। এখানে আপনার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাই গণ্য হয়, তাদের পরীক্ষার কঠোরতা নয়।

৬। যে পথ আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি পূর্বতন সাধু-সন্ত-ঋষিদের প্রদর্শিত ভারসাম্য যুক্ত সুষম পথ? নাকি এই পথ কোনও অবচেতন বা অধিচেতন মনের ভীতিজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করছে আপনাকে?

৭। ঐ সংগঠনের গুরু বা নেতাকে আপনি কি বিশ্বাস করেন? তাদের সঙ্গ আপনার আরামদায়ক মনে হয় কি? তারা কি আপনার প্রতি ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করে? তাদের দৃষ্টিতে কি তাদের প্রদত্ত শিক্ষার অন্তর্নিহিত গুণ প্রকাশ পায়?

৮। আপনার কি তাদের সংস্রব ত্যাগ করার স্বাধীনতা আছে? অহঙ্কার দিয়ে পরিচালিত না হয়ে হৃদয়কে অনুসরণ করুন। কোন সন্দেহ মনে জাগলে বা ভয় পেলে অথবা কোন জোর জুলুম হলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবেন, কোন রকম হুমকি সহ্য করবেন না।

'সহজ যোগ' প্রকৃত সত্য লাভের একমাত্র উপায়—"কেবল মাতাই সন্তানকে আপন গুরুতে পরিণত করতে পারেন। শুধুমাত্র মাতাই প্রকৃত সত্যের রহস্য প্রকাশ করতে পারেন।"

* * * * * * * * * * *

এই প্রসঙ্গে জানাই, স্বামী রামদেবের যোগপীঠের সদস্য চাঁদা এই প্রকার ঃ

১। সংস্থাপক সদস্য ঃ পাঁচ লাখ টাকা।

২। সংরক্ষক সদস্য ঃ দু লাখ একান্ন হাজার টাকা।

৩। আজীবন সদস্য ঃ এক লাখ টাকা।

৪। বিশিষ্ট সদস্য ঃ একান্ন হাজার টাকা।

৫। সম্মানিত সদস্য ঃ একুশ হাজার টাকা।

৬। সাধারণ সদস্য ঃ এগারো হাজার টাকা।

মাতাজী নির্মলা দেবী তাঁর সহজযোগে এইসব গুরুদেব সম্বন্ধে সাবধান করেছেন। এঁদেরকেই ব্যবসায়ী বলেছেন। আপনি কী বলেন?

অধ্যায় : আট

রিল্যাক্সেশন, মেডিশন নিয়ে বাংলাদেশের যোগী মহাজাতক

বাংলাদেশে বাইবেলের পর কোন্ বইয়ের বিক্রি সবচেয়ে বেশি? বাংলাদেশের শিক্ষিত-সমাজ এক সুরে বলবেন, মহাজাতক-এর লেখা 'কোয়ান্টাম মেথড'। বইটির মূল বিষয় রিল্যাক্সেশন বা মেডিটেশন ও মনের নিয়ন্ত্রণ। এই উপমহাদেশে তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় মেডিটেশনের শিক্ষক কেউ নয়। তিনি বাংলাদেশের 'যোগ-

ফাউণ্ডেশন'-এর সর্বোচ্চ পদাধিকারী। মুসলিম দুনিয়ার যোগের শেষ কথা।
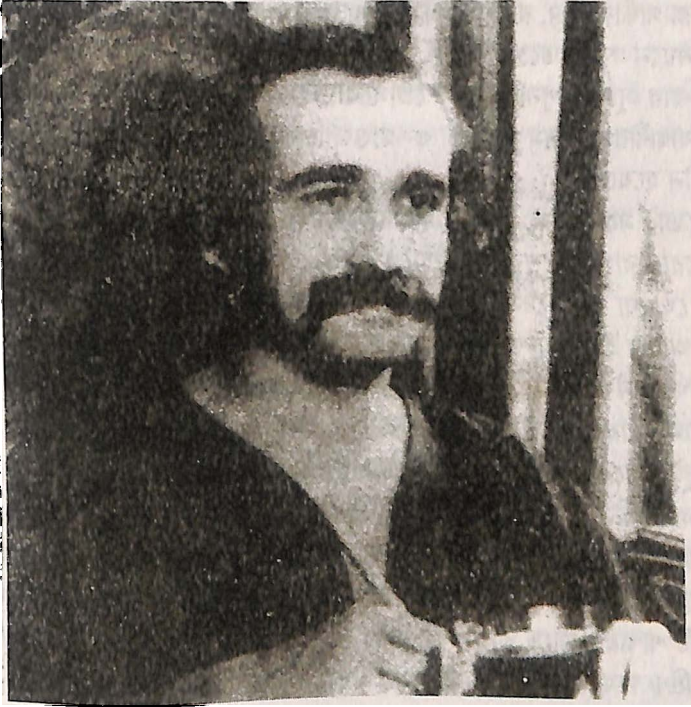
বইটির ব্যাক কভারে লিখেছেন ...

সাফল্যের জাদুকাঠি 'কোয়ান্টাম মেথড'। বাংলা ভাষায়, বাংলার মানুষের উপযোগী আত্ম-উন্নয়নের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি কোয়ান্টাম মেথড। মনের যে অসীম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের সাধকরা মানুষকে নিরাময়

করেছেন, বিপদমুক্ত করেছেন, সাফল্যের পথে নিয়ে গেছেন, সেই জাদুকাঠি এখন আপনার নাগালে। আপনিও অনায়াসে এই জাদুকাঠি দিয়ে পেশাগত ও বৈষয়িক সাফল্য সৃষ্টি, রোগ নিরাময় ও অভূতপূর্ব মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে পারেন। দৃশ্যমান সব কিছুর পেছনে প্রকৃতির যে নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম কাজ করছে, তাকে নিজের ও মানবতার কল্যাণে সক্রিয় করে তোলার ক্ষমতা অর্জন করে আপনিও হতে পারেন বিত্তবান, খ্যাতিমান ও বরণীয়।

যদিও বইটির মূল বিষয় দুটি। (এক) রিল্যাক্সেশন বা মেডিটেশন, (দুই) মনের নিয়ন্ত্রণ।

কে এই মহাজাতক?

বইটিতে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে ...

বরেণ্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাজাতক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, রাজীব গান্ধীর মৃত্যু, মহাশূন্যযান চ্যালেঞ্জের দুর্ঘটনা, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন, নব্বই-এ বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা, পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভরাডুবিসহ অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন।

(ভাই মহাজাতক, আপনি এত বড় ভবিষ্যদ্বক্তা, সত্যি জানতাম না। একটা বিশেষ অনুরোধ বাংলাদেশের মাননীয়া বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনার আগাম মৃত্যুদিনটা যদি ঘোষণা করে দেন, তাহলে আপনার দাবির সারবস্তু বুঝতে পারবো। আপনি তো আবার ইন্টারন্যাশনাল ভবিষ্যদ্বক্তা, দয়া করে যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর মৃত্যুদিন আগাম ঘোষণা করেন, তাহলে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি।

দুষ্টু লোকেরা বলেন ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর আপনারা নাকি ছোটখাটো পত্রিকায় ভবিষ্যদ্বাণী করছেন বলে লেখেন, ঘটনার আগের একটা তারিখ দিয়ে। আশা করি আপনি ঐ ধরনের প্রতারক নন। আমাদের সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করবেন।)

জ্যোতিষ বিজ্ঞান, যোগ, মেডিটেশন, প্রাকৃতিক নিরাময় তথা অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। *(উ...ফ...! আপনি প্লিস আমাদের একটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখান। আজ পর্যন্ত যতজন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দাবি করেছে, পরীক্ষা করে দেখেছি সব ব্যাটাই প্রতারক। আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখার আশায় রইলাম ভাই মহাজাতক।)* এই বিষয়গুলোর উপর তিনি লিখে আসছেন গত দুই যুগ ধরে। দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিত রাশিফল ও বর্ষশুরুতে ভবিষ্যদ্বাণী লিখে আসছেন ১৯৭৭ সাল থেকে।

শহীদ আল বোখারী কর্মজীবন শুরু করে সাংবাদিক হিসেবে। সাইকিক কনসালটেন্ট

হিসেবে সার্বক্ষণেক কাজ শুরু করার আগে তিনি ছিলেন দেশের প্রাচীনতম দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক। ১৯৮৩ সাল থেকে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের পাশাপাশি যোগ ও মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে স্থাপন করেন যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র। পরে এই প্রচেষ্টাকে আরও সংহত করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'যোগ ফাউণ্ডেশন'। তিনি মেডিটেশন ও মননিয়ন্ত্রণের সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 'কোয়ান্টাম মেথড'-এর উদ্ভাবক ও সফল প্রশিক্ষক।

মহাজাতকের দেওয়া (wisdom) থেকে কিছু নির্যাস

■ মন কি? মনের শক্তির উৎস কোথায়? এক কথায় এর জবাব দেয়া মুশকিল। কারণ মনকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী মনকে ধরতে বা ছুঁতে পারেননি বা কোন ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউবে ভরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেননি। তবে মনের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আদি যুগের সাধকরা যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানীরাও সচেতন। হাজার বছরের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হলো, মন মানুষের সকল শক্তির উৎস। মনের এই শক্তি-রহস্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই এই শক্তিকে আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব। (কোয়ান্টাম মেথড, পৃষ্ঠা ১১)

(মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল-ই হলো 'মন', 'চিন্তা' বা 'চেতনা'। তাকে নিয়ে এক রহস্য তৈরির রহস্যটা ঠিক বোঝা গেল না?)

■ চেতনা অবিনশ্বর। (পৃষ্ঠা ১২)

(আজকালকার সেভেন-এইটের ছাত্ররাও জানে, মন বা চেতনার উৎপত্তি মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ থেকে। মস্তিষ্ক মারা গেলে 'মন' বা 'চেতনা'রও মৃত্যু ঘটে। চেতনাকে অবিনশ্বর বলা মূর্খতা, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা।

■ আমরা আগেই দেখেছি ব্রেন এই কাজগুলো সুচারু রূপে করতে পারছে। দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি অংশের সাথে সংযোগ এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রাখছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কখনও কখনও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ব্রেন পায় বাইরের তথ্য আর ভেতরের তথ্য সংগৃহীত হয় রিসিপটর (Internal receptors)-এর মাধ্যমে। (পৃষ্ঠা ২৩)

(ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দরবারে আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বহু 'পরামনোবিজ্ঞানী' বা 'প্যারাসাইকোলজিস্ট'রা [যাঁরা আসলে বিজ্ঞান বিরোধী] তথাকথিত ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেছেন। কিন্তু পারেননি, অথবা তার সেই ক্ষমতার পিছনে ছিল প্রতারণা বা কৌশল। এই বিষয়ে বিস্তৃত

জানতে পড়তে পারেন আমার লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম খণ্ড। যোগী মহাজাতক কি প্রকাশ্যে তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় শক্তির প্রমাণ দিতে রাজি আছেন? ষষ্ঠ শক্তির প্রমাণ হিসেবে অন্য কারুকে হাজির করলেও চলবে।)

■ মনকে নিয়ন্ত্রণ ও মনের শক্তিকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগিয়ে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা নতুন নয়। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই জ্ঞানীরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। মনকে নিয়ন্ত্রণ করে সাধু, সন্ত, আওলিয়া, দরবেশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। (পৃষ্ঠা ৩৫)

(অলৌকিক ক্ষমতা দেখার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। যদি দেখার সুযোগ করে দেন, বাধিত হবো।)

■ আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্যের চিন্তার তরঙ্গ ধরতে পারি। কারণ প্রতিটি ব্রেন-ই হচ্ছে চিন্তার ট্রান্সমিটার ও রিসিভার।

(পরামনোবিজ্ঞানীদের তুরুপের তাস হলো 'টেলিপ্যাথি', যার সাহায্যে তাঁদের অলৌকিক বিশ্বাসকে তাঁরা বিজ্ঞানের লেবেল এঁটে বার বারই চালাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

পরামনোবিজ্ঞানীদের ধারণায় চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মতো এক ধরনের তরঙ্গ তার প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহিত হতে থাকে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিস পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

পরামনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোনও চিন্তা তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি, যেমনটি প্রমাণ করা যায় শব্দ বা আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে। শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত। রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে। যেহেতু 'চিন্তা তরঙ্গ' বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি, তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা তরঙ্গকে ধরা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

বিজ্ঞান স্বীকার করে ও জানে শব্দ শক্তি বা আলোক শক্তির মতো 'চিন্তা' কোনও শক্তি নয়। 'চিন্তা' স্নায়ু ক্রিয়ারই একটি ফল। টেলিপ্যাথির কোনও ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়নি। অতএব শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অন্যের কথায় ও ধারণায় আস্থা স্থাপন করে টেলিপ্যাথির অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া কোনও বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষেই আদৌ সম্ভব নয়।

রিল্যাক্সেশন বা শিথিলায়ন ও মেডিটেশন

রিল্যাক্সেশন (শিথিলায়ন) মন নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত মেডিটেশনের প্রথম স্তর। এটি একটি মনের ইতিবাচক অবস্থা যা চর্চা ছাড়া খুব কম মানুষ অর্জন করেছেন। পুরোপুরি কৌশল আয়ত্ত করা মন নিয়ন্ত্রণের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এক কথায় বলা যায় সঠিক রিল্যাক্সেশন বা শিথিলায়ন মন নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

রিল্যাক্সেশনের উপকারি দিকগুলি হল এই :

১. রিল্যাক্সেশনের সময় শরীরের কার্যক্রম মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। মন অপ্রয়োজনীয় শারীরিক কাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ায়, প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করার ক্ষমতা অর্জন করে। নিঝুম ও নিস্তব্ধ পরিবেশে যেমন একটা মৃদু শব্দও আমরা শুনে ফেলি, তেমনি মন যখন শিথিল ও শান্ত থাকে, তখন প্রকৃতির সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করে।

২. আমরা প্রায়শই শুনে থাকি **অন্ধদের মাঝে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। এ কথার মধ্যে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে।** *(ইন্দ্রিয় পাঁচটি। যোগী মহাজাতক, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কোথা থেকে হাজির করলেন? অজ্ঞতা থেকে? নাকি লোক ঠকাতে?)*

৩. শিথিলায়ন ধ্যানাবস্থার সৃষ্টি করে।

৪. রিল্যাক্সেশন করলে রক্তচাপ ঠিক থাকে। শরীর ভালো থাকে।

৫. নিয়ন্ত্রিত গভীর শিথিলায়নের ফলে চেতনা লাভ করে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ রূপ এবং তখন মনছবি (Mental image) অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়। **সাইকিক বা অতীন্দ্রিয় প্রক্রিয়ায় চেতনার স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।** *(উ...ফ... আবার সেই অতীন্দ্রিয় গুলগপ্পো। ভাই এত কথার কি আছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আমাদের দেখালেই তো ল্যাটা চুকে যায়।*

৬. রিল্যাক্সেশন আর মেডিটেশনের সাইকিক বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পক্ষে খুব জরুরী।

রিল্যাক্সেশন বা শিথিলায়নের প্রক্রিয়া

১. একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিন। এই সময় কেউ যেন বিরক্ত না করে। টেলিফোন বন্ধ রাখুন। গায়ের পোশাক ঢিলে করে নিন। ঘরে হাল্কা আলো রাখুন।

২. শক্ত বিছানায় অথবা মেঝেতে মাদুর বা পাতলা কার্পেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। এভাবে শুতে অসুবিধা হলে মাথার নিচে বালিশ দিতে পারেন। বিছানা যত শক্ত হবে তত ভালো হবে। শোয়ার সময় দু হাত থাকবে দেহের দুপাশে। হাতের তালু থাকবে উপরের দিকে। দু পায়ের মাঝখানে অন্তত চার আঙুল ফাঁক থাকবে।

বসেও অনুশীলন করতে পারবেন। সুখাসন বা পদ্মাসন। অথবা চেয়ারে আরাম করে বসলেও চলবে। হাতের আঙুল থাকবে হাঁটুর দিকে।

৩. চোখ বন্ধ করবেন, ভুরু কোঁচকাবেন না।

৪. লম্বা দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নেবেন বুক ফুলিয়ে নয়, পেট

ফুলিয়ে। দম ছাড়ার সময় পেট যেন চুপসে যায়। ১, ২, ৩ এভাবে ছয় থেকে দশ বার দম নিন এবং ছাড়ুন। দম নাক দিয়েই নেবেন এবং মুখ দিয়ে ছাড়বেন।

৫. আপনার চোখ বন্ধ আছে। এক মুহূর্তের জন্য মনের চোখে নজর বুলিয়ে নিন। মাথার থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত। এবার প্রথম ১০ সেকেণ্ড মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। সেখানে একটু গরম গরম লাগছে বা একটু শিরশির করছে। এরপর অনুভব করবেন তালুর পেশী শিথিল হয়ে আসছে। ভারি হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে আপনি পর্যায়ক্রমে কপাল, চোখ ও চোখের পাতা, ঠোঁট ও জিহ্বা, চোয়াল, মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়, কাঁধ, ডান হাত, বাম হাত, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, কোমর, নিতম্ব, উরু, হাঁটু, পা, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। প্রতিটি অঙ্গে ১০ সেকেণ্ড করে মনোযোগ নিক্ষেপ করুন। মনের চোখ দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গ অবলোকন করুন। অবলোকনের সাথে সাথে অনুভব করবেন প্রতিটি অঙ্গে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে। পেশী শিথিল ও ভারী হয়ে আসছে। আপনি যখন মাথা থেকে পায়ের নিচে নামতে থাকবেন, তখন অনুভব করবেন যে বরফ গলা পানি যেমন বরফের গা বেয়ে নিচের দিকে নামে, তেমনি রিল্যাক্সেশন বা শিথিলতা স্রোতের মত আপনার গা বেয়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে।

৬. ভাবুন আপনার অঙ্গ শিথিল ও নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন দমের ওপর। বাতাস কিভাবে নাক দিয়ে ঢুকছে তা অনুভব ও মনের চোখে অবলোকন করুন। এরপর অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে।

৭. কাঁধ, বুক, নিতম্ব, হাত, পায়ের ওজন বেড়ে গেছে, অনুভব করুন। অনুভব করুন আপনি জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছেন ভাবতে থাকুন আপনি বালুকণা হয়ে যাচ্ছেন।

৮. অনুভব করুন শরীরের প্রতি অঙ্গ থেকে বালুকণা ঝরে পড়তে শুরু করছে। আপনি পরিণত হচ্ছেন এক বালুর স্তূপে।

৯. আপনি এখন সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপ। অনুভব করুন উত্তর দিকে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর ঝড় আপনার শরীরের অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালুকণাগুলো রয়েছে তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনি এখন পরিপূর্ণরূপে শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি।

১০. মনে মনে বলুন, 'গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি আমি।' ১৯ থেকে ০ পর্যন্ত উচ্চারণ করুন। এবার মনে মনে বলুন, 'আমি পৌঁছে গেছি মনের বাড়িতে।' আর অনুভব করুন এক অনাবিল প্রশান্তি।

১১. আপনি উপভোগ করছেন ফুলের গন্ধ, পাখির কলতান, ঝরণার তরঙ্গ, যা দেখতে পান খুঁটিয়ে দেখুন, তারপর বাড়ির ড্রয়িংরুমে আরাম করে বসুন।

১২. মনে মনে বলতে থাকুন এখন আমার থেকে আমার স্মৃতিশক্তি বাড়বে। আমার টেনশন কমবে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়বে। আমার মনোযোগ বাড়বে। আমার শরীর এখন সুস্থ ও সবল।

১৩. এবার জেগে ওঠার পালা। প্রথমে একটা লম্বা দম নিন। মনে মনে বা আওয়াজ করে বলুন, '০ থেকে ৭ পর্যন্ত গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব। আমি পুরোপুরি জেগে উঠব। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠব। এবার গণনা শুরু করুন। ০, ১। অনুভব করুন উড়ে যাওয়া বালুকণাগুলো চারপাশ থেকে এসে আপনার শরীর গঠন করছে। ২,৩। লম্বা দম নিন। অনুভব করুন বালুকণাগুলো প্রাণবন্ত জৈবকোষে পরিণত হয়েছে। ৪, ৫। আবার ওম্বা দম নিন। মনে মনে বা জোরে জোরে, বলুন, '৭ পর্যন্ত গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আম পুরোপুরি জেগে উঠব, আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ বা শরীরে কোন ব্যথা বা অস্বস্তি থাকবে না। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ, সবল ও চাঙ্গা অনুভব করব। ৬,৭। এবার চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টান টান করুন। হাত নাড়াচাড়া করুন। আস্তে আস্তে উঠে বসুন বা দাঁড়ান। জোরে বলুন, 'বেশ ভাল লাগছে। শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'

রিল্যাক্সেশন বা শিথিলায়নের ১৩টি ধাপ

অনুশীলনীর পর্যায়ক্রমে যাতে মনে রাখতে পারেন সে জন্যে শিথিলায়নের ১৩টি ধাপের সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো :

১. পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি।
২. আরামে বসা বা শোয়া।
৩. চোখ বোজা।
৪. বিশেষ পদ্ধতিতে ৪/৫ মিনিট নাক দিয়ে দম নেয়া ও মুখ দিয়ে ছাড়া।
৫. মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শরীরের পেশীগুলো শিথিল করা।
৬. ধীর লয়ে দম নেয়া ও দমের প্রতি মনোযোগ দেয়া।
৭. শরীর ভারী লাগতে লাগতে জড় পদার্থে পরিণত হওয়া।
৮. বালুকণার স্তুপে পরিণত হওয়া।
৯. ঠাণ্ডা ঝড়ে বালুর স্তুপ উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে মনের বাড়ি যান।
১০. মনের বাড়িতে পৌছাবার জন্যে ১৯ থেকে ০ পর্যন্ত কাউন্ট ডাউন করা।
১১. মনের বাড়ির পারিপার্শ্বিকতায় হারিয়ে আনন্দ উপভোগ।
১২. ড্রইং রুমে বসে আত্ম-উন্নয়নের জন্যে অটোসাজেশন দেয়া।
১৩. ০ থেকে ৭ পর্যন্ত গুণে জেগে উঠে পরিপূর্ণ সুস্থ ও চাঙ্গ অনুভব করা।

অধ্যায় : নয়

'যোগ' মস্তিষ্ক-চর্চা বিরোধী এক স্থবির তত্ত্ব

বিভিন্ন কালের বিভিন্ন যোগীদের যোগ তত্ত্ব বিভিন্ন রকমের। পার্থক্যটা অবশ্য শুধু কালের নয়। প্রাচীনকালেও 'যোগ' নিয়ে নানা যোগী ঋষির নানা মত ছিল। একালের যোগীরাও এক একজন এক এক রকমের যোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যোগ সাধনার পদ্ধতিও তাই বিশাল গড়মিল—এসবই আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি।

প্রাচীনকাল থেকে এখনকার কাল পর্যন্ত যোগীরা যোগকেই পরমব্রহ্ম পাওয়ার একমাত্র পথ বলেছেন। এইসব যোগীরা 'হিন্দু' হিসেবেই পরিচিত। আবার হিন্দুদের মধ্যেই বহু ধর্মীয় গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী রয়েছেন যাঁরা নানারকম আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে, পূজাপাঠের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর উপাসনা করেন। এই সেই পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে অনেকেই দেখেন বলে দাবি করেন। অনেকের উপর ঈশ্বরের ভর হয়। *(ঈশ্বর বা ভূত কেউ কেউ নাকি দেখে। দু'য়ের ভরও হয়। আবার ঈশ্বর দেখতে যে সব ঈশ্বর-ভক্ত সত্যিই আগ্রহী, তাদের ঈশ্বর দেখাতে পারেন অনেক মনোবিদ বা সম্মোহন বিশেষজ্ঞরা। কী ভাবে? জানতে পড়তে পারেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম এবং ২য় খণ্ড। 'ঈশ্বর' একটা বিশ্বাস, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তাই ঈশ্বর দেখাটা সব সময়ই মানসিক একটা বিকার। কিছু মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক, সম্মোহন বিশেষজ্ঞরা কিছু কিছু আবেগ-প্রবণ ব্যক্তির উপর সেই বিকার এনে ঈশ্বর থেকে ভূত সবই দেখাতে পারেন শুধু নয়, আবার ঈশ্বরে ভরগ্রস্তদের, ঈশ্বর দেখতে থাকা মানুষদের ঠিক করেও দিতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।')*

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষরা নামগানেই ভরগ্রস্ত (মনোবিজ্ঞানের মতে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত) হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় আরাধ্য দেবতাকে দেখতে পান, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এমন ভক্তও আছেন, যাঁরা অলীক অনুভব করেন যে, দেবতা তাঁর সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হচ্ছেন। তন্ত্রে এমন মন্ত্র আছে, যা উচ্চরণে নাকি যে দেবীকে চাওয়া যায়, সেই দেবীকেই ভার্যা হিসেবে পাওয়া যায়। *(এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ৫ম খণ্ড)*।

তা'হলে এ কথা আমরা বলতে পারি—ঈশ্বর দর্শনের জন্য যোগই একমাত্র পথ বলে যা বলা হয়েছে, তা ভুল। নানা উপাসনা ধর্ম পদ্ধতিতে গভীর আস্তাশীল

আবেগপ্রবণ মানুষ পুজো করতে করতে 'ঈশ্বর' দেখেন—যেমন দেখেছিলেন রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদরা। আবার মনোবিজ্ঞানী এবং সম্মোহনকারীও ঈশ্বর দেখাতে পারেন। এই ঈশ্বর দর্শনগুলোর মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। কিন্তু ঈশ্বরে কোনও পার্থক্য নেই। সবই অলীক দর্শন। যার অস্তিত্ব নেই, তাকে দেখা।

ধরে নিলাম, কোনও এক স্বামীজী বা মাতাজী পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে যোগী করে তুললেন, আশ্রমবাসী করে তুললেন। ভাবুন তো, ফলে ফসল উৎপাদন বন্ধ, পোষাক উৎপাদন বন্ধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের উৎপাদন বন্ধ, বন্ধ বিলাস দ্রব্য, বন্ধ সিনেমা-থিয়েটার-গান-নাচ-যাত্রা-পেইনটিং-ভাস্কর্য, বন্ধ টেলিভিশন, সাহিত্যচর্চা, বাস-গাড়ি-লড়ি-ট্রেন, লোকসভা থেকে বিধানসভা, পুলিশ থেকে কোর্ট, সেলট্যাক্স থেকে ইনট্যাক্স দপ্তর, দোকান-পাট-বাজার-হাট। ভাবুন তো, গভীর ভাবে ভাবুন, সবাই যোগী। না খেয়ে ন্যাংটো হয়ে শুধুই উপাসনা করে যাচ্ছেন। কেমন লাগলো চিত্রটা! আমরা সভ্যতা থেকে আবার অসভ্যতায় ফিরে যাবো? আপনার উত্তর যদি 'না' হয়, সেটাকেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলুন। প্রচারের দৌলতে যোগ-ব্যবসায়ীদের সুরে সুর না মিলিয়ে নিজের বিচার শক্তিকে প্রয়োগ করে বলুন।

যোগ আমাদের স্বাভাবিক মস্তিষ্কচর্চার বিরোধী, চিন্তাচর্চার বিরোধী, প্রশ্ন তোলার বিরোধী। কোনও সৃষ্টিশীল কাজেই এইসব যোগ-চিন্তায় বিভোররা অচল। বিজ্ঞানে-শিল্পে-সাহিত্যে এমনকি প্রত্যেকটি সৃষ্টিশীল কাজে যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে উজার করে দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ-ই 'আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন'কে জীবনের লক্ষ্য করে নেননি। আর, নেননি বলেই নিজেরা এগিয়ে ছিলেন, সমাজকে এগিয়ে দিয়েছেন।

আজও সমাজের অগ্রগতি এইসব চিন্তশীল মানুষদের উপর নির্ভরশীল। এঁরা সমাজবিজ্ঞানী, পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি যাই হোন না কেন কেউ-ই 'যোগী' নন।

এঁরা অনেকেই মন ও শরীরকে 'রিল্যাক্স' করার জন্য, মস্তিষ্ক কোষকে বিশ্রাম দিয়ে আবার সতেজ করার জন্য স্ব-সম্মোহন বা 'মেডিটেশন' করেন। কিন্তু সেই স্বসম্মোহন বা 'মেডিটেশন' যোগীদের 'মেডিটেশন' থেকে পৃথক কিছু। এখানে মনোবিজ্ঞান আছে, ঈশ্বর নেই।

মস্তিষ্ক চর্চার কারণে অতি সক্রিয় মস্তিষ্ক কোষকে বিশ্রাম দিতে এবং সঙ্গে শরীরের কোষগুলোকে সাময়িক বিশ্রাম দিতে স্বসম্মোহন বা মেডিটেশন করা হয়। বিশ্রামের পর সতেজ মস্তিষ্ক কোষ আবার মস্তিষ্কচর্চার জন্য সতেজ হয়ে ওঠে। যোগীদের মেডিটেশনে চিন্তার চর্চাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে মস্তিষ্ককোষগুলো নানারকম অস্বাভাবিক আচরণ করে। ফলে তাঁরা অনেকেই ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বরের

বানী শোনেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানী ও মনোরোগ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে (observation) ওরা মানসিক রোগী। ঠিকমতো মানসিক চিকিৎসা হলে এই ধরনের মানসিক রোগ সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মনোবিজ্ঞান এবং মনোরোগ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এইসব ঈশ্বর দেখার মতো ভ্রান্ত অনুভূতিকে বলা হয় 'ইলিউশন' (illusion), 'হ্যালিউসিনেশন' (hallucination), 'ডেলিউশন' (delusion) এবং প্যারানয়রা (paranoia)।

ইলিউশন হচ্ছে—প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা। দেখছি কালীঠাকুরের মূর্তি, কৃষ্ণের ছবি বা কোনও মাতাজীর ছবি। একমনে দিনের পর দিন দেখছি। এবং আমার আবেগ ভাবছে, মূর্তি বা ছবি নড়ে-চড়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। একসময় আমি যেমনটা গভীরভাবে ভাবছি, তেমনটাই দেখলাম। মাতাজী বা মাকালী নড়ে-চড়ে উঠলেন, অথবা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই ভ্রান্ত অনুভূতিকেই বলে ইলিউশন। আসলে মাতাজীর ছবি বা কালীমূর্তিকে হয়তো নাড়িয়েছে টিকটিকি বা ইঁদুর। নাড়লে ছবি নড়েছে। ছবির ঠোঁট নড়েছে। ঠোঁট নড়াই হাসি বলে অনুভব করেছি।

'হ্যালিউসিনেশন' কথার মানে 'অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে অলীক ইন্দ্রিয়ানুভূতি। ধরা গেল রামবাবু মাতাজী নির্মলাদেবীর সহজযোগে গভীর বিশ্বাসী। তিনি মাতাজীর ছবির সামনে যোগে বসলেন এবং মাথায় ঠাণ্ডায় হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এটা অনুভব করলেন। এটা অবশ্যই হ্যালিউসিনেশন। মাতাজীর ছবির সামনে সহজযোগে বসলে এমনটা হয়, এই গভীর বিশ্বাস থেকেই এই অলীক ইন্দ্রিয়ানুভূতি এসেছে।

'ডেলিউশন' রোগীর মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা থাকে। যেমন, একজন 'ডেলিউশন' রোগী ভাবলো তার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয়ে গেছে। কৃষ্ণ তার স্বামী। মীরাবাঈ থেকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নারী থেকে পুরুষ ভেবেছিলেন কৃষ্ণ তাঁদের স্বামী। এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে তাঁদের আচরণে নানা মানসিক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল।

'প্যারানয়রা' রোগের অর্থ—বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি। কিন্তু তারা বিশ্বাসের পিছনে সুন্দর যুক্তি সাজাতে খুব ভালোই পারেন।

ধরুন শ্যামবাবুর কথা। তিনি যোগ নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। অনেক যোগীদের কাছে গিয়েছেন যোগ শিখতে। এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান যোগ সাধনা। তিনি একটা যোগ-কক্ষ তৈরি করেছেন। যোগে বসলে একসময় বুঝতে পারেন অর্থাৎ

অনুভব করতে পারেন, তাঁর বীর্য ছটি চক্র অতিক্রম করে মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মের কুঁড়িতে উঠেছে। ফণা মেলে থাকা সাপ ফণা গুটালো। হাজার পাঁপড়ি মেলে ফুটে উঠলো পদ্ম-কুঁড়ি। প্রতিটি পাঁপড়ির ভিন্ন ভিন্ন রঙ। পদ্মের উপর আছেন শিব-শক্তি। ঈশ্বর দর্শনের অপার আনন্দে চেতনা রহিত হয়ে গেছে। গোটা চেতনা জুড়েই শুধু আনন্দ।

শ্যামবাবু প্যারানইয়া রোগী। ধর্ম ব্যবসায়ী নন, প্রতারক নন। এই রোগী যখন ভক্তদের মাঝে যোগের নানা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা বলবেন, তখন তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যাবেই। কারণ এখনও আমাদের সমাজের প্রথাগত শিক্ষা পাওয়া মানুষদের জ্ঞান (wisdom)-এর লেভেল অত্যন্ত কম। মস্তিষ্ক-চর্চার অভাবেই কম।

শ্যামবাবুর মতো কিছু কিছু প্যারানইয়া রোগী সাধারণের চোখে 'অবতার' বা 'মহাপুরুষ' বলে পূজিত হচ্ছে।

(ইলিউশন, হ্যালিউসিনেশন, ডেলিউশন এবং প্যারানয়া বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম খণ্ড)।

আমাদের আলোচনাকে এবার গুটিয়ে নিলে দেখতে পাচ্ছি,

যোগ সাধনা শুধুমাত্র স্থবির এক তত্ত্ব নয়, মস্তিষ্ক-চিন্তা বিরোধী তত্ত্ব নয়, মানসিক রোগী তৈরি করার এক শক্তিশালী তত্ত্ব-ও।

অধ্যায় : দশ

'মেডিটেশন', 'রিল্যাক্সেশন' বা 'স্বসম্মোহন'

'মেডিটেশন', 'রিল্যাক্সেশন' বা 'স্বসম্মোহন' যে নামেই ডাকুন, সব একই। এই 'মেডিটেশন' (তিনটি নাম ব্যবহার না করে শুধু 'মেডিটেশন' বলে আলোচনা করবো) সবার করার একেবারেই প্রয়োজন নেই। শ্রমিক থেকে কেরানি পেশার মানুষদের মেডিটেশন করা মানে সময় বরবাদ করা।

মেডিটেশন করার প্রয়োজন তাঁদের, যাঁরা অত্যন্ত বেশি রকমের মস্তিষ্কচর্চা করেন। হতে পারেন, তাঁরা রাজনীতিক, বহুজাতিক সংস্থার কর্তা-ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, লেখক, চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ইত্যাদি। মস্তিষ্কচর্চাকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে মেডিটেশন করা অবশ্যই ভালো।

কীভাবে মেডিটেশন করবেন

মেডিটেশনের সময় বাছুন এমন, যখন নিস্তব্ধ। বাইরের দুম-দাম আওয়াজ বা গাড়ি যাতায়াতের হর্ন ও আওয়াজ বিঘ্ন ঘটাবে না। অথবা এমন হলো যে আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে পরিবেশটাই নিরিবিলি। এমনটাও আদর্শ পরিবেশ।

পোশাক হবে অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা। অন্তর্বাসকে বিদায় দিন। দেখবেন, পোশাক যেন আরামদায়ক হয়।

বিছানা হবে আরামদায়ক এবং অবশ্যই ধোপদুরস্ত। চাদর সাদা অথবা হাল্কা রঙের হলে ভাল হয়। মাথার বালিশ হবে অল্প উঁচু। পাশ বালিশ চলবে না। মশারি চলবে না। মশার উপদ্রব থাকলে জানলায় নেট লাগান। মশা তাড়াবার জন্য ধূপ না ব্যবহার করে লিকুইড ব্যবহার করুন। এতেও মশা না গেলে সাদা, উঁচু, নাইলনের মশারি টানাতে পারেন।

মেডিটেশনের ঘরে **আসবাবপত্রের ভিড় লাগাবেন না**। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ঘর মেডিটেশনের পক্ষে আদর্শ।

ঘরে **হালকা রঙের নাইট ল্যাম্প** জ্বালতে পারেন। নাইটল্যাম্প এমনভাবে লাগাবেন, যাতে আপনি বিছানায় শুলে ল্যাম্প চোখে না পড়ে।

লো ভলিউমে, মনকে আরাম দেওয়ার মত **ক্যাসেট বা সিডি বাজতে দিন**। বাজাবেন মেডিটেশন শুরু হওয়ার সামান্য আগে থেকে।

ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসুন। চোখে-মুখে ভাল করে জল ছিটিয়ে আসুন। খুবই ভাল হয় স্নান সেরে মেডিটেশন করলে।

শুধুমাত্র নাইটল্যাম্পটা জ্বালুন। মিউজিক চালিয়ে দিন। হালকা পোশাক পরে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। শোয়ার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিন।

বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শোবেন। দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক থাকবে এক ফুটের মতো। হাত দুটো পায়ের দিকে লম্বা করে রাখুন। হাত থাকবে শরীরের থেকে সামান্য দূরে। অর্থাৎ শরীরে হাত ছুঁয়ে আড়ষ্ট হয়ে শোবেন না। একদম রিল্যাক্স মুডে শোবেন।

চোখ বন্ধ করুন। এবার এক মনে ভাবতে থাকুন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘু...ম পাচ্ছে। চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। ঘুম আসছে। ঘু...ম...। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। এ'ভাবে চিন্তা-শূন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে আপনার ভাল লাগছে। আপনার কপালের চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। কপালের পেশীগুলো নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার গালের পেশী নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার চোয়ালের পেশী নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। ঘু...ম।"

"আপনার চোখের পাতা ভারি হয়ে গেছে। দু'চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। আপনার ডান কাঁধটা নিয়ে ভাবুন। ডান কাঁধের পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। আপনার ডান কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ভাবুন। কনুই থেকে কব্জির পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। হাতের তালু ও আঙুলগুলোর পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা ভারী হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। ডান হাতটা ভারী হয়ে গেছে।"

একইভাবে বাঁ কাঁধ থেকে সাজেশন দেওয়া শুরু করে হাত ভারীতে শেষ করুন।

"আপনার বুকের কথা ভাবুন। বুকের পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ধীরে ও গভীরভাবে হচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এভাবে চিন্তা-শূন্য হয়ে ঘুমোতে আপনার ভাল লাগছে।"

"আপনার পেটের পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার কোমরের পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"ডান পায়ের থাইয়ের পেশী নিয়ে ভাবতে থাকুন। থাইয়ের পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পায়ের কাফের পেশী নিয়ে ভাবুন। পেশীগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পায়ের পাতা ও আঙুলগুলোর পেশী শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পা'টা ভারী হয়ে যাচ্ছে। ভারী হয়ে বিছানার উপর পড়ে আছে।"

একইভাবে বাঁ পা নিয়ে সাজেশন দিতে থাকুন।

এবার আপনি ভাবতে থাকুন, চিন্তা শূন্য হয়ে এ'ভাবে পড়ে থাকতে ভালো লাগছে। এক চিন্তা-ভাবনাহীন আনন্দের জগতে আপনি এখন আছেন। আনন্দ...আনন্দ...শুধুই আনন্দ...। এ হলো 'মেডিটেশন' বা 'রিল্যাক্সেশন'।

আপনি এমন ভাবতে ভাবতে, আধাঘুম-আধা জাগরণের অবস্থা থেকে এক সময় পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। অথবা ধীরে ধীরে জেগে উঠতে পারেন। স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে যা হতে চায় তাই হতে দিন। যতক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায় নিতে দিন। কখনই জোর করে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করবেন না।

এই যে এতক্ষণ আপনি মনে মনে ভাবলেন—ঘুম পাচ্ছে থেকে পেশীগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি এই ভাবনা আপনার মস্তিষ্ক কোষে ওই ধারণাগুলো সঞ্চার করছে। এই ধারণা সঞ্চারকেই বলে 'সাজেশন'।

শিথিলতার সাজেশন হবে পা থেকে মাথায় নয়, মাথা থেকে পা'য়ে

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে ঘুম। হাইপোথ্যালামাস'কে ঘুমের বিষয়ে সাহায্য করে চোখে, পিনিয়াল গ্রন্থি ও পন্‌স।

চোখের রেটিনা থেকে হাইপোথ্যালামস খবর পায় দিন কি রাত। ঘুমের জৈব ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে তখন হাইপোথ্যালামাস কাজ করতে শুরু করে।

পিলিয়াল গ্রন্থি থেকে 'মেলাটনিন' হরমোনের নিঃসরণ হতে শুরু হলে আমাদের ঝিম আসে, আধা-জাগরণ আধা-ঘুমের মতো অবস্থা আসে। তারপর আসে ঘুম।

পন্‌স পশ্চাতে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠিয়ে সুষুম্নাকান্ডকে তার কাজকর্মকে কমিয়ে দিতে সংকেত পাঠায়। ফলে হার্ট রেট, পাল্‌স রেট, ব্লাড প্রেসার, শ্বাস-প্রশ্বাসের ডিউরেশন কমে যায়।

আমরা যখন ঘুমোতে শুরু করি তখন মস্তিষ্কের কাছাকাছি পেশিগুলো শিথিল হতে থাকে। মুখের পেশি শিথিল হওয়ার জন্য অনেকের মুখ থেকে লাল গড়ায়। মুখের পরেই ঘাড়, পিঠ, বুক, হাতের উপরের দিকের পেশি, হাতের নিচের দিকের পেশি, হাতের পাতা, পেটের পেশি, পায়ের পেশি এবং তারপর অন্যান্য অগুরুত্বপূর্ণ পেশিগুলো শিথিল হতে থাকে।

তাই মেডিটেশনের সময় পেশিগুলো শিথিল হওয়ার সাজেশন দেওয়া হয় চোখ থেকে পায়ের দিকে। পা থেকে চোখের দিকে নয়।

মেডিটেশনে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বিশ্রাম পায়। সঙ্গে দেহের স্নায়ুকোষ, শরীরের

বিভিন্ন পেশি বিশ্রাম পায়। টেনশন, উত্তেজনা বা উদ্বেগ দূর হয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে। উদ্বেগ বা টেনশন থেকে ব্লাডসুগার ও হাপানি হয়ে থাকলে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীর ক্লান্তিহীন ও ঝরঝরে লাগে।

যোগী-সন্ন্যাসী-স্বামীজী-মাতাজীরা যেভাবে যোগকে মেডিটেশনকে রহস্যময় করে রেখেছেন, মেডিটেশন আসলে আদৌ তেমন নয়। বরং অত্যন্ত সহজ-সরল একটি পদ্ধতি।

অনেকেই আছেন, যাঁরা সহজ-সরল পদ্ধতির চেয়ে কঠিন, অবোধ্য বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হন বেশি। জ্ঞানী কিন্তু সহজ-সরল মানুষের মুখোমুখি হলে জ্ঞানী মানুষটির বিষয়ে আমাদের মনে তৈরি হওয়ার মুগ্ধতা মুহূর্তে খসে পড়ে।

পরম ঘ্যামওয়ালা, দূরত্ব বজায় রাখা মধ্যমেধার মানুষকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচি। এটা আমাদের মূল জাতীয়-চরিত্র। সুতরাং আমরা সহজ-সরল মেডিটেশন তত্ত্বকে ছেড়ে যোগীদের পিছনে দৌড়তেই পারি। এই জাতীয় ঐতিহ্যকে আমরা কি বিসর্জন দিতে পারবো? সাদাকে 'সাদা' এবং কালোকে 'কালো' বোঝার ও বলার মতো মেধাশীল ও সাহসী হতে পারবো?

সময়ই তা বলে দেবে।

অধ্যায় : এগারো

যোগী, রেইকি গ্রান্ডমাস্টার, ফেং শুই ক্ষমতার দাবিদার, জ্যোতিষ ও অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি

২০ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ

আজ এই বইটি প্রকাশের দিন থেকে আমি প্রবীর ঘোষ, পিতা- মৃত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, নিবাস- ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৪ এই বইটির লেখক নিম্নলিখিত ঘোষণা রাখছি— বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাঁকে ২০ লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

এই ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে :

১। যোগের সাহায্যে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করার কোনও দাবিদার যদি আমার দেওয়া রোগীকে ১ বছরের মধ্যে রোগমুক্ত করতে পারেন।

২। যোগ পদ্ধতির সাহায্যে টাকে চুল গজিয়ে দিতে হবে।

৩। যোগের সাহায্যে পাখির মতো শূন্যে উড়ে দেখাতে হবে।

৪। যোগের সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে হবে।

৫। যোগের সাহায্যে জড়াকে আটকে রাখতে হবে।

৬। যোগের সাহায্যে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দেখাতে হবে। *(ট্রেনে কাটা পড়েও বেঁচে থাকলে বেশ দেখার মত ব্যাপার হবে।)*

৭। রেইকি ক্ষমতায় অথবা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার তরফ থেকে হাজির করা রোগীকে ১৮০ দিনের মধ্যে রোগমুক্ত করতে হবে। মৃত্যুর দায় পুরোপুরি বহন করতে হবে রেইকি মাস্টার বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে।

৮। অচল টেপ রেকর্ডারকে, রেডিওকে রেইকি ক্ষমতার দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সচল করতে হবে যেমনটা দাবি করে থাকেন কিছু রেইকি গ্রান্ডমাস্টার।

৯। 'ফেং-শুই'-এর অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে হবে।

১০। 'বাস্তুশাস্ত্র'-এর সাহায্যে লকআউট কারখানা খুলে লাভের মুখ দেখাতে হবে।

১১। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

১২। আমার তরফ থেকে হাজির করা ছবির মেয়েটিকে ১৮০ দিনের মধ্যে বশীকরণ করে প্রমাণ করতে হবে 'ফটো সম্মোহন'-এর অস্তিত্ব।

১৩। আমার দেওয়া কোনও ছেলে বা মেয়েকে 'সরস্বতী কবচ' দিয়ে বা অলৌকিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম করাতে হবে।

১৪। প্রজাপতি কবচে বা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

১৫। আমার তরফ থেকে হাজির করা মামলা জেতাতে হবে।

১৬। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীনাকে জননী করতে হবে। সন্তানহীনাকে হাজির করবো আমি।

১৭। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে যৌন-অক্ষমকে যৌনক্ষমতা দিতে হবে।

১৮। আমার দেওয়া চারজন ভারতবিখ্যাত মানুষের মৃত্যু সময় আগাম ঘোষণা করতে হবে।

১৯। প্ল্যানচেটে আত্মা আনতে হবে।

২০। সাপের বিষ কোনও কুকুর বা ছাগলের শরীরে ঢুকিয়ে দেবার পর তাকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করতে হবে।

২১। বিষ পাথরের বিষশোষণ ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

২২। কঞ্চি চালান, বাটি চালানের সাহায্যে চোর ধরে দিতে হবে।

২৩। থালা পাড়ার সাহায্যে বিষ নামাতে হবে।

২৪। নখদর্পণ প্রমাণ করে চোর ধরে দিতে হবে।

২৫। চালপড়া খাইয়ে চোর ধরে দিতে হবে।

২৬। যোগবলে শূন্যে ভাসতে হবে।

২৭। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখতে হবে।

২৮। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হতে হবে।

২৯। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানতে হবে।

৩০। জলের ওপর হাঁটা।

৩১। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি তোলা যায়।

৩২। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৩৩। মন্ত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে হবে।

৩৪। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

৩৫। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

৩৬। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে :

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন, বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে, আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য এগোতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবি প্রমাণ করতে না পারলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত এবং শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৮। পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন রেইকি-গ্র্যান্ডমাস্টার, ফেং শুই বিশেষজ্ঞ, বাস্তুবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণীন ও উপাসনা-ধর্মের গুরুরা দাবি করেন। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে দাবি করেন।

জীবনকে পাল্টে দিতে চান? জানতে চান আজীবন মস্তিষ্ককে চিন্তাশীল ও সক্রিয় রাখার উপায়? মগজ ধোলাই ও পাল্টা মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতি? শিশু, কিশোর বা নিজের জীবনের মানসিক সমস্যা মেটাবার উপায়?

যোগ কি শুধু-ই স্বাস্থ্যচর্চা? না কি যোগে যে কোনও রোগ সারানো যায়? টেকো মাথায় চুল গজানো যায়? মগজকে রিল্যাক্সেশন দিতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান-সম্মত মেডিটেশন। মেডিটেশনের সফল প্রয়োগ করতে চান? জীবনকে সুস্থ, চিন্তাশীল, রিল্যাক্সড্ রাখার একমাত্র গাইড বুক।